সমরেশ মজুমদার

অর্জুন সমগ্র/১

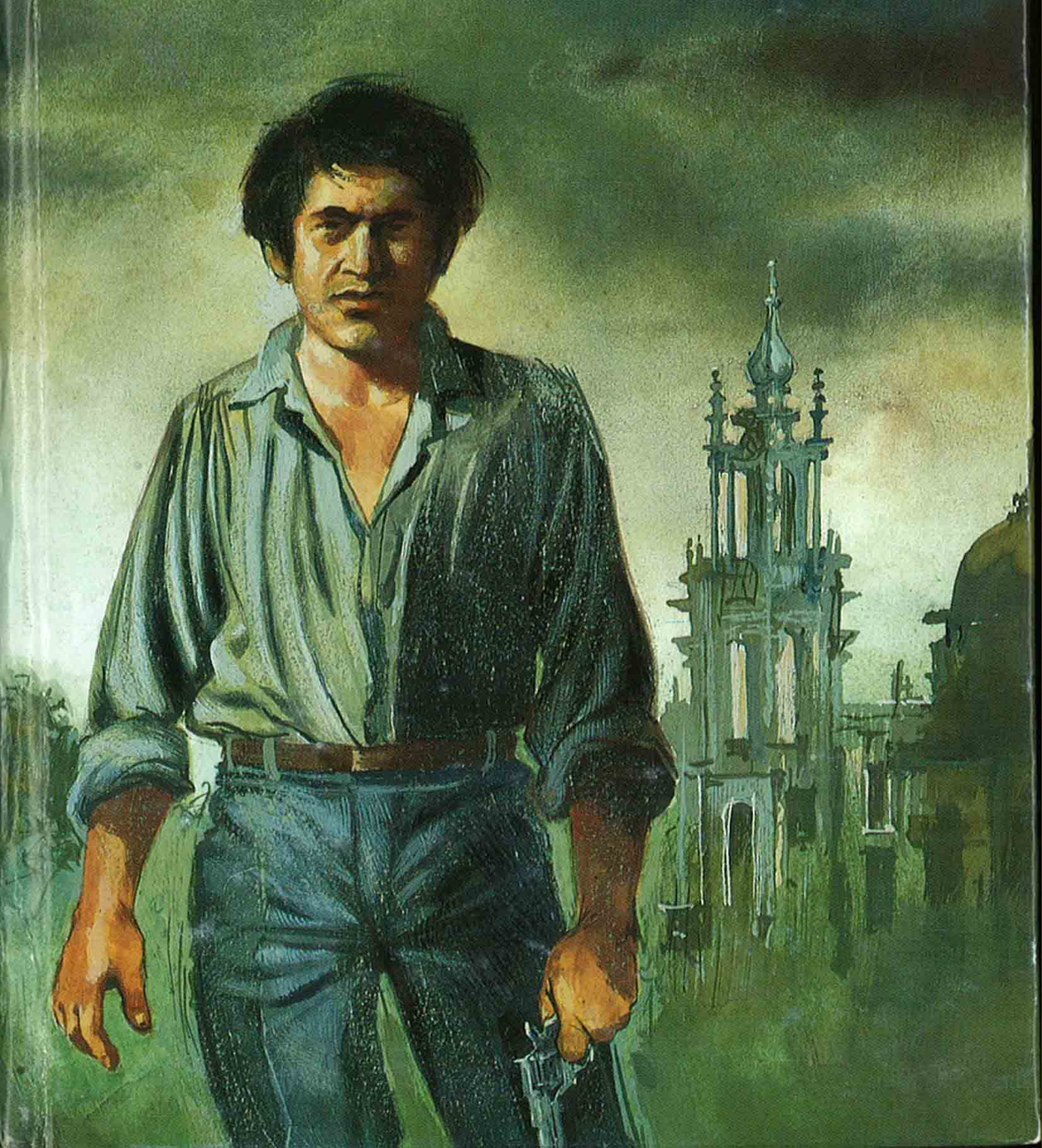

অর্জুন সমগ্র ১

সমরেশ মজুমদার

আনন্দ

সূচিপত্র

খুনখারাপি ১১
সীতাহরণ রহস্য ৮১
লাইটার ২১৫
জুতোয় রক্তের দাগ ২৯৫
দেড়দিন ৪৬৫

গ্রন্থপরিচয় ৫৪৫

লাইটার

pathagar.net

লাইটার

'রূপমায়া'তে চমৎকার একটা ছবি দেখাচ্ছে। ক্রাইম অ্যাট মিডনাইট।

দুপুরবেলায় আজ অর্জুনের কিছু করার ছিল না। গতকাল সে শেষ ইন্টারভিউ দিয়েছে। প্রতিবার মনে হয়েছে চাকরিটা হয়ে যাবে কিন্তু কখনওই হয়নি। বি.এ. পাশ করে সে এখন সত্যিকারের বেকার। অমল সোম জলপাইগুড়ি শহরে না থাকায় নতুন কোনও কেসও আসছে না। তা ছাড়া অমলদা বেশি কেস নেওয়া পছন্দ করেন না। দিন কুড়ি আগে কালিম্পং থেকে বিষ্টুসাহেব লিখেছিলেন তাঁর শরীর খুব অসুস্থ। রাত্রে ঘুম হয় না, হাঁটলে মাথা ঘোরে। ডাক্তাররা পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। চিঠির শেষে বিষ্টুসাহেব লিখেছিলেন, 'ঈশ্বরের তৈরি এই পৃথিবীতে আমি শুধু শুয়ে থাকব অর্জুন? বাইরে কত কী ঘটছে, কিছুই দেখতে পাব না? আমার যা কিছু সম্পত্তি আছে, তা মাদার টেরেসাকে উইল করে দিয়ে যাব স্থির করেছি। ঈশ্বরের কাজে লাগুক।' এই চিঠি পেয়ে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে করেছিল বিষ্টুসাহেবকে কালিম্পংয়ে গিয়ে দেখে আসে। কিন্তু কালিম্পংয়ে যাওয়া-আসায় তো অন্তত তিরিশটা টাকা খরচ। মায়ের কাছে আজকাল টাকা চাইতে লজ্জা করে।

'রূপমায়া'র সামনে এসে দাঁড়িয়ে সে হাউসফুল বোর্ডটাকে ঝুলতে দেখল। কিন্তু তখনই কাটা-গদাইয়ের চোখে পড়ে গেল সে। অর্জুনকে দেখে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল সে। জোর করে তাকে সিনেমা দেখাবেই কাটা-গদাই। এই শহরে তার একটা বিশেষ খাতির আছে। শহরের যাঁরা মাথা, তাঁরা স্বীকার করুন বা না করুন, সাধারণ মানুষ তাকে খুব সমীহ করে। কাটা-গদাই এই সিনেমা হলের চত্বরেই থাকে। বোধহয় টিকিট ব্ল্যাকের ব্যাপারেও তার হাত আছে। কিন্তু সে বলল, "তুমি সিনেমা দেখতে এসে ফিরে যাবে এটা জলপাইগুড়ির লজ্জা।"

পয়সা দিয়ে টিকিট নিল অর্জুন। কাটা-গদাই রাজি হচ্ছিল না। সিনেমা হলে বসে অর্জুনের মনে হল, এই একটি কারণেই তার চাকরি হচ্ছে না। সবাই

pathagar.net

ভাবে ছেলেটা গোয়েন্দাগিরি করে, একে কাজ দিলে কোথা থেকে কী হয়ে যায় ! ছবিটা সত্যি ভাল । মুগ্ধ হয়ে দেখল অর্জুন । অপরাধীকে বুঝতে পারা যাচ্ছিল না শেষ দৃশ্য পর্যন্ত । ছবি দেখে বেরিয়ে আসছে ভিড়ের সঙ্গে, হঠাৎ কানের পাশে ফিসফিসানি শুনল, "তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে ।"

মুখ ফিরিয়ে সে কাটা-গদাইকে দেখল । কাটা-গদাই বলল, "এখন নয়, পরে বলব ।"

এই শহরে দু'জন গদাই খুব পরিচিত । পোড়া-গদাই আর কাটা-গদাই । সে ছেলেবেলা থেকে ওই নাম দুটো শুনে আসছে । কেন তাদের ওই নামে ডাকা হয়, তা কখনও জানতে চায়নি । কাটা-গদাই তার কাজে চলে গেলে অর্জুন অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল । ঠিক কী বলতে চায় কাটা-গদাই । ওর সঙ্গে কী কথা থাকতে পারে ? একটু আগে দেখা ছবির ডিটেকটিভকে একটা লোক ওইভাবে এসে বলেছিল, কথা আছে । অর্জুন হেসে ফেলল । নিশ্চয়ই কাটা-গদাই ছবিটা দেখেছে ।

"এই অর্জুন । একবার এসো ।"

ডাকটা শুনে সে বাঁ দিকে তাকাল । চৌধুরী মেডিক্যাল স্টোর্সের রামদা তাকে ডাকছেন । অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ মানুষ । চেহারা দেখলে কিছুদিন আগে সিনেমার নায়ক বলে মনে হত । কাউন্টারের সামনে দাঁড়ানোমাত্র রামদা বললেন, "একটু আগে এক ভদ্রলোক অমল সোমের খোঁজ করছিলেন । আমি বললাম, উনি শহরে নেই । তবু হদিসটা জেনে নিয়ে চলে গেলেন । খুব জরুরি ব্যাপার বলে মনে হল ।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি ভদ্রলোককে চেনেন ?"

"না, না । উনি এই শহরের মানুষ নন । সঙ্গে গাড়ি ছিল ।"

অর্জুন আর দাঁড়াল না । একটা রিকশা নিয়ে সে হাকিমপাড়ায় যেতে বলল । এখন ভরা বিকেল । রোদ নেই । জলপাইগুড়ি শহরে বৃষ্টিটা সবে শেষ হয়েছে । শীত আসতে কয়েক সপ্তাহ দেরি । এই সময় হাঁটতে ভাল লাগে । কিন্তু শহরে অমল সোম নেই জেনেও ভদ্রলোক বাড়িতে গেলেন কেন ? অবশ্যই কিছু লিখে যেতে চাইছেন । অথবা এমনও হতে পারে, অমলদার কোনও বন্ধুবান্ধব । অবশ্য এতকাল সেরকম কেউ আসেননি ।

দূর থেকেই গাড়িটাকে দেখতে পেল সে । ওর গায়ে যে পরিমাণ ধুলো তাতে বোঝা যাচ্ছে সফরটা কম হয়নি । গেট খুলতেই হাবুকে দেখতে পেল । বাগান পরিষ্কার করছে সে । মুখ ফিরিয়ে অর্জুনকে দেখে মুখে হাসি ফুটল তার । ইঙ্গিতে বাইরের ঘরটা দেখিয়ে দিল । অর্জুন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতেই চুরুটের গন্ধ পেল । গন্ধটা মোটেই ভাল নয় । আর তারপরেই ভদ্রলোকের মুখোমুখি হল ।

বেতের চেয়ারে বসে চুপচাপ চুরুট খাচ্ছেন পঞ্চাশ পার হওয়া মানুষটি ।

বেশ মোটাসোটা, মাথায় টাক, চোখের তলায় কমলালেবুর কোয়া, পরনে ছাইরঙা স্যুট। অর্জুন ঘরে ঢুকে বলল, "নমস্কার। আপনি অমল সোমকে চাইছেন ?"

ভদ্রলোক কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন অর্জুনকে পড়ে নিচ্ছিল।

"অমলদা বাইরে গেছেন।"

"খবরটা আমি শহরেই শুনেছি। এখানে এসে ওই নোটিসটা পড়েছি। আমাকে অশিক্ষিত ভাবার কি খুব কারণ আছে ?" মুখের অভিব্যক্তি না পালটে চুরুট খেতে খেতে কথাগুলো বললেন ভদ্রলোক। এবং অর্জুন বুঝতে পারল ইনি সাধারণ নন।

সে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। তারপর শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, "বলুন, আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি। আমি অর্জুন। অমল সোমের সহকারী।"

"প্রথমে আমি দুটো প্রশ্ন করব। কোনও গোয়েন্দা তার খবরাখবর দেবার জন্য একটা বোবা লোককে বাড়িতে রাখে কেন ?" ভদ্রলোককে খুব উত্তেজিত দেখাল।

অর্জুন হেসে ফেলল, "আমি কিন্তু আপনার নাম জানি না।"

"কোনও দরকার নেই। আমি শুধু একজন কথা বলতে পারে এমন লোকের জন্যে বসেছিলাম। বোবা চাকর রেখে আর যাই হোক গোয়েন্দাগিরি চলে না।"

"প্রথমেই বলে রাখি গোয়েন্দাগিরি আমরা করি না। আমরা সত্যসন্ধানী। হাবু কথা না বলতে পারলেও অমলদা ওকে অতিপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন ?"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ অর্জুনের দিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "মিস্টার সোম কবে ফিরছেন ?"

"জানি না। ওঁর ইচ্ছে হয়েছে সারা দেশটা ঘুরে আসবেন।"

"মোস্ট আনপ্রফেশনাল! এই জন্যই দেশটার কিছু হল না। তাহলে আমি চলি!"

"আমি বুঝতে পারছি না এত দূর থেকে এসে আপনি চলে যাবেন কেন ?"

"কারণ, যাঁর কাছে এসেছিলাম তিনি নেই বলে।" উঠতে চাইলেন ভদ্রলোক।

"কিন্তু রায়গঞ্জ অথবা মালদা থেকে আসতে অনেক সময় লেগেছে আপনার।"

"কী করে বোঝা গেল আমি কোত্থেকে আসছি ?" ভদ্রলোক উঠলেন না।

"আপনি ডুয়ার্স থেকে আসছেন না। কারণ ডুয়ার্সের রাস্তাগুলো সুন্দর

pathagar.net

পিচের, তাতে ধুলো ওড়ে না। দার্জিলিং বা কালিম্পং থেকে নামছেন না। পাহাড়ে ধুলো নেই। কিন্তু আপনার গাড়ির যা অবস্থা তাতে ওই দিক থেকে আসছেন বলে মনে হয়।"

"অনুমান মিলল না। অমল সোমও এইরকম অনুমান করেন নাকি। তাহলে আসাটা বৃথাই হল।" ভদ্রলোক আর বসলেন না। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, "এই শহরে কোনও ভাল হোটেল আছে ? আমি টায়ার্ড।"

"ভাল হোটেল নেই। তিস্তা বাংলোতে ট্রাই করতে পারেন।"

অর্জুন ওঁকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। কোনও কথা না বলে গাড়ি ঘুরিয়ে তিনি চলে গেলেন। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছিল। উত্তেজনা নিশ্চয়ই আছে, বোধহয় প্রেশারও ওপরের দিকে। কিন্তু পরিচয়টা দেবার প্রয়োজন মনে করলেন না ভদ্রলোক। হঠাৎ নিজের ওপর তার রাগ হল। আগ বাড়িয়ে বলার কী দরকার ছিল কোত্থেকে আসছেন ভদ্রলোক। অমলদা যেমন ঠিকঠাক বলে দেন তেমন যদি সে বলতে পারত! তা ছাড়া সে নিজে কেস করতে চাইছে অথচ মুখ ফুটে ভদ্রলোককে সে-কথা বলতেও পারল না।

ঝুপঝাপ অন্ধকার নেমে গেল। দূরে শঙ্খ বাজছে। এ-বাড়িতে অবশ্য সে-বালাই নেই। অর্জুন বারান্দায় উঠে এসে দেখল হাবু আলো জ্বেলে দিল। তাকে দেখতে পেয়ে হাবু ওপাশের টেবিল থেকে দুটো খাম এনে সামনে ধরল। ওপরে অমল সোমের নাম লেখা, কোনায় ফ্রম বিষ্টুসাহেব। দ্বিতীয়টার ওপরে তার নাম লেখা। এই বাড়ির ঠিকানায় তার কোনও চিঠি আসে না। খানিকটা অবাক হয়ে সে খামটা খুলতেই অমলদার নামটা দেখতে পেল।

'স্নেহের অর্জুন, তোমার বাড়ির ঠিকানায় চিঠি না দিয়ে নিজেরটা ব্যবহার করলাম। কারণ, যখনই কাউকে চিঠি লিখি, তখন তার ঠিকানা লিখতে হয়, নিজের ঠিকানায় চিঠি পাঠানোর সুযোগ আজ অবধি পাইনি। অবাক হোয়ো না।

গতকাল বোম্বাইতে এসেছি। একা-একা এই ঘুরে বেড়াতে খুব ভাল লাগছে। চেনা মানুষ যে একেবারেই সামনে আসেনি তা নয়, কিন্তু যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলছি। কবে ফিরব জানি না। হাবুকে টাকা-পয়সা দিয়ে এসেছি। মাঝে-মাঝে নিশ্চয়ই খোঁজ নিচ্ছ। নতুন কোনও কেস পেলে পারো তো কোরো। শুধু দুটো জিনিস মনে রাখবে। কখনও বেশি উৎসাহ দেখাবে না। আর সত্যের সন্ধানে যদি হনলুলুতেও যেতে হয় যাবে।

বিষ্টুসাহেবের জন্য মনটা কিছুদিন থেকেই খারাপ। ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত অথর্ব হয়ে গেলেন। উনি কি কোনও চিঠিপত্র দিয়েছেন তোমাকে ? আমার নামে দিলেও তুমি পড়তে পারো। বিষ্টুবাবু আমাকে একটা আমেরিকান লাইটার উপহার দেবেন বলেছিলেন। জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির। এ-দেশে

boiRboi.net

পাওয়া যায় না। ওঁর এক বোন থাকেন নিউইয়র্কে। তাঁকে লিখেছিলেন পাঠাতে। মানুষটি সত্যি ভাল। ওঁকে হারালে পরমাত্মীয়কে হারাব। শুভেচ্ছা জেনো। অমলদা।'

চিঠির তারিখ পাঁচ দিন আগের। অমলদা কোথায় যাবেন এরপরে, তার কোনও ইঙ্গিত দেননি। মানুষটি হঠাৎ কেন এমন ভবঘুরে হয়ে গেলেন, ভেবে পায় না অর্জুন।

এবার বিষ্টুসাহেবের চিঠিটার দিকে তাকালো। অমলদা যখন অনুমতি দিয়েছেন তখন স্বচ্ছন্দে খোলা যেতে পারে।

"মাননীয়েষু, আশা করি ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ রেখেছেন। আমি ভাল নেই। হাঁটতে বড় কষ্ট হয়। কালিম্পংয়ে একা খুব খারাপ লাগছে। তা ছাড়া আপনাদের সঙ্গ দীর্ঘকাল পাইনি। মনে পড়ে, সেই খুনখারাপি থেকে শুরু করে চণ্ডীগড় পর্যন্ত আমরা কত না রোমাঞ্চিত হয়েছি। ভাল বাংলা লিখতে পারি না বলে মার্জনা করবেন। একটি জরুরি ব্যাপার ঘটেছে। আমার যে বোন নিউইয়র্কে থাকে, সে বায়না ধরেছে যে, আমি যেন তার কাছে চলে যাই। সেখানে সে আমার চিকিৎসা করাবে। আমি জানি এই রোগ বার্ধক্যের। কোথাও গেলে সারবে না! কিন্তু বাঁচতে বড় লোভ হয়। এখানকার বাড়িঘর বিক্রি করে দিচ্ছি। মনে হচ্ছে সেখানেই চলে যাই। একা যেতে সাহস হচ্ছে না। আপনি যাবেন? জানি খুব ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু এই বৃদ্ধ বন্ধুকে সাহায্য করা কি অসম্ভব? আমাদের পাশপোর্ট-ভিসা-টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে আপনার সম্মতি পেলেই। ইতি, গুণমুগ্ধ বিষ্টুসাহেব।'

মনটা কেমন হয়ে গেল অর্জুনের। ওইরকম হাসিখুশি মানুষটির এই পরিণতি তার একটুও ভাল লাগছিল না। কিন্তু এখন কী হবে? অমলদা কবে ফিরবেন জানা নেই। এই চিঠির খবরটাও তাঁর কাছে পৌঁছে দেবার উপায় নেই। সে ঠিক করল বিষ্টুসাহেবকে বিস্তারিত জানাবে।

রাত হচ্ছিল। হাবুকে ডেকে দরজা বন্ধ করতে বলবে বলে অর্জুন এগোতেই চোখে পড়ল, চেয়ারের নীচে কী একটা পড়েছে। নীল চকচকে জিনিসটা আলো পড়ায় আকর্ষক মনে হচ্ছে। ঝুঁকে সে হাতে নিতে শীতল স্পর্শ এবং গঠনে বুঝল ওটা একটা লাইটার। এই বাড়িতে লাইটার তো এভাবে পড়ে থাকার কথা নয়। মনে পড়ল, এই চেয়ারে বিকেলের আগন্তুক বসে চুরুট খাচ্ছিলেন। সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই, লাইটারটা তাঁর। মানুষটাকে দেখলে মনে হয় না তিনি এত অসতর্ক। সে টেবিলের ওপর লাইটারটা রাখতে গিয়ে পেছনে কয়েকটা অক্ষর দেখতে পেল। একটু কৌতূহলী হয়ে লাইটারটাকে চোখের সামনে ধরতেই স্পষ্ট পড়তে পারল, 'জোন্স অ্যান্ড জোন্স।'

pathagar.net

॥ দুই ॥

সাইকেল-রিকশা জলপাইগুড়িতে সন্ধে সাতটার পর পাওয়া যায় না। তাছাড়া তিস্তা নদীর ধারে এই হাকিমপাড়াটা শহরের একধারে বলে এদিকে আসতেই চায় না। পথে বেরিয়ে অর্জুন খুব উত্তেজিত হয়ে হাঁটছিল। ব্যাপারটা স্রেফ কাকতালীয় হতে পারে। আজই অমলদার চিঠিতে সে জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির কথা জানতে পারল। আবার ওই আগন্তুক যে লাইটার ফেলে গেছেন তাও জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির। অথচ অমলদা লিখেছেন, এটা এদেশে পাওয়া যায় না! পি. ডব্লু. ডি. অফিসের সামনে দিয়ে বাঁক নিয়ে করলা ব্রিজ পেরিয়ে সে বাবুপাড়ায় চলে এল। রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না বোঝা দায়।

ডান দিকের রাস্তায় ঢুকে তিন নম্বর বাড়ির দরজায় শব্দ করল সে। ভেতর থেকে শুদ্ধ বাংলায় প্রশ্ন ভেসে এল, "পরিচয়?"

"আমি অর্জুন।"

দরজা খুললেন বৃদ্ধ। আশির কাছে বয়স। মাথায় শণের মতো চুল। খুব রোগা। শীত-গ্রীষ্ম একটা গলাবন্ধ গেঞ্জি পরে থাকেন। হাসলেন তিনি, "কী সংবাদ তৃতীয় পাণ্ডব? তিনি কি ফিরেছেন?"

অর্জুন ভেতরে ঢুকল, "না। চিঠি দিয়েছেন, কবে ফিরবেন জানাননি।" এই বাড়িতে মোট পাঁচটি ঘর। যার সাড়ে চারটিতে বইপত্র ঠাসা। সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়, এই তথ্য অর্ধেক বিশ্বাস করেন সুধাময় সান্যাল। অর্ধেক কেন, প্রশ্ন করলে বলেন, "বইপত্র কাগজ দেখে অর্ধেক মনে হয়। বেশি স্মোক করলে গলায় লাগে, বাঁ দিকটা চিনচিন করে। কিন্তু যতক্ষণ ডাক্তার না বলছে, ততক্ষণ এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাব। আমার ক্যানসার হলে জলপাইগুড়ির কোনও মানুষ আর সিগারেট খাবে না।"

সুধাময় সান্যালের কাছে পৃথিবীর সব দেশের সিগারেট, পাইপ, তামাক এবং লাইটার আছে। দেশলাইয়ের বাক্স যে কত রকমের হয় না দেখলে ভাবাই যাবে না। ইদানীং উনি হাতে-পাকানো নেপালি সিগারেট খেতে ভালবাসছেন।

বেতের চেয়ারে বসে সুধাময় সান্যাল জিজ্ঞেস করলেন, "চাকরি পেলে না?"

মাথা নেড়ে হাসল অর্জুন, "পাব-পাব করছি। আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছি।"

"দরকার ছাড়া কেউ আসে না। আমি বাকি ক্যাটকেটে কথা বলি। বলে ফেলো!"

"জোন্স অ্যান্ড জোন্স বলে কোনও লাইটার কোম্পানির নাম আপনি শুনেছেন?"

pathagar.net

সুধাময় সান্যাল অবাক হয়ে তাকালেন, "এ নাম তুমি জানলে কী করে হে?"

"অমলদার চিঠিতে প্রথম জানি।"

"ও। অমলদাকে তো আমিই বলেছিলাম। অদ্ভুত লাইটার বটে। আমেরিকানদের লেটেস্ট আবিষ্কার। 'টোব্যাকো' বলে একটা জার্নালে পড়েছিলাম। এমনিতে লাইটারটা লক্ করা থাকে। লক্ খুলে বোতাম টিপলে আগুন দেখতে পাবে না। কাছাকাছি সিগারেট নিয়ে গেলে ওটা ধরে যাবে। রাত্রে লাইটার জ্বাললে আলো দেখে কেউ যাতে বিরক্ত না হয় তাই এই ব্যবস্থা। অদৃশ্য আগুন বলতে পারো। এক নম্বর বোতাম অফ করে দু' নম্বরটা টিপলে লাইটারটা হয়ে যায় অস্ত্র। দশ ফুট যেতে পারে এমন একটা রে বের হয়, যা একটা হাতিকেও পাঁচ মিনিট অবশ করে রাখতে পারে। এই রে চোখে দেখা যায় না। আমেরিকান গভর্নমেন্ট লাইটারটাকে বাজারে ছাড়তে চায়নি। এখন শুনছি পরিচয়পত্র দেখিয়ে কিনতে হচ্ছে। আমার সংগ্রহে ওই বস্তুটি নেই। তোমার দাদাকে বলেছিলাম, যদি সম্ভব হয় ব্যবস্থা করতে। তিনি অবশ্য বলেছেন যে, তাঁর এক বন্ধু কথা দিয়েছেন আমেরিকা থেকে আনিয়ে দেবেন। দেখা যাক। এদেশের মানুষ ওটা চোখেই দ্যাখেনি।" নেপালি সিগারেট ধরালেন তেকোনা দেশলাই কাঠি জ্বেলে। ধরিয়ে বললেন, "এটা সিঙ্গাপুর থেকে আনানো।"

কথাগুলো শুনতে শুনতে অর্জুন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। তার হঠাৎ মনে হল, সুধাময় সান্যালকে বললে তিনি লাইটারটি নিয়ে নেবেন। অবশ্য তার পকেটে যে লাইটার রয়েছে সেটি এইরকম কাজ করবে কি না তা সে জানে না। কিন্তু দুর্লভ জিনিস যাঁরা সংগ্রহ করেন তাঁর একটু পাগলাটে মানুষ হন। এমন গল্পও সে পড়েছে, একটা দুর্লভ বই সংগ্রহের জন্যে মানুষ খুন করতে বাধেনি সংগ্রাহকের। জোন্স অ্যান্ড জোন্সের লাইটারটা তার কাছে, জানলে সুধাময় সান্যাল কিছুতেই ছাড়বেন না। অথচ বিকেলের আগন্তুক নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন খেয়াল হলেই। তখন কী জবাবদিহি দেবে সে? উত্তেজনা চেপে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "জলপাইগুড়িতে ওই লাইটারের কথা আর কেউ জানে বলে মনে হয়?"

চোখে চোখ রাখলেন সুধাময় সান্যাল, "কী ব্যাপার বল তো?"

"কোনও ব্যাপার নয়। যা বর্ণনা শুনলাম তাতে কৌতূহল হচ্ছে।"

"অ," একটু সহজ হলেন সুধাময় সান্যাল, "তোমাকে স্নেহ করি। তাই বলা যেতে পারে। তুমি রায়দের নাম জানো? ওই যাদের পরিবারের মানুষরা আমেরিকায় থাকত। শিল্পসমিতিপাড়ায় বাড়ি। ওই বাড়ির ছোট ছেলে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর নাম আমি জানি কি না। তোমার মুখেও একই কথা শুনে প্রথমে অবাক হয়েছিলাম।"

"ভদ্রলোকের নাম কী ?"

"হরিপ্রসাদ রায়। সে আমাকে ওই লাইটার দেখাল। আমি লক্ খুলে বোতাম টিপলাম। কোনও ফ্লেম বের হল না কিন্তু সিগারেট ধরল। দ্বিতীয় বোতাম টিপতে রে বের হল না। বদলে অদৃশ্য আগুন দৃশ্যমান হল। ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। লাইটারটা জাল। দ্বিতীয় বোতাম টেপার পর যের বের হয় বলে ওটা আজ মূল্যবান। টোব্যাকোতে পড়েছি, হংকং থেকে জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর নকল মাল বের হচ্ছে। কথাটা বলায় হরিপ্রসাদ খুব দুঃখিত হল। সে ওটা আমাকে দিতে চেয়েছিল, নিইনি। আসল ছেড়ে কে নকলে হাত দেয় !"

মিনিট-পাঁচেক এটা-সেটা বলে অর্জুন উঠে পড়ল। দ্রুত হেঁটে চলে এল করলা নদীর ধারে। এই জায়গাটা সন্ধের পরই অত্যন্ত নির্জন হয়ে যায়। পকেট থেকে লাইটারটা বের করে সে চোখের সামনে ধরল। ওপরটা সমান, কোনও গর্ত নেই। পাশে দুটো মসৃণ বোতাম আছে। ইংরেজিতে তাদের ওপর এক এবং দুই লেখা। ঠিক উলটো দিকে একটা চৌকো পাতের ওপর লক্ শব্দটা খোদাই করা। সন্তর্পণে সেটায় চাপ দিতে কুট্ করে শব্দ হল।

অর্জুন ইদানীং সিগারেট খাচ্ছে। দিনে চারটে। তার বেশি খাওয়ার ইচ্ছে হয় না, পয়সাও নেই। সে এখনও দাড়ি কামায়নি। গালে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের মতো সুন্দর দাড়ি বেরিয়েছে। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে সে এক নম্বর বোতামটা টিপল। তারপর ধীরে সিগারেটের ডগাটা লক্ টেপার ফলে বের হওয়া একটা পেরেকের মাপে সরু গর্তের কাছে নিয়ে এসে টানতেই ধোঁয়া বের হল। সঙ্গে-সঙ্গে এক নম্বর বোতামটা দ্বিতীয়বার টিপে ওটাকে নিষ্ক্রিয় করল সে। সিগারেটে তার মন ছিল না। হাত কাঁপছিল। বুকের মধ্যে যেন ড্রাম বাজছে। এই আপাত-নিরীহ কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্রটি হয়তো ভারতবর্ষে কারও কাছে নেই।

দ্বিতীয় বোতামটি পরীক্ষা করার জন্যে চারপাশে তাকাল। কোনও মানুষের ওপর প্রয়োগ করা যাবে না। সে চুপচাপ হাঁটতে লাগল। থানার একটু আগে সে রাস্তার পাশে ঘাসে বসে জাবর কাটতে দেখল একটা ষাঁড়কে। সেই সময় দু'জন লোক গল্প করতে করতে এদিকে আসছিল। অর্জুন উলটো দিকে মুখ ফিরিয়ে ওদের যেতে দিল। তারপর ষাঁড়টার পাঁচ ফুটের মধ্যে চলে এল। একটু বিরক্ত হয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে ষাঁড়টা উঠে দাঁড়াল। সুধাময় সান্যালের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে ও মারা যাবে না। খানিকক্ষণ শরীরটা অবশ হয়ে যাবে মাত্র। কিন্তু যদি মরে যায় ? অন্য কোনও প্রাণী, ইঁদুর, কাকের ওপর পরীক্ষা করলে হত না ! কিন্তু আজ রাত্রে তাদের কোথায় পাওয়া যাবে ! আর দ্বিধা না করে অর্জুন দ্বিতীয় বোতামটা টিপল সঠিক লক্ষ করে। ষাঁড়টা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর স্বচ্ছন্দে হাঁটতে লাগল। বিব্রত অর্জুন দ্বিতীয়বার দ্বিতীয়

বোতাম টিপতেই ছোট্ট আগুনটা দৃশ্যমান হল। যে-কোনও সাধারণ লাইটার জ্বালালে যেরকম আগুন বের হয়। লক্ করে লাইটার হাতে নিয়ে ঠোঁট কামড়াল অর্জুন। তার শরীর আচমকা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বিকেলের অতিথির ফেলে যাওয়া লাইটারটাও জাল ? তার কষ্ট হচ্ছিল।

॥ তিন ॥

শিল্পসমিতিপাড়ায় হেঁটে আসতে বেশ সময় লাগল। রায়দের বাড়ি এই শহরের সবাই চেনে। এখন রাস্তাঘাটে তেমন মানুষ নেই। দোকানপাটও এই শহরে সাততাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। তা ছাড়া সিকদারবাড়ি ছাড়ালে দোকানও বেশি নেই। হরিপ্রসাদ রায়কে সে চেনে না। কিন্তু ভদ্রলোক থাকেন আমেরিকা। এই গল্প সে জানে। মেমসাহেব বিয়ে করেছেন বলে বাড়িতে খুব ঝামেলাও হয়েছে। ওঁর বাবা খুব কনজারভেটিভ। অর্জুন ঠিক করেছিল হরিপ্রসাদ রায়কে অনুরোধ করবে তাঁর লাইটারটি দেখাতে। দুটো জাল জিনিসে কতটা তফাৎ দেখতে ইচ্ছে করছিল।

হরিপ্রসাদ রায় বাড়িতে নেই। দরোয়ান বলল, 'সাহেব কখন ফিরবেন বলে যাননি।' অর্জুন হতাশ হল। সিনেমা দেখবে বলে সাইকেল না নিয়ে বেরিয়ে এখন পা টনটন করছে। তবু ওর মনে হল যার লাইটার তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই ভাল। জাল জিনিস বয়ে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না। কিন্তু সেই লোকটা এখন কোথায় ?

জলপাইগুড়ি শহরে হোটেল বলতে একটাই। হোটেল না বলে একটা ভাল মেস বলাই সঙ্গত। আর আছে কয়েকটা বাংলো এবং জলপাইগুড়ি ক্লাব। শেষেরটার অবস্থা খুবই খারাপ। কিন্তু সেখানে থাকতে গেলেও কোনও মেম্বারের সুপারিশ দরকার হয়। তিস্তা বাংলোটার অবস্থা খুব ভাল। যদিও খাবার আগে থেকে না বললে পাওয়া যায় না। যে মানুষ বিকেলে এসেছিলেন তাঁর পক্ষে এই শহরে থাকতে গেলে ওখানেই থাকতে হবে।

তিস্তা বাংলোটা শহর ছাড়িয়ে রেসকোর্সের ওপারে। অর্জুন দ্রুত হাঁটছিল। লোকটা খুব সাধারণ নয়। কথাবার্তায় ঔদ্ধত্য আছে। ওইভাবে বলাই সম্ভবত অভ্যেস। কিন্তু উনি নকল লাইটার নিয়ে এই শহরে আসবেন কেন বুঝতে পারছেন না সে। পথে সেই হোটেলটা পড়েছিল। ম্যানেজারকে চেনে অর্জুন। তিনি বললেন, ওই বর্ণনার একটি লোক গাড়ি নিয়ে এখানে এসে খুব বাজে ব্যবহার করেছেন। তিনি নাকি বলেছেন, 'এটাকে হোটেল বলে ? আপনাদের ব্যবসা চালাতে কী করে লাইসেন্স দেয় কে জানে !'

ম্যানেজার এ-কথায় খুব আঘাত পেয়েছেন। না-হয় একটু নর্দমার গন্ধ ঢোকে, বেডকভার রোজ পালটানো হয় না, তাই বলে এমন কথা ! লোকটা

pathagar.net

গাড়ি নিয়ে এখান থেকে তিস্তা বাংলোর দিকে গিয়েছে।

অর্জুন যখন সেখানে পৌঁছল তখন রাত ন'টা। এখন এলাকায় নিশুতি রাত। গেট পেরিয়ে বিরাট বাংলোটাকে দেখল সে। আলো জ্বলছে। ঝকঝকে ব্যবস্থা। কিন্তু বাংলোর সামনে কোনও গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। হতাশ হল সে। ভদ্রলোক হয়তো এখানে এসে কোনও ঘর খালি না পেয়ে শিলিগুড়িতে চলে গিয়েছেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ। অনেক ভাল হোটেল আছে সেখানে। ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই সে লোকটাকে দেখতে পেল। হাতে একটা জ্যান্ত মুরগি নিয়ে ঢুকছে। কাছাকাছি এসে সে লোকটাকে চিনতে পারল। এই বাংলোর বাবুর্চি। তাকে ওখানে দাঁড়াতে দেখে বাবুর্চিও একটু অবাক হয়েছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের বাংলোর সব ঘর ভর্তি হয়ে গিয়েছে?"

লোকটা মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ সাব।" মুরগিটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এত রাত্রে মুরগি আনলে কেন?"

লোকটা বলল, "সাবলোককো মর্জি অ্যাইসাই হোতা হ্যায়। ছে বাজে ইঁহা রুম লিয়া আউর এক ঘণ্টা পহেলে অর্ডার দিয়া মুরগি চাহিয়ে। আভি কাঁহা মিলেগা চিকেন? এক দোস্তসে লিয়া হ্যায়, দাম জাদা দেনে পড়েগা।"

অজুন সচেতন হল, "আচ্ছা। যে সাহেব বিকেলে এসেছে তার গাড়ি ছিল না?"

"হাঁ, থা।"

"তোমাদের এখানে গ্যারেজ আছে?"

"নেহি।"

"কত নম্বর রুমে সেই সাহেব আছেন?"

"তিন।" লোকটা আর দাঁড়াল না। মুরগি নিয়ে কিচেনের দিকে ছুটল। রত্রের নির্জনতায় মুরগির প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠছিল।

অর্জুন বাংলোটার দিকে তাকাল। বিকেলের আগন্তুকের যদি এখানে থাকেন তাহলে তাঁর গাড়ি কোথায় গেল? সে ধীরে-ধীরে বারান্দায় উঠে এল। কোলাপসিবল্ গেটটা টেনে দেওয়া কিন্তু এখনও তালা পড়েনি। চৌকিদারটা ধারেকাছে নেই। সোজা দোতলায় উঠে এল সে। লাউঞ্জের সোফায় বসে দু'জন ভদ্রমহিলা গল্প করছেন। অর্জুন উঠতেই তাঁরা একবার তাকিয়ে আবার কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আগামীকাল তাঁরা জলদাপাড়ায় যাচ্ছেন গণ্ডার দেখতে।

অর্জুন তিন নম্বর ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, সেটা বন্ধ। লাউঞ্জ থেকে সরে আসায় কাউকে চোখে পড়ছে না। সে দরজায় নক্ করল। ভদ্রলোকের যখন রাতের খাওয়া হয়নি তখন নিশ্চয়ই এখনই ঘুমিয়ে পড়েননি। কিন্তু ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। অর্জুন আর-একটু জোরে শব্দ করল।

pathagar.net

একটু অপেক্ষা সত্ত্বেও দরজাটা বন্ধই রইল। ভদ্রলোক যখন পরিশ্রান্ত তখন নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন। অর্জুন একটু অসহিষ্ণু হয়ে জোর চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

একটু ইতস্তত করে অর্জুন ঘুরে ঢুকল। মোটামুটি সুন্দর সাজানো ঘর। শহরের হোটেলের চেয়ে ঢের আধুনিক। কিন্তু কেউ নেই এখানে। যদিও একটা স্যুটকেস আর ব্রিফকেস রয়েছে। কিছু কাগজপত্র এবং রুমাল রয়েছে টেবিলের ওপর। বিছানা দেখে মনে হয় কেউ শুয়ে ছিল। জুতো-জোড়া বিছানার নীচে খোলা। ভদ্রলোক গেলেন কোথায়?

অর্জুন অস্বস্তিতে পড়ল। মালিকের অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢোকা অবশ্যই অন্যায়। সে বাইরে বেরিয়ে এসে চারপাশে তাকাল। কেউ নেই কাছাকাছি। সমস্ত ঘরের দরজা বন্ধ। আচ্ছা, ভদ্রলোক কি গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন? হয়তো অমলদার বাড়িতে গিয়েছেন লাইটারের খোঁজে। লোকটাকে দেখে অবশ্য মনে হওয়ার কোনও কারণ নেই যে, উনি জানেন না লাইটার জাল। কিন্তু কেউ কি ঘরের দরজা খোলা রেখে বাংলোর বাইরে যাবে? তা ছাড়া জুতো পর্যন্ত রয়েছে ঘরে। চিন্তাটাকে বাতিল করল অর্জুন। তারপর আবার ঘরে ঢুকল। সে ঠিক করল, চেয়ারে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না ভদ্রলোক ফেরেন।

মিনিট দশেক পার হয়ে গেল। রাত হচ্ছে। বাড়িতে আরও দেরি করে ফিরলে মা চিন্তা করবেন। অর্জুন উঠল। এবং তখনই তার বাথরুমের কথাটা খেয়াল হল। ভদ্রলোক হয়তো পরিষ্কার হবার জন্য ওখানে গেছেন। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল সে। এতক্ষণ তো কারও বাথরুমে থাকার কথা নয়। অর্জুন ধীরে-ধীরে উঠে বাথরুমের দরজায় হাত রাখল। একবার শব্দ করল। তারপর একটু জোরে ঠেলতে গিয়ে নজরে পড়ল এপাশ থেকে ছিটকিনি বন্ধ রাখা হয়েছে। বিস্মিত হয়ে সেটাকে খুলে দরজা ঠেলতে অবাক হয়ে গেল। ভদ্রলোক বাথরুমের মেঝেতে শুয়ে আছেন পাশ ফিরে। তাঁর পরনে পাজামা। ঠিক তাঁর ওপরে খোলা কল থেকে জল এসে পড়ছে শরীরের ওপরে। ফলে জলের শব্দ হচ্ছে না। কিন্তু বাথরুমটা ভেসে যাচ্ছে। অর্জুন ধীরে-ধীরে শরীরটার পাশে এসে দাঁড়াল। দুটো চোখ খোলা। হাতের শিরা দুটো কাটা। তা থেকে অনর্গল রক্ত বেরিয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেছে। এখনও কালচে হয়ে আছে কিছু জায়গা। হাতের পাশে একটা ধারালো বিদেশি ব্লেড। দেখলেই বোঝা যায় উনি আত্মহত্যা করেছেন। অন্তত এক ঘণ্টা আগে তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

pathagar.net

॥ চার ॥

সহদেব বক্‌সি বয়সে নবীন। স্মার্ট চেহারা। চালচলনে মনে হয় পুলিশ অফিসার না হয়ে যদি সিনেমার নায়ক হতেন, তবে আরও বেশি মানাত। পরের দিন বিকেলবেলায় থানায় তাঁর ঘরে বসে সহদেব কাঁধ নাচিয়ে বললেন, "ইটস্ এ সিম্পল কেস অব সুইসাইড। ভদ্রলোক বাথরুমে গিয়ে জলের কল খুলে নিজের হাতের শিরা কেটেছেন।"

অর্জুন চুপচাপ বসে ছিল সামনে। সহদেবকে তার ভাল লাগে। অমল সোমকে সহদেব ঠিক পছন্দ না করলেও অর্জুনের সঙ্গে ভাল ভাব আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "এটা তাহলে হত্যা নয়?"

"নট অ্যাট অল। কোনও মানুষের হাতের শিরা জোর করে কাটা যায় না। জোর করে ধরেবেঁধে তা করলেও ধস্তাধস্তির চিহ্ন থাকত। ওর শরীরে কোনও দাগ নেই।"

"তা হলে উনি অমলদার কাছে গিয়েছিলেন কেন? নিশ্চয়ই কোনও বিপদ ঘটতে যাচ্ছিল!"

"এইটেই তো এরা ভুল করে। হয়তো নিজে কোনও অন্যায় করেছিল, ভেবেছিল অমলবাবু বাঁচিয়ে দেবেন, কিন্তু তিনি না থাকায় ভয়ে লজ্জায় আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। ভদ্রলোক আমাদের কাছে এলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না। কাঠমাণ্ডু থেকে এসে জলপাইগুড়িতে মরতে হত না।"

অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কাঠমাণ্ডু?"

"ও হ্যাঁ। তোমাদের বলা হয়নি! ভদ্রলোক এ-দেশের নাগরিকই নন। ওঁর কাছে আমেরিকান পাশপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। এইটে উটকো ঝামেলা। বিদেশি নাগরিক মারা গেলে অনেক নিয়মকানুন মানতে হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় আমাকে বিপাকে ফেলেছেন।" জলপাইগুড়ি থানার দারোগা সহদেব বকসিকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

"সত্যেন্দ্রনাথ রায়! ভদ্রলোকের সম্পর্কে আর কিছু জানা গিয়েছে?"

"এখনও জিনিসপত্র ভাল করে পরীক্ষা করিনি। পাশপোর্ট পেয়ে অথরিটিকে জানিয়ে এখন আদেশের অপেক্ষায় বসে আছি।" এই সময় আর একটা কেস এসে যেতে সহদেব তৎপর হলেন।

অর্জুন একটু দ্বিধা করে জিজ্ঞেস করল, "সহদেবদা, আমি ওঁর জিনিসপত্র দেখতে পারি?"

"কোনও লাভ হবে না। তুমি ভাবছ মার্ডার কেস। মোটেই না। হাত না বেঁধে শিরা কাটা যায় না। দ্যাখো যদিও অফিসিয়ালি আমি তোমাকে দেখাচ্ছি না," সহদেব একজন সেপাইকে ডেকে হুকুম জানালে সে অর্জুনকে নিয়ে গেল মালখানায়।

pathagar.net

স্যুটকেসটা দেখলেই বোঝা যায় বিদেশি। জামা-প্যান্টও তাই। ভদ্রলোকের অবস্থা নিশ্চয়ই খুব ভাল। পাশপোর্টটাকে পেল না সে। কোনও টাকা-পয়সাও নেই। অথচ বিদেশি মানুষ নিশ্চয়ই খালি হাতে এখানে আসবেন না। একটা ডায়েরি দেখল, ভদ্রলোক তাতে বিশদ লেখেননি। ঠিক দশ দিন আগে তিনি প্যান অ্যাম এয়ারকোম্পানির মাধ্যমে দিল্লিতে নেমেছিলেন। দিল্লি থেকে কাঠমাণ্ডুতে এসেছিলেন চার দিন আগে। অমল সোমের ঠিকানা লেখা পাশে ব্র্যাকেটে বিষ্ণুচরণ পত্রনবীশ লেখা। এইটে পড়ে সোজা হয়ে বসল অর্জুন। বিষ্টুসাহেবের কথা জানবেন কী করে সত্যেন্দ্রনাথ? উনি কি এখানে আসার আগে কালিম্পং-এ গিয়েছিলেন? অমলদার ঠিকানায় নিচে লেখা আছে, ভারতীয় গোয়েন্দাদের সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই, এই লোকটির সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। ডায়েরির শেষ পাতায় কয়েকটা নম্বর লেখা। কী মনে হতে অর্জুন একটা কাগজে নম্বরগুলো লিখে নিল। A2501/C/Q/B, A8972/C/Q/B, A11121/C/M.1 এগুলো কিসের নম্বর বুঝতে পারল না সে। ডায়েরিটা রেখে দিয়ে অন্য জিনিসপত্র তন্নতন্ন করে দেখে যখন হতাশ হচ্ছিল, তখন স্যুটের ভেতরের পকেটে একটা কার্ড পেল সে। কার্ডে সত্যেন্দ্রপ্রসাদের নাম-ঠিকানা লেখা। নিউইয়র্কের কুইন্সে থাকতেন ভদ্রলোক। কার্ডের পেছন দিকটায় চোখ বোলাতে গিয়ে সে শক্ত হল। পরিষ্কার ইংরেজিতে লিখে রেখেছেন ভদ্রলোক, 'ভারতবর্ষে যাচ্ছি। যে কোনওদিন আমি খুন হতে পারি। জোন্স অ্যান্ড জোন্স যে দায়িত্ব দিয়েছে তা পালন করবই। যদি আমার মৃত্যু হয় তা হলে এই কার্ড যিনি পাবেন তিনি অবিলম্বে আমার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে বাধিত হব।' কার্ডটা রাখতে গিয়েও মন পালটাল সে। এই ঘরে এখন কেউ নেই। হয়তো অন্যায়, কিন্তু সে নিজের পকেটে ওটাকে চালান করে দিল।

তখনই তার বিশ্বাস হল সত্যেন্দ্রনাথ আত্মহত্যা করেননি। জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির হয়ে কোনও কাজ করতে তিনি এসেছিলেন এখানে। তিনি নিজের মৃত্যুর আশঙ্কা আছে জানতেন, তিনি আত্মহত্যা করবেন কেন? তা ছাড়া সে যখন ঘরে ঢুকেছিল তখন দরজা ভেজানো ছিল। এমনকী বাথরুমের দরজাটাও ভেতর থেকে বন্ধ ছিল না। এইভাবে সব খুলে রেখেই কেউ আত্মহত্যা করে নাকি। সত্যেন্দ্রনাথ যখন অমলদার বাড়িতে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে মোটেই নার্ভাস দেখাচ্ছিল না। বরং লোকটাকে মেজাজি দাম্ভিক বলে মনে হয়েছিল। আত্মহত্যা করতে চাইবার আগে কেউ মুরগির অর্ডার দেয় কি? অর্জুন খুব নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। কিন্তু একথাও ঠিক, দুটো হাত বেঁধে তবেই শিরা কাটা যায়। যার হাত বাঁধা হবে, সে বাধা দেবে না? প্রাণের জন্য লড়াই করবে না? তাহলে তো তার চিহ্ন সত্যেন্দ্রনাথের শরীরে থাকত!

ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না অর্জুন। এই সময় তার সিগারেট

খাওয়ার ইচ্ছে হল। যদিও সে বাইরে বয়স্ক মানুষের সামনে কখনও সিগারেট খায় না। সহদেবদা মনে হয় এঘরে এখনই ঢুকবেন না। সে সিগারেট বের করে দেশলাই বের করতে গিয়ে লাইটারটার স্পর্শ পেল। জোন্স অ্যান্ড জোন্স, এই কোম্পানির দায়িত্ব নিয়ে, এখানে এসে সত্যেন্দ্রনাথ মারা গেলেন। সে প্রথম বোতামটা টিপে অদৃশ্য আগুনে সিগারেট ধরাতে গিয়েই চমকে উঠল। যদি এর দ্বিতীয় বোতামটা সুধাময় সান্যালের জ্ঞান অনুযায়ী সক্রিয় হত তাহলে অদৃশ্য রে দশ ফুট পর্যন্ত ছুটে গিয়ে হাতিকেও অবশ করে দিতে পারত। মানুষ তো অজ্ঞান হতই। আর একটা জ্ঞানহীন মানুষের হাতের শিরা কেটে দেওয়া শিশুর পক্ষেও সহজ।

তার মানে জলপাইগুড়ি শহরে জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর আসল লাইটার এসেছে। খুনি সেটাই ব্যবহার করেছে? সত্যেন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই সে ভদ্রভাবে দেখাতে গিয়েছিল লাইটারটা। সত্যেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন ওটা জাল। তাই কোনও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবেননি। সুধাময় সান্যালের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে আততায়ী সরাসরি দ্বিতীয় বোতাম টিপে সত্যেন্দ্রনাথকে অজ্ঞান করে বাথরুমে টেনে নিয়ে গিয়ে হাতের শিরা কেটেছেন। ওই ব্লেড সত্যেন্দ্রনাথই ব্যবহার করেন। তাঁর দাড়ি কামাবার কিট্‌সে ওই ব্লেড আরও আছে।

প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ল অর্জুন। এই মৃত্যু-রহস্য সে এত দ্রুত সমাধান করবে ভাবতে পারেনি। আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে করছিল। অমলদা শহরে থাকলে শাবাশ দিতে বাধ্য হতেন। এখন তো সব ব্যাপার জলের মতো পরিষ্কার। কে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে লাইটার দেখাতে যেতে পারে? কাল সুধাময় সান্যালের কাছে গিয়ে সে পরিচয় জেনে এসেছে। সহদেবদাকে এখনও লাইটারের কথা বলা হয়নি। ওকে অ্যারেস্ট করানোর পর সে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলবে। সে আরও চমকিত হল। হরিপ্রসাদ কি সত্যেন্দ্রনাথের আত্মীয়? দু'জনের উপাধি তো এক। হরিপ্রসাদ গতকাল সুধাময় সান্যালের কাছে গিয়েছিল লাইটার পরীক্ষা করাতে। জাল জিনিসটা সরিয়ে রেখে সে আসল জিনিস নিয়ে গিয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। পরিচিত মানুষ দেখে তিনি ঘরে বসাতে আপত্তি করেননি। আর সেই সুযোগে কাজ হাসিল করেছে হরিপ্রসাদ। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। হরিপ্রসাদ কেন সুধাময় সান্যালের কাছে যাবে লাইটার দেখাতে? একজন সাক্ষী কেউ রেখে দেয়? তা ছাড়া লাইটারটার বিশেষত্ব তার অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ যখন খুন হয়েছেন তখন হরিপ্রসাদ তার বাড়িতে ছিল না। এটা তো সে নিজের চোখেই দেখে এসেছে।

গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন সহদেবদা। অর্জুন কারণ জিজ্ঞেস করল। সহদেবদা বললেন, "একটু আগে এস. পি. সাহেব ফোনে জানিয়েছেন যে,

সত্যেন্দ্রনাথের বডি যেন ডিফর্মড না হয় তার ব্যবস্থা করতে। কলকাতায় আমেরিকান দূতাবাসে পাঠাতে হবে বরফের বাক্সে ভরে। এ-শহরে ওসব জিনিস যে পাওয়া যায় না তা কি এস. পি. জানেন না ?"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি সত্যেন্দ্রনাথের খুনিকে ধরতে চান ?"

"খুনি ! কী আজেবাজে বকছ ? ওই ঘরে সত্যেন্দ্রনাথ যাওয়ার পর তুমি ছাড়া কেউ ঢোকেনি," সহদেবদা হাসলেন, "কাউকে অ্যারেস্ট করতে হলে তোমাকেই তো করতে হয়। মাথা থেকে ভূত তাড়াও। সত্যেন্দ্রনাথ রায়কে কেউ খুন করেনি। অমলবাবুর সঙ্গে থাকতে থাকতে তুমি সব ব্যাপারেই রহস্যের গন্ধ পাও।" ওঁর কথা শেষ হওয়ামাত্র টেলিফোন বাজল।

রিসিভারটা কানে লাগিয়ে কথা বলতে-বলতে একটু উত্তেজিত হলেন সহদেব বকসি। তারপর "ঠিক আছে, আসছি," বলে ওটাকে রেখে দিয়ে বললেন, "একটু নিশ্চিন্তে থাকতে পারব না। লোকটা আর অ্যাকসিডেন্ট করার সময় পেল না।"

"অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে ?" অর্জুন কৌতূহলী হল।

"হ্যাঁ। ঠিক কদমতলার মোড়ে। গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন ভদ্রলোক। বোধহয় ব্রেক ফেল করায় রাস্তায় পাশে একটা দেওয়ালে সরাসরি ধাক্কা মারেন। বলছে তো স্পট ডেড।" সহদেব বকসি যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। অর্জুনের মন-খারাপ হল। কেন যে ড্রাইভাররা একটু ধীরেসুস্থে গাড়ি চালায় না ! কোন গরিব মানুষের সংসার গেল কে জানে ! সে জিজ্ঞেস করল, "সত্যেন্দ্রনাথের খবর নিতে আর কেউ আসেনি, না ?'

"না", সহদেব বকসি বেরিয়ে এসে জিপ আনতে হুকুম দিলেন, "মিস্টার রায় হয়তো এতক্ষণে স্পটে আমাকে না দেখে এস. পি.-কে কমপ্লেন করে ফেলেছেন। এই একটা শহর, যা বড়লোকদের শাসনে চলে। তুমি কোন্ দিকে যাবে ?"

"মিস্টার রায় মানে ?"

"শিল্পসমিতিপাড়ার রায়বাড়ির কর্তা। তাঁরই ছোট ছেলে তো ওই কাণ্ড ঘটিয়েছেন।"

"ছোট ছেলে ?" অর্জুন উত্তেজিত হয়ে উঠল, "হরিপ্রসাদ রায় অ্যাকসিডেন্ট করেছে ?"

জিপ এসে গিয়েছিল। সহদেব বকসি তাতে উঠে বসতেই অর্জুন ছুটে গেল, "আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি ?"

একটু বিস্মিত সহদেব বকসি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললেন। অর্জুন জিপে উঠে পড়ল। গোটাচারেক সেপাই রয়েছে পেছনে। অর্জুন তখনও বুঝতে পারছিল না, "আপনি ঠিক শুনেছেন ? হরিপ্রসাদ রায় অ্যাকসিডেন্ট করেছে ?"

"নামটা শুনিনি। রায়বাড়ির ছোট ছেলে বলল। সিরিয়াস

হেড-ইনজুরি।”

অর্জুন মাথা নাড়ল। রায়বাড়ির অনেক মানুষ। হরিপ্রসাদ জলপাইগুড়ি শহরে কেন দুর্ঘটনা ঘটাতে যাবে। সত্যেন্দ্রনাথের খুনি এত সহজে...বিশ্বাস করতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে করছিল না। যেতে যেতে অনেকবার সহদেব বকসিকে লাইটারটার কথা বলতে গিয়েও সামলে নিল সে। দেখা যাক, আর একটু অপেক্ষা করলে ক্ষতি কী!

থানা থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা সোজা। যদিও দু'পাশে প্রচুর দোকানপাট, সিনেমা হলের ভিড়, কিন্তু পুলিশের ড্রাইভার জানে কী করে গাড়ি চালাতে হয়। কদমতলার কাছে পৌঁছে দেখল বেশ ভিড় সেখানে। পুলিশ লেগে গেল কাজে। সহদেব বকসির সঙ্গে অর্জুনও পৌঁছে গেল গাড়িটার কাছে। যে গাড়িকে দেখবে বলে অর্জুন তৈরি ছিল এটা সেটা নয়। গত বিকেলে দেখা সত্যেন্দ্রনাথের ধুলোয় মাখা গাড়ির বদলে একটা সাদা ফিয়াট দুমড়ে পড়ে আছে। ড্রাইভারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। সহদেব বকসি প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ নিচ্ছিলেন। গাড়িটা আসছিল একটু বেশি গতিতেই। পাশের মিষ্টির দোকানের মালিক বললেন, “ভদ্রলোক ঠিকই চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলাম ওঁর হাত স্টিয়ারিং থেকে পড়ে গেল। মাথাটা একদিকে হেলে পড়ল। ব্যস, দড়াম করে গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে আছড়ে পড়ল ওখানে।”

এক ডাক্তারবাবু সাইকেলে যাচ্ছিলেন সেই সময়। তিনি বললেন, “স্পষ্ট দেখলাম, হার্টঅ্যাটাক কেস। অ্যাকসিডেন্ট হবার আগেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর মাথাটা স্ম্যাশড হয়েছে। স্পট ডেড।” কথাবার্তা বলে বোঝা গেল ভদ্রলোকের হৃদযন্ত্র বন্ধ হবার কারণেই ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আর কেউ আহত হয়নি।

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। তার মাথাটা এখন খালি। কিছুই চিন্তা করতে পারছিল না সে। রায়বাড়ির ছোট ছেলে হরিপ্রসাদ রায় মারা গিয়েছেন এ-কথা জানার পর সে কোনও নতুন কিছু ভাবতে পারছিল না।

সহদেব বকসি থানায় না ফিরে হাসপাতালে ছুটলেন। অর্জুন তাঁর সঙ্গ নিল। সেখানে তখন হৃদয়বিদারক দৃশ্য। রায়বাড়ির কর্তা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাঁকে ঘিরে সেবা করছে কয়েকজন আত্মীয়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অনেকেই। খবর পেয়ে আসছেন শহরের গণ্যমান্যরা। সহদেব বকসির কাছ থেকে সরে এল সে। হরিপ্রসাদ রায় সত্যিই জীবিত নেই। ঠিক সেই সময় তার পাশে এক ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে। ফর্সা, লম্বা, মধ্যবয়স্ক মানুষটি গম্ভীর, উদ্‌ভ্রান্ত কিন্তু শোকের উগ্র প্রকাশ নেই। চেহারায় বোঝা যাচ্ছে ইনি রায়বাড়ির একজন। অর্জুনের মনে হল, এঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। সে খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, “এটা কি হার্ট অ্যাটাক থেকে হল?’

pathagar.net

ভদ্রলোক মুখ ফেরালেন। ওঁর চোখে যেন পরিচিত ভঙ্গি ফুটল। তারপর ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন, "ডাক্তাররা বলতে পারবেন কখন কার হার্ট অ্যাটাক হয়, আমি কখনও ওর বুকের দোষ আছে বলে জানতাম না। কী করে যে এমন হল! ওর হার্ট তো ভালই ছিল।"

"উনি কি ড্রিঙ্ক করতেন?"

"না, না। নেভার। আমেরিকায় থেকেও মদ ছোঁয়নি। আমি মাঝে-মাঝে খাই বলে রাগ করত। মদ সিগারেট কিছুই খেত না।" ভদ্রলোক চোখের জল মুছলেন।

"উনি আপনার কে হন?"

"হরি আমার ছোট ভাই।"

"ও। আমার নাম অর্জুন। সত্যসন্ধানী অমল সোমের সহকারী।"

"আপনাকে চিনতে পেরেছি ভাই।"

"কিন্তু আপনি বোধহয় সত্যি খবর জানেন না। হরিপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ হয়েছিল। তখন ওর কাছে আমি একটা লাইটার দেখেছিলাম। সিগারেট না খেলে কেউ লাইটার রাখে?"

"ও হো। সেটা একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। এবার যখন ও কলকাতা থেকে এখানে আসে তখন এক প্যাসেঞ্জারের লাগেজ নির্দিষ্ট ওজনের চেয়ে বেশি হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক ওকে অনুরোধ করেন একটা তিন কেজির প্যাকেট যদি হরি ক্যারি করে। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের নিয়ম ভাঙতে চায়নি হরি। কিন্তু কখনও কখনও অনুরোধ এড়ানো সম্ভব হয় না। বাগডোগরায় গেলে সেই ভদ্রলোক প্যাকেট ফিরিয়ে নিয়ে খুব ধন্যবাদ দিয়ে ওই লাইটারটা উপহার দিয়েছিলেন ওকে। বলেছিলেন, 'এ জিনিস ভারতবর্ষে আসেনি।' একই ট্রান্সপোর্টে ওরা শিলিগুড়িতে আসে। কিন্তু দুঃখের কথা, সেই ভদ্রলোকের কিছু মালপত্র ওর মধ্যেই খোয়া যায়। হরি লাইটারটা আমাকে দেখায়। আমরা কিছুতেই খুলতে বা জ্বালাতে পারছিলাম না। আজ মনে পড়ল সুধাময় স্যানালের কথা। হরি ওঁর কাছে গিয়ে সব জেনে এল। তারপর অবশ্য ওর সঙ্গে আমার আর কথা হয়নি। কিন্তু লাইটার ছিল বলেই প্রমাণ হয় না সে সিগারেট খেত।"

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। কিন্তু সে হাসপাতাল ছেড়ে গেল না। এই শহরে দুটো জাল লাইটার এসেছে। প্রথমটি তার পকেটে, দ্বিতীয়টি হরিপ্রসাদ রায়ের কাছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না জানলে অবশ্য কিছুই বলা যাচ্ছে না। কিন্তু এমনও তো হতে পারে হরিপ্রসাদের হার্ট অ্যাটাকই হয়নি। সে সহদেব বকসির কাছে পৌঁছে দেখল তিনি রায়পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলছেন। এর মধ্যে ডাক্তার এসে রায়কর্তার চিকিৎসা শুরু করেছেন। একটু সুযোগ পেয়ে সে সহদেব বকসিকে জানাল, "পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা আজ

পাওয়া যাবে ?"

"কেন ?" স্পষ্টত বিরক্ত হলেন তিনি।

"আমি একটু আগ্রহী।"

"দ্যাখো অর্জুন, তোমাকে আমি স্নেহ করি। কিন্তু সব কিছুর একটা লিমিট আছে। দেখছ এটা দুর্ঘটনা, দিনের আলোয় সকলের সামনে ঘটেছে, আর তুমি তার মধ্যে রহস্য খুঁজছ।"

"আমি দুঃখিত সহদেবদা, তবু আপনি ওটা পেলে আমাকে বলবেন। ওঁর কাছে কী কী পাওয়া গেছে জানতে পেরেছেন ?" অর্জুন শান্ত গলায় প্রশ্ন করল।

"একজন সাধারণ মানুষের কাছে যা পাওয়া যায়। আলমারির চাবি, মানিব্যাগ, চিরুনি। কোনও রহস্যজনক কাগজপত্র পাইনি। স্যাটিসফাইড ?"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "লাইটার ?"

"লাইটার ! এত জিনিস থাকতে লাইটারের কথা বললে কেন ?"

"না, মানে উনি সিগারেট খান কি না জানতে চাইছি।"

"ও, সিগারেট খেলে হার্ট অ্যাটাক হবে, তাই ! সত্যি, কল্পনার দৌড় বটে ! না, কোনও লাইটার সিগারেট পাওয়া যায়নি ওর কাছে।"

ধীরে-ধীরে অর্জুন বেরিয়ে আসছিল হাসপাতাল থেকে। হরিপ্রসাদ লাইটারটা কি বাড়িতে রেখে বেরিয়েছিল ! সেটাই স্বাভাবিক। যে সিগারেট খায় না, সে ওটা সঙ্গে নিয়ে যাবে কেন ? এখনই যদি সে রায়বাড়িতে যায় তা হলে একটা হদিস পাওয়া যেতে পারে।

এই সময় কাটা-গদাইকে দেখতে পেল অর্জুন। হাসপাতালের গেটে দাঁড়িয়ে আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, এখানে কী উদ্দেশ্যে ?"

"তোমাকে ফলো করে এখানে এলাম।"

"সে কী ? কী ব্যাপার ?" অর্জুনের মনে পড়ল গতকাল সিনেমা দেখে বেরোবার সময় কাটা-গদাই তাকে বলেছিল একটা জরুরি কথা আছে। কাটা-গদাই এপাশ-ওপাশ তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "রায়বাবুর ছেলে ছবি হয়ে গেছে, না ?"

হেসে ফেলল অর্জুন। তারপর গম্ভীর হল আবার, "হ্যাঁ, উনি মারা গিয়েছেন।"

"এইটে ওর পকেটে ছিল।" কাটা-গদাই নিজের পকেট থেকে একটা নীল লাইটার বের করে অর্জুনের হাতে দিল। অর্জুন দ্রুত সেটার পেছনে তাকাল, জোন্স অ্যান্ড জোন্স। খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সে, "তুমি পেলে কোত্থেকে ?"

মাথা নাড়ল কাটা-গদাই, "পুলিশকে যদি না বল তা হলে বলতে পারি।"

"ঠিক আছে, বল।"

pathagar.net

"আমার এক শিষ্য বডিটা গাড়ি থেকে টেনে বের করার সময় নিয়েছে। আমি জানতে পেরে বললাম, খুব অন্যায় করেছিস। ফেরত দিতে এসেছিলাম। এখন কী হবে?"

অর্জুন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেটাকে দেখে লুকনো নব্‌ টিপে আনলক্‌ করল। তারপর প্রথম বোতামটা টিপতেই অদৃশ্য ফ্লেম বের হল। সিগারেট ছিল না। একটা কাগজ গর্তর মুখটায় ধরতেই সেটা জ্বলে উঠল। এবার দ্বিতীয় বোতামটা? যদিও সে সুধাময় সান্যালের কাছে দেখেছে হরিপ্রসাদের এই লাইটারটা জাল, তবু ঝুঁকি নিল না। হাতের কাছে একটা কুকুর দাঁড়িয়ে ছিল, সেটার দিকে লক্ষ করে দ্বিতীয় বোতামটা টিপতেই সে ছুটে পালাল।

হতাশ হয়ে অর্জুন বলল, "এটা আমি নিচ্ছি। রায়বাবুদের ফিরিয়ে দেব। এসব আমেরিকান জিনিস। এদেশে কারও কাছে দেখতে পাবে না।"

হাসল কাটা-গদাই, "না অর্জুনভাই, আজকাল তামাম দুনিয়া নেপাল হয়ে এখানে চলে আসে। সেদিন, হ্যাঁ কালকেই, সন্ধেবেলায় রূপমায়ার সামনে একজন কায়দা করে সিগারেট ধরাল। লাইটার টিপল, আলো জ্বলল না, কিন্তু সিগারেট ধরে গেল।"

সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল অর্জুন, "লোকটি কে? হরিপ্রসাদ রায়?"

"না, না। বাঙালি নয় লোকটা। লাল দাড়ি আছে।"

অর্জুনের সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল যেন। লাল দাড়িওয়ালা লোক—যার কাছে এইরকম একটা লাইটার আছে। কে বলতে পারে সেই লাইটারের দ্বিতীয় বোতাম টিপলে রে বের হয় কি না। তার মানে এই শহরে তিনটে লাইটার এখন। যার দুটো জাল, একটা ঠিক।

সে কাটা-গদাইকে জিজ্ঞেস করল, "লোকটাকে আবার দেখলে চিনতে পারবে?"

একটু ভাবল কাটা-গদাই। তরপর বলল, "হ্যাঁ। চিনে নেব। কিন্তু তোমাকে অন্য কথা বলছিলাম। কেসটা খারাপ।"

"কী কেস?" অন্য কিছু শুনতে এখন মোটেই ইচ্ছে করছিল না অর্জুনের।

"পোড়ার পাখা উঠেছে। ও এবার মরবে, তুমি বাঁচাও ওকে।"

"কেন? ও কী করছে?"

"পাজিটা এবার স্মাগলিং-এ নেমেছে। আমার সঙ্গে দুশমনি থাকলেও ছেলেবেলার বন্ধু তো! তাই খারাপ লাগে। এতদিন রূপশ্রী হলে ব্ল্যাক করছিল, সে ঠিক আছে। কিন্তু এখন বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যায়। টানা মাল নিয়ে বাজারে বিক্রি করে।"

"কিন্তু পোড়া-গদাই আমার কথা শুনবে কেন?"

"শুনবে। তোমার দাদাকে আমরা ভয় পাই। তুমি তো তারই শিষ্য।"

হঠাৎ অর্জুনের মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। সে জিজ্ঞেস করল,

"পোড়া-গদাইকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো ?"

"ওর বাড়িতে। সেনপাড়ায়। যাবে তুমি ?"

"যাব। আমাকে দূর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে তুমি চলে যেও।"

"হ্যাঁ। আমি পোড়ার বাড়িতে যাই না। পাজিটা বহুত বদমাস। নেহাত ছেলেবেলার বন্ধু, তাই !"

॥ পাঁচ ॥

দূর থেকে পোড়া-গদাইয়ের বাড়িটা দেখিয়ে নেমে পড়ল কাটা-গদাই রিকশা থেকে। যাওয়ার সময় বলল, "পোড়া যদি তোমায় বেইজ্জত করে তা হলে আমায় বলবে। আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি।"

অর্জুন আপত্তি করল, "না, না, তোমাকে দাঁড়াতে হবে না। আমারটা আমি বুঝব।"

টিনের চালা আর কাঠের দেওয়ালে তোলা দু'খানা ঘর হল পোড়া-গদাইয়ের বাড়ি। একটা বাচ্চা ছেলে সামনে বসেছিল। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, "গদাইবাবু বাড়িতে আছে ?"

ছেলেটা ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ। এবং, তখনই ভেতর থেকে ফ্যাঁসফেসে গলায় চিৎকার ভেসে এল, "কে, কে ডাকে ?"

গলা তুলে অর্জুন নিজের পরিচয় জানাতেই একটা খালি গায়ে লুঙ্গি পরা লোক বেরিয়ে এল। লোকটার মুখের একটা দিক বীভৎসভাবে পুড়ে গেছে। বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। পোড়া-গদাই অর্জুনকে দেখে অবাক হল। বোঝা যাচ্ছে সে ওকে চিনতে পেরেছে। অর্জুন হাসল, "তোমার সঙ্গে আমার একটু জরুরি কথা আছে গদাই।"

পোড়া-গদাই চারপাশ তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি একা ?"

"হ্যাঁ।" অর্জুন মাথা নাড়ল।

"কী ব্যাপার বলুন তো ?"

অর্জুন বলল, "ব্যাপারটা তোমার জন্যই। কিন্তু এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো কথা বলার সুযোগ হবে না। আমি একটু ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই।"

"আপনি কী বলবেন আমি বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, আপনি ভেতরে আসুন। ঘরে বসে কথা বলতে পারি।" পোড়া-গদাই ওকে রাস্তা দেখিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। ঘরে একটি বউ বসে কাজ করছিল। নতুন লোককে দেখে ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেল বাইরে। অর্জুন দেখল একটা তক্তাপোশের ওপর ময়লা বিছানা। পাশের নড়বড়ে চেয়ারে বসল সে।

পোড়া-গদাই খাটে বসে বলল, "গরিবের বাড়িতে এলেন, কী ব্যাপার ?"

অর্জুন বলল, "আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তুমি আমাকে তুমি

বলতে পার। যদি অবশ্য তুমি চাও তা হলে আমি আপনি বলতে পারি। আমার আপনিই বলা উচিত!"

'না, না, যা আছে তাই থাক। 'তুমি' শুনতেই ভাল লাগবে।"

"দ্যাখো গদাই, আমি তোমার সম্পর্কে কিছু-কিছু কথা জানি। তোমাকে যা বলব তা কেউ জানে না, তুমি যা বলবে তাও কেউ জানবে না। পুলিশ তো নয়ই, যদি তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা কর। এখন বল তো, গত দু'দিনে তোমার সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করেছিল?" অর্জুন সরাসরি চোখের দিকে তাকাল। মুহূর্তে পোড়া-গদাই চোখ নামাল, তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "অনেক লোকই রোজ নানান ধান্দায় দেখা করে। আপনি কার কথা বলছেন যদি জানি না!"

অর্জুন বলল, "তোমার অচেনা লোক। জলপাইগুড়িতে থাকে না। কখনও দ্যাখোনি তাকে তুমি।"

পোড়া-গদাইয়ের চোয়াল শক্ত হল, "আপনি কী করে জানলেন?"

অর্জুন বুঝতে পারল সে ঠিক জায়গায় হাত দিয়েছে। কিন্তু খুব সাবধানে জাল গোটাতে হবে। সে বলল, "দ্যাখো গদাই, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। তুমি এমনিতেই আইনের চোখে অপরাধ করেছ। এখনও অবশ্য পথ খোলা আছে। ভেবে দ্যাখো।"

"ঠিক আছে। আপনি কতটা জানেন তা আরও বলুন। এসব তো ধোঁয়া-ধোঁয়া কথা।"

আচমকা ঢিল ছুঁড়ল অর্জুন, "সেদিন তুমি এয়ার লাইনসের গাড়ি থেকে একটা ব্যাগ সরিয়েছ?"

হকচকিয়ে গেল পোড়া-গদাই, "কী যা-তা বলছ? আমি ওখানে যাব কেন?"

"তুমি শিলিগুড়িতে যাও না?"

এবার মাথা নিচু করল পোড়া-গদাই। কিন্তু কোনও জবাব দিল না। অর্জুন আবার জিজ্ঞেস করল, "কথা বলছ না কেন? সিনক্লেয়ার হোটেলে যখন গাড়িটা পৌঁছল তখন একটা ব্যাগ পাওয়া যায়নি। তাই তো?" পোড়া-গদাই এবারও কথা বলল না। অর্জুন ওঠবার ভঙ্গি করল, "তুমি যখন জবাব দিচ্ছ না, তখন আমার কিছু করার নেই। সহদেব বকসি এবার আসবে তোমার কাছে।"

"না", প্রায় চিৎকার করে উঠল পোড়া-গদাই, "আপনি পুলিশকে কিছু বলবেন না, পায়ে পড়ি।"

"কেন?"

"ছেলে-বউ না খেয়ে মরবে।" প্রায় ককিয়ে উঠল পোড়া-গদাই।

"যখন অন্যায় করো তখন মনে থাকে না কথাটা?"

"বিশ্বাস করুন, লোভে পড়ে করেছি। বাজে ছবি এলে কে ব্ল্যাকে টিকিট

pathagar.net

নেবে বলুন। এখন কাটাটার খুব বাজার যাচ্ছে, ফি সপ্তাহে হিট ছবি আসে রূপমায়াতে। রূপশ্রীতে যত রদ্দি সিনেমা। তাই একজন লোভ দেখিয়েছিল বলে দুদিন গিয়েছিলাম।"

"ব্যাগের ভেতর কী ছিল?"

"কোনও লাভ হয়নি ব্যাগ এনে। তিনটে বাক্স ছিল। চল্লিশটা করে লাইটারের মতো দেখতে অথচ লাইটার নয় এমন জিনিস। কোনও মুখ নেই। বাজারে বিক্রি করতে চাইলে কেউ কিনবে না।"

এত দ্রুত সাফল্য আসবে অর্জুন ভাবতে পারেনি। তিন বাক্স লাইটার। জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর হতেই হবে ওগুলো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আসল না জাল। যে লোকটা হরিপ্রসাদ রায়কে জাল লাইটার দিয়েছে, সে নিশ্চয়ই অত অসতর্কভাবে আসল লাইটার তিনটে বাক্সে আনবে না। কিন্তু জলপাইগুড়ির রাস্তায় আর একটি লোককে সেই লাইটারে সিগারেট ধরাতে দেখা গিয়েছে। ওই লোকটিই কি হরিপ্রসাদের সঙ্গে এক ফ্লাইটে এসেছে এই বাক্সগুলো নিয়ে! অর্জুন বাক্সগুলো দেখতে চাইল। খানিকটা ইতস্তত করে পোড়া-গদাই একটা ব্যাগ নামিয়ে আনল মাথার ওপরের একটা আধা সিলিং থেকে। তিনটে বাক্স ছিল ব্যাগটায়। তিনটেই খোলা হয়েছে। এবং কয়েক ডজন নীলাভ লাইটার পড়ে আছে তাতে। একটা তুলে নিয়ে সে পকেটে পুরল। পোড়া-গদাইয়ের সামনে খোলার কায়দাটা দেখিয়ে দিলে এগুলোকে আর পাওয়া অসম্ভব হবে। সে বলল, "তুমি এখনই এই বাক্সটা নিয়ে থানায় চলে যাও। সহদেব বকসি যদি ফিরে আসেন, তা হলে তাঁকে বলবে আমি পাঠিয়ে দিলাম, উনি যেন যত্ন করে রেখে দেন।"

পোড়া-গদাই দ্রুত মাথা নাড়ল, "না, না, আমাকে থানায় পাঠাবেন না। দারোগাবাবু বলেছেন যেন কখনও আমার মুখ দর্শন করতে না হয় ওঁকে। লোকটাকে আমার খুব ভয় লাগে।"

অর্জুন বুঝল কথাটা মিথ্যে নয়। সে পোড়া-গদাইকে বলল, "দ্যাখো, আমি এটা ঠিক করছি না। তোমাকে এক্ষুনি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত, ব্যাগ চুরি করার অপরাধে। কিন্তু তোমার বন্ধু কাটা-গদাইয়ের অনুরোধে একটা সুযোগ দিতে চাই। তুমি আর জলপাইগুড়ি শহরের বাইরে গিয়ে এইসব কাজ করবে না। হয়তো কত নিরীহ মানুষ তোমাদের হাতে এইভাবে সর্বস্ব হারায়। তুমি শহরের মধ্যে খেটে রোজগার করতে পারো না ভাল পথে? ওই বাচ্চাটা বড় হয়ে তোমাকে চোর বলবে সেটা ভাল লাগবে? তোমরা সিনেমা হলের টিকিটের ব্যবসা ছেড়ে দাও। দেখছ তো, ওতে প্রত্যেক সপ্তাহে আয় হয় না। তার চেয়ে বাজারে আলু-বেগুন নিয়ে বসলে অনেক বেশি লাভ। যাক, এই বাক্সগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি থানায়, তুমি কাটা-গদাইয়ের জন্য এ-যাত্রায় রক্ষে পেলে, মনে থাকে যেন।" কথাগুলো একটানা বলে অর্জুন ব্যাগটা বন্ধ করে

বাইরে বেরিয়ে এল।

পেছন-পেছন পোড়া-গদাই আসছিল। সে এবার কেমন গলায় জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, সত্যি কাটার জন্য আপনি আমাকে ছেড়ে দিলেন? কাটা আমাকে ছাড়তে বলেছে?"

"হ্যাঁ। ও তোমাকে এখনও ভালবাসে। ও চায় তোমার ভাল হোক।"

"কিন্তু ব্ল্যাক নিয়ে ও হুজ্জুতি করে কেন?"

"টিকিটের ব্ল্যাক করা বন্ধ হলে আর ওটা করবে না।" অর্জুন কথাগুলো বলে ভাবল ওকে সঙ্গে আসতে নিষেধ করবে। কাটা-গদাই নিশ্চয়ই এখনও অপেক্ষা করছে। কিন্তু তারপরেই ভাবল, দেখা যাক দু'জনে মুখোমুখি হয়ে কী করে!

কাটা-গদাই দাঁড়িয়ে ছিল একটা গাছের নীচে। ওদের আসতে দেখে ওর চোখ যেন কপালে উঠেছিল। তাকে ওখানে দেখতে পাবে ভাবতেও পারেনি পোড়া-গদাই। সে যেন কেমন মিইয়ে গেল।

অর্জুন কাটা-গদাইকে বলল, "তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ভাই। এই ব্যাগটাকে থানায় দারোগাবাবুর কাছে আমার নাম করে পৌঁছে দিতে হবে।"

পোড়া-গদাইয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কাটা-গদাই বলল, "যেন এসব এনেছে তাকে বলছেন না কেন? নিজের পাপের নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করুক।"

হঠাৎ পোড়া-গদাইয়ের ভাবান্তর দেখা গেল, "ঠিক বলেছে ও। আমাকে দিন, আমিই পৌঁছে দিচ্ছি। দারোগাবাবু যদি মুখ দেখে গরাদে পোরে তো তাই হোক।"

এবার কাটা-গদাই এগিয়ে এসে ব্যাগটা নিজের হাতে নিল, "থাক, যথেষ্ট হয়েছে। আমি চলি। আপনি কোন্ দিকে যাবেন?"

অর্জুন হাসল, "আমি জেলাস্কুলের পাশ দিয়ে অমলদার বাড়িতে যাব।"

কাটা-গদাই ব্যাগটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করলে দেখা গেল পোড়া-গদাই তার সঙ্গী হল। দু'জনে পাশাপাশি হাঁটছে, কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। রাস্তাটা অনেক লম্বা, অর্জুন বুঝতে পারল, সে একটা ভাল কাজ করেছে। দূরত্বটা শেষ হবার আগে নিশ্চয়ই ওরা আগের মতো কথা বলবে। দু'মাসের জেল নির্যাতি পাওনা ছিল পোড়া-গদাইয়ের। কিন্তু সেটা ওকে এভাবে শোধরাতে পারত না।

পোড়া-গদাই যে ব্যাগ চুরি করে এনেছিল, তাতে জাল-লাইটার রাখা আছে। পথে পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হল অর্জুন। কিন্তু এই জাল লাইটার নিয়ে এত জায়গা থাকতে আমেরিকা থেকে ডুয়ার্স-এ আসছে কেন লোকগুলো? ধরা যাক, জাল-লাইটারকে আসল বলে চালিয়ে ভাল ব্যবসা করতে চায় ওরা। কিন্তু আসল লাইটারের খবর যেখানকার মানুষ জানে না সেখানে জালের আর কী দাম উঠবে? তা ছাড়া নেপালের দৌলতে এসব অঞ্চলে প্রচুর বিদেশি লাইটার

সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর নকল জিনিস কী বাজার পেতে পারে!

কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার, একটি আসল লাইটার এই শহরে আছে। নকল তিনটে এখন তার কাছে, বাকিগুলি কাটা-গদাই থানায় পৌঁছে দিতে গিয়েছে। তিন-তিনটে লাইটার পকেটে রাখার কোনও যুক্তি নেই। সেই লোকটি এই শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অর্জুনের বিশেষ ধারণা, হরিপ্রসাদকে দুর্ঘটনা ঘটাতে বাধ্য করা হয়েছিল। ওই কদমতলার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে লাইটারের দ্বিতীয় বোতাম টিপে হরিপ্রসাদকে অবশ করে দেওয়া মোটেই কঠিন কাজ নয়। অবশ হয়ে গেলে হাত সরে আসবে স্টিয়ারিং থেকে, পা অকেজো হবে এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু উলটোটাও হতে পারত। হরিপ্রসাদের গাড়ি কোনও পথচারীকে চাপা দিতে পারত এবং সে নিজে সামান্য আহত হয়ে বেঁচে যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে হত্যাকারী নিশ্চয়ই একটা ঝুঁকি নিয়েছে। কাউকে চাপা দেওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল এবং তা ঘটলে হয়তো গণ-ধোলাই-এ হরিপ্রসাদের প্রাণ বেরিয়ে যেত। সুধাময় সান্যালের কথা যদি ঠিক হয় তা হলে রে স্পর্শ করার পাঁচ মিনিট পরে তার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়তো শরীরে থাকবে না। সত্যেন্দ্রনাথের পোস্টমর্টেমে কিছুই পাওয়া যায়নি। কিন্তু এসবই তার অনুমান। প্রশ্ন হল হরিপ্রসাদকে হত্যা করতে চাইবে কেন আততায়ী। আর সে ওখানে আসছে তাই-বা জানবে কী করে? এই একই হত্যকারী কী করে সত্যেন্দ্রনাথের শহরে আসার সংবাদ পেল? মাথার ভেতরটায় জট পাকাচ্ছিল অর্জুনের।

অমলদার বাড়িতে পৌঁছে অর্জুন হাবুকে চা বানাতে বলল। ডাকে অর্জুনের কোনও চিঠি আসেনি। চিঠিপত্র এলে, সেটা যদি খুব ব্যক্তিগত না হয়, অমলদা নির্দেশ দিয়ে গেছেন, উত্তর দিতে। আজ সে একটা প্যাকেট পেল। হংকং থেকে প্রকাশিত হয় কাগজটা। কাগজটার নাম 'ক্রাইম অ্যান্ড প্যাশন'। বিখ্যাত রচনার নামে পত্রিকার নাম। অমলদার কাছে দেশ-বিদেশের অনেক অপরাধ-সংক্রান্ত কাগজ আসে। তাদের মধ্যে ক্রাইম অ্যান্ড প্যাশন আর 'ব্রেনওয়েভ' কাগজ দুটোর তুলনা হয় না। প্যাকেট খুলে ক্রাইম অ্যান্ড প্যাশন নিয়ে বসে গেল সে। এবং তখনই মনে পড়ল সত্যেন্দ্রনাথের গাড়ি পাওয়া যায়নি। ভদ্রলোক যদি আমেরিকার নাগরিক হন তা হলে এখানে গাড়ি পেলেন কোত্থেকে। এবং তাঁর মৃত্যুর পর সেই গাড়িটা গেল কোথায়? অর্জুন ঠিক করল সমস্ত ব্যাপারটা সে পর পর কাগজে লিখবে। কোনও পয়েন্ট বাদ দেবে না। তারপর বারংবার সেটা পড়লে হয়তো মাথায় ভিন্ন চিন্তা উঁকি দিতে পারে। অমলদা বলেন, 'সবসময় কোনও ঘটনাকে যেমন দেখছ, তেমন ভেবো না। সবরকম সম্ভাব্য পথে ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা কোরো। প্রি-অকুপায়েড হওয়া মানে তুমি সত্য থেকে সরে যাচ্ছ।"

কাগজটার কভার স্টোরি, ব্যাঙ্ককে তিনটে খুন হয়েছে। তিনটে মানুষকে পোস্টমর্টেম করে কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধু কোনও বিশেষ যন্ত্র দ্বারা তাদের হৃদযন্ত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হলে শরীরে যেসব লক্ষণ ফুটে ওঠে তার কোনও চিহ্ন নেই। এই তিনজন ব্যাঙ্ককের বিখ্যাত স্মাগলার ছিল। তিনজনই বাড়ির বাইরে মারা গিয়েছে। দু'জন দুটো রেস্তোরাঁতে।একজন মারা গিয়েছে গাড়িতে উঠতে গিয়ে।

খবরটা পড়ে অর্জুনের হাতের তালুতে ঘাম জমল। শুধু হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ করে দেবার মতো কোনও অস্ত্র বের হয়েছে নাকি? শরীরে কোনও আঁচড় থাকল না, সামান্য কালশিটে পর্যন্ত নেই, পোস্টমর্টেমে কিছুই ধরা পড়বে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ মনে করবে, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। এই জিনিসটা যদি সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঘটত, তা হলে পুরো ব্যাপারটাই অজানা থেকে যেত তার কাছে। এবং তখনই তার মাথায় আর একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল। যদি জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর আসল লাইটারের দ্বিতীয় বোতাম সরাসরি কোনও মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের দিকে তাক করে টেপা যায় তা হলে...অর্জুন ঠিক বুঝতে পারছিল না তাতে শুধুই হৃদ্‌যন্ত্র অকেজো হয়ে যাবে কি না। পাঁচ মিনিট বাদে পরীক্ষা করলে সবল হবে কি না! তার সামনে পরীক্ষা করার কোনও রাস্তা খোলা নেই। সুধাময় সান্যালের একটা কথা মনে পড়ে গেল, 'ওই রে একটা বড় হাতিকেও পাঁচ মিনিট অবশ করে রাখে।' তা হলে একটা মানুষের হৃদয়যন্ত্র বন্ধ হবে না কেন? কিন্তু একথা কি সত্যেন্দ্রনাথের খুনি জানে না। সে তো স্বচ্ছন্দে দ্বিতীয় বোতামটা ওঁর হৃদ্‌যন্ত্র লক্ষ করে টিপতে পারত। নাকি সে আরও বুদ্ধিমান। ব্যাপারটাকে আত্মহত্যার চেহারা দিতে চেয়েছে হৃদযন্ত্র বন্ধ করে!

পত্রিকাটির পাতা ওলটাতে-ওলটাতে অর্জুনের চোখ একটা বিজ্ঞাপনে আটকে গেল। জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি থেকে বিজ্ঞাপনটা দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞাপনটা পড়ল সে।

'আমরা দুঃখিত। গত তিন বছর ধরে আমরা একটা বিশেষ ধরনের লাইটার তৈরি করছি। এই লাইটার মূলত ফেডারেল বুরো অব ইনভেস্টিগেশন বিভাগের জন্য হলেও সরকারের অনুমতি পাওয়া সার্টিফিকেট দেখালে অল্প কিছু সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। সরকারি আপত্তিতে আর ওই লাইটার বাজারে ছাড়া হচ্ছে না। কিন্তু আমরা লক্ষ করছি কোনও অসৎ ব্যবসায়ীর দল হংকং, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, নেপাল এবং ভারতবর্ষে ওই লাইটারের নকল মডেল চালু করার চেষ্টা করছে। যদিও তারা আমাদের নির্মিত লাইটারের কর্মক্ষমতার অর্ধেকটা আয়ত্ত করেছে, তবু ইতিমধ্যেই নানা বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে যে সব সাধারণ মানুষ বৈধ অনুমতিপত্র দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকে ওই লাইটার কিনেছিলেন, সেগুলো ফেরত নেওয়া

হয়েছে। কিন্তু মাত্র দুটো লাইটারের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। সেই দু'জন মানুষ এখন মৃত। আমরা এই পত্রিকার মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি, জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর তৈরি কোনও লাইটার এখন বাজারে নেই (শুধু ওই দুটি ছাড়া)। কেউ যদি এই কোম্পানির নামাঙ্কিত লাইটার কেনেন, কিংবা সংগ্রহ করেন, তা আইনত দণ্ডনীয় হবে।'

॥ ছয় ॥

ট্যাক্সিটা কখন এসে দাঁড়িয়েছিল টের পায়নি অর্জুন। বিজ্ঞাপন তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। মাত্র দুটো ভাল লাইটার বাজারে ছাড়া আছে। এফ. বি. আই. নিশ্চয়ই চাইছে না সেগুলো সাধারণ মানুষের হাতে থাক। কিন্তু যারা ওই দুটো রেখেছে তারা কি সাধারণ মানুষের পর্যায়ে পড়ে? এফ. বি. আই. খুঁজে পায়নি বলেই জোন্স অ্যান্ড জোন্স এই বিজ্ঞাপন ছেপেছে। কিন্তু হঠাৎ ডুয়ার্সের এই অঞ্চলে লাইটারগুলো আসতে যাবে কেন? অর্জুনের মনে হল, অমলদা থাকলে ব্যাপারটার একটা সুরাহা হয়ে যেত সহজে। দুটো খুন হল, অথচ কে খুনি, তার উদ্দেশ্য কী, তা-ই ধরতে পারল না সে এখন পর্যন্ত।

এই সময় হাবু এসে সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ইশারায় উঠতে বলল। হাবু যা বলে অমলদা তা স্পষ্ট বুঝতে পারেন। অমলদা বলেন, হাবুর ইশারায় রহস্য নেই। যে মন দিয়ে বুঝতে চায় তার কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়। অনেক চেষ্টা করেছে অর্জুন। হাবু বোধগ্রস্ত হলেও মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায়। এই মুহূর্তে কিন্তু অর্জুন বুঝতে পারল।

ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই লোকটাকে দেখতে পেল। জিনসের প্যান্ট, চেক জ্যাকেট পরে যে লোকটা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার শুধু গায়ের চামড়াই নয়, ভাবভঙ্গিও বলে দিচ্ছে, বিদেশি। চোখাচোখি হতে লোকটা হাসল। বছর তিরিশের মধ্যে বয়স। বেশ নাদুসনুদুস চেহারা। মাথায় চুল অল্প।

বারান্দা থেকে নেমে অর্জুন বাগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল কাছে। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা বলল, "হাই! আমল সোম ইজ দেয়ার?"

অমলদার নামটার এমন হাল দেখে অর্জুন অনেক কষ্টে হাসি চাপল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল, "নো। হি ইজ আউট অব দ্য টাউন।"

এখনও ইংরেজি বলতে গেলে তাকে ভাবতে হয়। আগে তো মনে-মনে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে বলতে চেষ্টা করত। এখন ঠিকঠাক শব্দ সময়মতো মাথায় আসতে চায় না কিছুতেই। লোকটার হতাশ প্রতিক্রিয়া সহজেই ধরা পড়ল। নিজের মনেই বলল, "মাই গড! হোয়াট শ্যাল আই ডু নাউ। মে আই আস্ক ইওর গুড নেম প্লিজ?"

"আমি অর্জুন। অমল সোমের সহকারী হিসেবে কাজ করছি। আপনার নাম জানতে পারি ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি জেমস, জেমস ব্রাউন। রয় আমাকে বলেছিল, যদি তার কিছু হয় আমি যেন মিস্টার সোমের সঙ্গে দেখা করি।"

"কে রয় ?" অর্জুন যাচাই করতে চাইল।

"এস. এন. রায়। উনি কি গতকাল এখানে আসেননি ?"

অর্জুন বলল, "আপনি ভেতরে আসুন।" এই সময় ট্যাক্সিওয়ালা বলল, "আমাকে এবার ছেড়ে দিন সাহেব। অনেকক্ষণ থেকে টাউনে এই ঠিকানা খুঁজতে ঘুরছি। পুরো নাম বলতে পারেন না ইনি। শেষ পর্যন্ত থানায় গিয়ে সব জেনে এলেন। আমাকে এখনই শিলিগুড়িতে ফিরে যেতে হবে।"

অর্জুন ইংরেজিতে জেমস ব্রাউনকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আবার শিলিগুড়িতে ফিরে যেতে চাইছেন ? এই ট্যাক্সিওয়ালা দাঁড়াতে চাইছে না।"

জেমস বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমার আজকে এখানেই থাকা দরকার।" কথাটা শেষ করে জেমস পেছনের দরজা খুলে তার লাগেজ নামিয়ে নিয়ে ট্যাক্সিওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিল। লোকটার মানিব্যাগে প্রচুর টাকা দেখতে পেল অর্জুন। ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেলে সে জেমসকে নিয়ে ঘরে ফিরে এল। হাবুকে ডেকে দু'কাপ চা করতে বলে আরাম করে বসল সে, জেমসের মুখোমুখি। রহস্যটা বেশ জম্পেশ হচ্ছে। এই প্রথম নিজেকে বেশ স্বনির্ভর সত্যসন্ধানী বলে মনে হচ্ছে তার। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এস. এন. রায়ের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক ? আর আপনি এখানে আসছেনই বা কোত্থেকে ?"

জেমস এতক্ষণ অর্জুনকে দেখছিল। এবার ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমি কী করে বুঝব তুমি মিস্টার সোমের সহকারী ?"

অর্জুন হেসে ফেলল। তারপরেই মনে হল, সত্যি তো, সমস্ত চেনা মানুষের কাছে তার যে পরিচয়টা জানা, তা অচেনা লোকের কাছে অস্পষ্টই তো হবে। কিন্তু কী দিয়ে প্রমাণ করা যায় ? ওপাশের ঘরে একটা অ্যালবামে অমল সোম আর তার ছবি আছে। কিন্তু তা থেকে কী প্রমাণ হয় ? তা ছাড়া এই লোকটা তো অমল সোমকেই চেনে না। সে বলল, "আমি আপনাকে এই মুহূর্তে কোনও প্রমাণ দিতে পারব না। কিন্তু এই শহরের যে-কোনও মানুষকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন।"

অর্জুনের উত্তর শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল জেমস। তার চোখ মাটির দিকে। মনে হল সে কিছু ভাবছে। তারপরে সে মুখ তুলে ফের অর্জুনের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, "অমল সোম কবে ফিরবেন ?"

"জানি না। উনি শেষ যে চিঠিটা দিয়েছেন তাতে কিছু জানাননি।" বলতে-বলতে অর্জুনের চিঠিটার কথা খেয়াল হল। সে উঠে টেবিল থেকে

চিঠিটা নিয়ে জেমসের হাতে দিল। যদিও বাংলায় লেখা কিন্তু ইংরেজিতে অর্জুনের নাম আর এই বাড়ির ঠিকানা এবং পেছনে শুধু অমল সোম লেখা রয়েছে। সেটা পড়ে যেন জেমসের একটু স্বস্তি হল। অর্জুন এবার জিজ্ঞেস করল, "অমল সোমের খবর আপনি পেলেন কোত্থেকে ?"

"বললাম তো, রয় আমাকে বলেছিল। রয়ের এক আত্মীয় নিউইয়র্কে থাকেন। তাঁর কাছে সে শুনেছিল মিঃ সোম নাকি খুব বুদ্ধিমান ডিটেকটিভ। নর্থবেঙ্গলে কোনও ব্যাপার ঘটলে তিনি সাহায্য করতে পারেন। আমাদের যখন কাঠমাণ্ডু থেকে দিল্লি হয়ে বাগডোগরায় আসা প্রয়োজন হল তখন রয় ঠিক করল ওঁর কাছে আসবে। আমি শিলিগুড়িতে থেকে গিয়েছিলাম। কথা ছিল, আজ সকাল সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। কোনও খবর না পেয়ে এখানে এসে জানলাম হি ইজ ডেড।"

"আপনি কি জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি থেকে আসছেন ?"

প্রশ্নটা শোনামাত্র সোজা হয়ে বসল জেমস, ওর মুখে অদ্ভুত অভিব্যক্তি ফুটল, "হাউ ডু য়ু নো ?"

অর্জুন বলল, "শোনো জেমস। আমি গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেক কিছু জেনে গেছি। কিন্তু আমিও তো জানি না তুমি কে ? সুতরাং তোমাকে কিছু বলার নেই।"

এই সময় একটা জিপ এসে দাঁড়াল বাইরে। গেট খুলে সহদেব বকসি ভেতরে ঢুকলেন।

অর্জুন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আসুন সহদেবদা !"

সহদেব বকসি জেমসের দিকে তাকালেন। জেমস তাঁকে বলল, "হা-ই।"

সহদেব বললেন, "যাক, তা হলে সাহেব এখানে পৌঁছে গেছে। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে এখন। সত্যেন্দ্রনাথ আত্মহত্যা করা মাত্র ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের লোক পৌঁছে গেল জলপাইগুড়িতে। ওকে বললাম, অমলবাবু শহরে নেই, তবু বিশ্বাস করল না। কী বলে এ ?"

অর্জুন বলল, "এখনও কিছু বলেনি। আসলে আমি যে অমলদার সহকারী তা বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও।"

সহদেব বকসি এবার ইংরেজিতে জেমসকে বললেন, "অর্জুন খুব ব্রাইট ছেলে। অমল সোমকে ও সাহায্য করে। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে ওর কী করণীয় আছে বুঝতে পারছি না।"

তারপর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও হ্যাঁ, যে জন্য তোমার কাছে এলাম। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেছে। রায়বাবুর ছেলের হার্ট অ্যাটাক হয়নি। কারণ তার কোনও নিদর্শন ডাক্তার পায়নি। তা হলে ভদ্রলোক অমন করলেন কেন, বোঝা যাচ্ছে না। আর তুমি কী পোড়া-গদাইকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলে ?"

অর্জুন অবাক হয়ে বলল, "হ্যাঁ। কেন, কী হয়েছে?"

"পোড়া-গদাই থানায় এসে বসে ছিল আমার জন্য। সে সময় আমি হাসপাতালে ছিলাম। সে বলছে, তার সঙ্গে একটা ব্যাগ ছিল, যা তুমি আমাকে পৌঁছে দিতে বলেছিলে। হঠাৎ তার শরীর অবশ হয়ে যায়। যখন হুঁশ আসে, তখন ব্যাগটাকে খুঁজে পায় না। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিল বলে পড়ে যায়নি। পুরো ব্যাপারটাই বানানো মনে হচ্ছে। ওর শরীর অবশ হয়ে গেল আর ব্যাগটা কেউ নিয়ে গেল! ইয়ার্কি আর কি! আমি ওকে থানায় আটকে রেখেছি। ওর বন্ধু কাটা-গদাইকেও ছাড়িনি। কী ব্যাপার বল তো?"

অর্জুনের নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হল। পোড়া-গদাইকে থানার মধ্যে কে অবশ করে রাখবে? একটা লোক কখনও নিঃসাড়ে বসে থাকতে পারে? তা হলে কি জলপাইগুড়ির থানার মধ্যে সে স্বচ্ছন্দে ঢুকতে পারে, যার কাছে আসল লাইটার আছে! লোকটা কে? পোড়া-গদাইয়ের দিকে তাক করে দ্বিতীয় বোতাম টিপলে সে মরে গেল না, শুধু অবশ হয়ে বসে রইল! লোকটা জানলই বা কী করে পোড়া-গদাই জাল লাইটার-বোঝাই স্যুটকেসটা নিয়ে থানায় এসেছে! লোকটা যদি নাই চায় জাল লাইটারের কথা পাবলিক জানুক, তা হলে রায়বাবুর ছেলেকে কেন উপহার দিতে গেল। অবশ্য রায়বাবুর ছেলের সহযাত্রী আর এই লোকটি যদি আলাদা না হয়।

সহদেব বকসি জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল? কী ভাবছ?"

অর্জুন চট করে সিদ্ধান্ত নিল না, এখনই সহদেব বকসিকে লাইটারের কথা বলা উচিত হবে না। ব্যাপারটা উনি বিশ্বাসই করবেন না। সে বলল, "ওই স্যুটকেসটা কার বোঝা যাচ্ছিল না বলে পোড়া-গদাইয়ের হাত দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম।"

"কার বোঝা যাচ্ছিল না মানে? পেলে কোথায়?"

"পোড়া-গদাই এনেছিল। ওর কোনও বন্ধু বোধহয় চুরিচামারি করে।"

"চোরাই মাল। কিন্তু থানায় এসে কে নিয়ে যাবে সেটা?"

"যার মাল সে।"

"বুঝলাম। এটা আবার কাউকে বলে বোসো না, থানা থেকেও চুরি যায়। কিন্তু ওই অবশ হওয়ার গল্প। নিজেই সরিয়ে গল্প ফাঁদেনি তো?"

"না, না। তা হলে থানাতেই নিয়ে যেত না। হয়তো মাথা ঘুরে গেছে কোনও কারণে আর সেই ফাঁকে কেউ নিয়ে গেছে ওটা। আপনি বরং ওদের ছেড়েই দিন।"

"ছেড়ে দেব বলছ? ওরা সিনেমায় টিকিট ব্ল্যাক করে।"

"সেটা তো শহরের সবাই জানে।"

"আচ্ছা চলি। পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা জানার পর মেজাজ খিঁচড়ে আছে। ওটা যদি অন্য কিছু হয় তো আমার দফা রফা হয়ে যাবে।" সহদেব বকসি

pathagar.net

জেমস ব্রাউনকে জানান, যদি তাঁর দ্বারা কোনও উপকার হয় তা হলে তিনি সবসময় করতে রাজি আছেন। আপাতত তাঁর থানায় জরুরি কাজ আছে বলে চলে যেতে হচ্ছে।

সহদেব বকসি চলে গেলে জেমস এবার নীরবতা ভাঙল, "জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর নাম তুমি জানলে কী করে ? ইন্ডিয়াতে তো কারোর জানার কথা নয় !"

এই সময় হাবু এসে দুই পেয়ালা চা দিয়ে গেল। জেমসের যেন তার খুব প্রয়োজন ছিল। অর্জুন পকেট থেকে জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর লাইটারটা বের করে জেমসের হাতে দিল। তার পকেটে তখনও দ্বিতীয় লাইটারটা রয়েছে। সেটার কথা সে ইচ্ছে করেই জানাল না।

খুব অবাক হয়ে গেল জেমস, "মাই গড ! তুমি এটাকে কোত্থেকে পেলে ?"

সে দ্রুত লক্ খুলে প্রথম ও দ্বিতীয় বোতাম টিপে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। অর্জুন সেটা লক্ষ করে বলল, "তোমার পকেটেও নিশ্চয়ই একটা রয়েছে ?"

জেমস নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। অর্জুন তখন উঠে সদ্য-আসা পত্রিকার পাতা খুলে বিজ্ঞাপনটা জেমসের সামনে ধরল। তৎপর চোখে বিজ্ঞাপনটা পড়ল জেমস। অর্জুন বলল, "এটা এস. এন. রায়ের লাইটার। উনি গতকাল এখানে এসেছিলেন। যাওয়ার সময় ভুল করে ফেলে গিয়েছিলেন।"

"আই. সি," বলে জেমস ব্রাউন চোখ বন্ধ করল। তারপর বলল, "তুমি যদি কিছু মনে না করো, তা হলে আমাকে বলবে, ঠিক কী কী জানো এবং কেমন করে জানো ?"

অর্জুন বলল, "আমি তোমাকে কী করে বিশ্বাস করব ?"

জেমস চটপট ওর পরিচয়পত্র বের করে দেখাল। সেখানে তার ছবিও আছে। অর্জুন তবু বলল, "এটাও যে জাল নয় তা বুঝব কী করে ?"

জেমস চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, "কী প্রমাণ চাও ?"

অর্জুন এবার হাসল, "জেমস, আমি কিছুটা আন্দাজ করেছি, কিন্তু মিলিয়ে নিতে চাই। তুমি আর এস. এন. রায় কী উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকা থেকে কাঠমণ্ডুতে এসেছিলে ?"

জেমস ব্রাউন অবাক হয়ে গেল। সে বলল, "তোমার বয়স দেখে আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমি বুঝতে পারছি তুমি কিছু তথ্য জেনে গেছ। গতকাল রয় এখানে না আসার ব্যাপারে তো তোমার কোনও জ্ঞান হওয়া সম্ভব ছিল না। রয় বলেছিল, অমল সোমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তিনি নেই। তুমি তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট। ঠিক আছে, আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি। কিন্তু এই ঘরে কথা বলা কি নিরাপদ ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "এই ঘরের ধারেকাছে কেউ এলে সে হাবুর চোখে

পড়বেই। ও কথা বলতে পারে না বলেই বোধহয় অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো খুব সজাগ। তুমি শুরু কর।”

জেমস ব্রাউন শুরু করল, “এস. এন. রায় জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর তৈরি লাইটার সম্পর্কে তুমি কি...”

“আমি সব জানি। যারা জাল লাইটার তৈরি করেছে তারা সব পেরেছে শুধু রে তৈরি করতে পারেনি।”

“মাই গড। ভারতীয় তরুণরা এত বুদ্ধিমান হয় আমার জানা ছিল না। হ্যাঁ, যারা ওই লাইটার জাল করছে তারা সেকেন্ড বোতামটা টিপে রে বের করার কৌশলটা আয়ত্ত করতে পারেনি। কিন্তু তাতেই কোম্পানির যা ক্ষতি হবার হয়ে যাচ্ছে। জোন্স অ্যান্ড জোন্স ফেডারেল ব্যুরোকে সাপ্লাই দিত। বাজারে যা ছেড়েছিল লাইসেন্সের বদলে তা তুলে নিয়েছিল সরকারের আপত্তিতে। শুধু দু'জন জানিয়েছিল তারা লাইটার হারিয়ে ফেলেছে। আমরা দেখেছি লোক দুটোর মিথ্যে বলার কোনও কারণ নেই। কিন্তু ওই দুটো লাইটার বাজারে এমন লোকের হাতে গিয়েছে যা শুধু অপরাধীদের হাত শক্ত করবে না, এফ. বি. আই.-কে পর্যন্ত বিভ্রান্ত করছে। প্রতিটি লাইটার পরীক্ষা না করে আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না, ওটা ঠিক না জাল।

“জোন্স অ্যান্ড জোন্স এবং এফ. বি. আই. যুক্তভাবে ওই লাইটার দুটো উদ্ধার করতে চায়। এই মুহূর্তে কয়েকটা দল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দুটো আসল লাইটার খুঁজে যাচ্ছে। মোটামুটি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলাম। হংকং, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, থাইল্যান্ড অঞ্চলে জাল লাইটার তৈরি হচ্ছে। এবং আমাদের বিশ্বাস করার পেছনে যুক্তি আছে যে জাল লাইটার যারা তৈরি করছে তাদের কাছেই আসলটি রয়েছে। দিন বারো আগে আমাদের কাছে খবর এল, সন্দেহভাজনদের একজনকে কাঠমাণ্ডুতে দেখা গেছে। তারা চাইছে ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে লাইটারগুলোর ব্যবসায়িক এলাকা বিস্তৃত করতে। আমরা ভারত সরকারকে ব্যাপারটা জানিয়েছি। কিন্তু আমাদের হাতে হঠাৎ একটি লাইটার এল। ওগুলো দেখতে অবিকল জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর তৈরি লাইটারের মতো। প্রথম বোতাম টিপলে ফ্লেম দেখা যায় না কিন্তু সিগারেট ধরানো যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে শুরু হয়ে যায় চার্জ। দশ সেকেন্ডের মধ্যে দ্বিতীয় বোতাম টিপে ছুঁড়ে দিলে একটা শক্তিশালী গ্রেনেডের চেয়ে বেশি কাজ করে। ওরা রে আবিষ্কার করেনি, কিন্তু লুকানো গ্রেনেড আবিষ্কার করে ফেলেছে। বুঝতেই পারছ, এই লাইটারগুলি তাদের কাছে কতখানি মূল্যবান, যারা ওটা ব্যবহার করতে চায়। হোয়াইট হাউসে বেড়াতে গিয়ে সিগারেট ধরাবার নাম করে কেউ যদি ওটা ব্যবহার করে, তা হলে যা হবে কল্পনা করতে চাই না আমরা। সিঙ্গাপুরে যে-লোকটি ধরা পড়েছে সে আমাদের জানিয়েছিল,

ওরা তরাই অঞ্চলটাকে ঘাঁটি করতে চায়। এখান থেকে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন প্রভিন্স, বাংলাদেশ এবং নেপাল, ভুটানকে বাজার তৈরি করবে। লোকটার কথা বিশ্বাস করার কারণ আছে, পরদিনই পুলিশের হেফাজতে লোকটি মারা যায়। তার হৃৎপিণ্ড শুধু অচল হয়ে গিয়েছিল। আমরা বিশ্বাস করি, ওটা জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর আসল লাইটার ব্যবহার করে করা হয়েছিল। এনি ওয়ে, উই ওয়ান্ট টু স্টপ দিস! আমরা যখন এই অঞ্চলের ম্যাপটা স্টাডি করছিলাম, তখন লক্ষ করলাম, ইন্ডিয়ান পুলিশ দীর্ঘ এলাকাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। এই সময় রয় অমল সোমের কথা বলল। পাঙ্কদের সঙ্গে ওঁর নাকি একটা এনকাউন্টার হয়ছিল, এবং তাদের কাছ থেকে একটি মেয়েকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই রিপোর্ট নিউইয়র্ক টাইমসে ছাপা হয়েছিল এবং রয় ওর এক আত্মীয়ার মাধ্যমে জেনেছিল। সেই আত্মীয়ার দাদা বোধহয় অমল সোমের পরিচিত। সুতরাং এই ঠিকানা পেতে আমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি। আমরা ঠিক করেছিলাম পাঙ্কদের ব্যাপারটা যিনি ট্যাকল করতে পেরেছেন, প্রয়োজনে তাঁর সাহায্য নেব। লোকটির সন্ধানে কাঠমাণ্ডুতে আসবার পর আমরা হতাশ হলাম। ওখানে সঠিক সোর্স না থাকলে কাউকে খুঁজে বের করা মুশকিল। রয় জানতে পারল কাঠমাণ্ডু থেকে বাই রোড শিলিগুড়িতে যাওয়া যায়। বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যাচ্ছে এমন লোক কম নয়। সেই সময় আমরা জানতে পারলাম দ্যাট ম্যান ইজ নাউ ইন ডুয়ার্স। রয় এল প্লেনে। আমি বাসে। কথা ছিল শিলিগুড়িতে আজ আমরা মিট করব। দ্যাটস অল।”

কথা শেষ করে জেমস তার চুলে হাত বোলাল। ব্যাপারটা বোধহয় ওর মুদ্রাদোষ।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “তুমি থানায় গেলে কেন? এস. এন. রায় ঠিকমতো না পৌঁছনোতেই তোমার কেন মনে হল থানায় যাওয়া উচিত?”

জেমস বলল, “আমাদের মধ্যে তাই কথা ছিল। নাউ টেল মি, তুমি কী করে এত জানলে?” অর্জুনের মনে হচ্ছিল জেমস ঠিকঠাক বলেছে। সে যখন বলতে আরম্ভ করল তখন আর কোনও আড়াল রাখল না। পোড়া-গদাইকে দিয়ে সে লাইটারগুলো থানায় পাঠিয়েছিল এটাও জানাল। এইমাত্র সহদেব বকসি জানিয়ে গেলেন যা উধাও হয়ে গেছে থানার চত্বর থেকেই।

জেমস সব শুনে চুপচাপ বসে রইল খানিক, “তুমি কি মনে করো রায়বাড়ির ছোট ছেলে ওই দলটার সঙ্গে যুক্ত। কেন সে গাড়ি নিয়ে ওইসময় বেরিয়েছিল?”

“আমি বুঝতে পারছি না। তবে সে এখন থাকে তোমাদের দেশে। সেই সূত্রের যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। কোথায় গিয়েছিল সেটা জানতে পারলে ব্যাপারটা সহজ হত অবশ্য।”

জেমস বলল, “ওর ভাইয়ের কথামতো যে লাইটারটা ওর কাছে ছিল, সেটা

pathagar.net

এখন কোথায় ?”

এবার অর্জন পকেট থেকে দ্বিতীয় লাইটারটা বের করে দিল, “অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার পর উদ্ধার করার সময় কাটা-গদাইয়ের এক শাগরেদ এটাকে পকেট থেকে সরিয়েছিল।”

সন্তর্পণে লাইটারটাকে ধরে জেমস জিজ্ঞেস করল, “এটাকে পরীক্ষা করেছ ?”

“হ্যাঁ, জাল।” অর্জুন নিশ্চিন্ত গলায় বলল।

জেমস মাথা নাড়ল, “আমার মনে হচ্ছে এই ভদ্রলোক লোভের শিকার হয়েছে। শুধু একটা জাল লাইটার থাকার কারণে কেউ ওকে হত্যা করবে না। রয়কে হত্যা করার অবশ্যই একটা কারণ আছে। দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ডিস্টার্বড। বাট হোয়াট অ্যাবাউট দিস চ্যাপ ?” এবং তখনই অর্জুনের মাথায় একটা চিন্তা চলকে উঠল। সত্যেন্দ্রনাথ এবং রায়বাবুর ছোট ছেলের পদবি এক। এবং এঁরা দু'জনেই এসেছেন আমেরিকা থেকে। দু'জন আগে থেকেই দু'জনকে চিনতেন কি ?

জেমস বলল, “তুমি একটা কাজ করতে পারো। আমার অনুমান, খুব অল্পের জন্যে তুমি বেঁচে গেছ। ওই ব্যাগে যে ক'টা লাইটার দেখেছ তার সবগুলোই যে নিরীহ হবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। আর নেই বলেই ওরা ব্যাগটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। ওই জাল লাইটার এখানে একশো-দুটো টাকার বেশি দামে বিক্রি হবে না। ওরা অত অল্পের জন্য অত কষ্ট করবে না। লাইটারগুলো মেশানো ছিল। তুমি সৌভাগ্যক্রমে নিরীহ লাইটারটায় হাত দিয়েছিলে। কিন্তু এ সবই আমার অনুমান। তুমি নিহত ছেলেটির বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিতে পারো, গতকাল কেউ তার সঙ্গে দেখা করেছিল কি না। কিংবা কোথায় যাচ্ছিল সে ? অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট দ্যাট কার যা এস. এন. রয় ভাড়া করে এনেছিল !”

অর্জুন মাথা নাড়ল। তারপর জিজ্ঞেস করল, “তুমি আজ রাত্রে কি এই শহরে থাকবে ?”

“অফ কোর্স।” জেমস বলল, “আমাদের প্রতিপক্ষ এখানে আছে। কিন্তু তোমার সাহায্য চাই। একজন বিদেশি হিসেবে আমি একা কিছু করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। রয় যেখানে ছিল সেখানে জায়গা পেতে অসুবিধে হবে ?”

অর্জুন চিন্তিত গলায় বলল, “সেখানে থাকাটা ঝুঁকি হয়ে যাবে না ?”

জেমস উঠে দাঁড়াল, “প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু নিয়ে আমরা হাঁটাচলা করি। আমার যদি কিছু হয় তা হলে কলকাতার আমেরিকান কনস্যুলেটে জানিয়ে দিও। লেটস্ গো টু দ্যাট জেন্টলম্যান যিনি টোব্যাকো পত্রিকা পড়েন।”

“সুধাময় সান্যাল ? কেন ?”

“আমার ভয় হচ্ছে তিনি খুব বেশি জেনে গেছেন, এটাই তাঁর অপরাধ হতে

পারে।"

বিশাল ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁটছিল জেমস। কয়েক পা এগিয়েই ওরা রিকশা পেয়ে গেল। অর্জুন দেখল শহরের রাস্তায় তাকে একজন বিদেশির সঙ্গে রিকশায় বসে থাকতে দেখে অনেকেই ঘুরে-ঘুরে তাকাচ্ছে। এখন ঘন বিকেল। অর্জুনের খিদে পাচ্ছিল। সুধাময় সান্যালের বাড়িতে গেলে খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। অমলদা থাকলে এক কাপ কফি আসে দুধ-চিনি ছাড়া। সে জেমসকে বলল, "আমরা যদি পাঁচ মিনিট রিকশাটা দাঁড় করাই তা হলে তোমার কি খুব আপত্তি হবে? আমার বেশ খিদে পেয়ে গেছে।"

জেমস হেসে বলল, "তুমি আমার মনের কথা বলেছ। কিন্তু এখানে কী খাবার পাওয়া যায়! ইন্ডিয়াতে ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানির অবিলম্বে ব্যবসা শুরু করা উচিত।"

অর্জুন ওই কোম্পানির নাম শুনেছে। কম পয়সায় সুন্দর খাবারের দোকান করেছে তারা আমেরিকা এবং ইউরোপে। সে বলল, "ওই দোকানে দারুণ রাধাবল্লভি ভাজে। সঙ্গে জিলিপি।"

"রাধাবল্লভি। হোয়াটস দ্যাট?" জেমসের চোখমুখে বিস্ময় ফুটল।

ইংরেজিতে রাধাবল্লভি শব্দটাকে কিছুতেই অনুবাদ করতে পারল না অর্জুন। সে জেমসকে বলল, "তুমি রিকশা থেকে নেমে দোকানে এসে খাবারটা দ্যাখো।"

জলপাইগুড়ি শহরের এই অঞ্চলের দোকানগুলো যেমন হয় এটি তেমন। শোকেসে মিস্টি, সামনের বেঞ্চিতে বসে খদ্দেররা খাচ্ছে। পাশের নর্দমার গন্ধটাকে কেউ আমল দিচ্ছে না। সেদিকে তাকিয়ে জেমস মাথা নাড়ল, "তুমি খাও। আমি পারব না।"

অর্জুন জোর করল না। বিদেশিদের এই ব্যাপারে অনেক মানসিক বিধিনিষেধ আছে বলে সে শুনেছিল। সেটা হাতেনাতে প্রমাণিত হল। দ্বিতীয় রাধাবল্লভি মুখে দেওয়া মাত্র কাণ্ডটা হল। জেমস বসে ছিল রাস্তার পাশে দাঁড় করানো রিকশায়। রিকশাওয়ালা বিশ্রাম পেয়ে নেমে দাঁড়িয়ে খৈনি খাচ্ছিল। বেশ শান্ত চারদিক। ঠিক তখনই গাড়িটাকে যেতে দেখল সে। সেই একই রকম ধুলো-ভর্তি গাড়ি। নাম্বারপ্লেটটা পড়ল সে। পশ্চিমবঙ্গের নাম্বার। বাঁক নিয়ে কিছুদূর গিয়ে গাড়িটা যেন গতি কমাল। ড্রাইভারকে দেখতে পেল না অর্জুন, কিন্তু সে নিশ্চিত যে লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে জেমসকে দেখেছে। অর্জুন তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িটা বেরিয়ে গেল। তাকে ওই অবস্থায় দেখে জেমস জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

গাড়িটাকে আর দেখতে না পেয়ে অর্জুন ফিরে গেল দোকানে। দাম মিটিয়ে সে ধীরেসুস্থে রাস্তায় উঠে জেমসকে বলল, "আমাদের উচিত রিকশাটাকে ছেড়ে দেওয়া।"

"কেন ?" জেমস অবাক হল।

"এস. এন. রয় যে গাড়িতে আমাদের ওখানে এসেছিলেন, সেই গাড়িটাকে আমি এখনই দেখতে পেলাম। নাম্বারপ্লেটটা আমি লক্ষ করিনি কিন্তু মনে হচ্ছে সেইটেই।"

জেমস পেছন দিকে একবার তাকাল, তারপর জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি নিশ্চিত ?"

"মনে হচ্ছে, বললাম।"

"তা হলে ভালই হল। ওরা আমাদের খুঁজে বের করবে। নিশ্চয়ই ওরা জানে রয় তোমার সঙ্গে গতকাল কথা বলেছিল। ওরা এ-কথাও জানে, আমি রয়ের সঙ্গে দেশে এসেছি। অতএব আশা করছি আমরা মুখোমুখি হতে পারব। কিন্তু রিকশা ছাড়তে বলছ কেন ?"

"ওরা আক্রমণ করতে পারে।"

"সাক্ষী রেখে কেউ আক্রমণ করে না। উঠে পড়ো।"

অর্জুন যদিও জেমসের পাশে বসল, তবু তার অস্বস্তি হচ্ছিল। কাঁচা রাস্তা দিয়ে এখন যাচ্ছে রিকশাটা। জেমসের কথা যদি ঠিক হয়, তা হলে একটা লাইটার চার্জ করে ছুঁড়ে দিলেই কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। করলা সেতু পেরিয়ে আর একটু এগোতেই সে দেখতে পেল, পোড়া-গদাই আর কাটা-গদাই আসছে। পোড়া-গদাইয়ের কাঁধে হাত রেখেছে কাটা-গদাই। ওরা দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করতে লাগল। জেমস জিজ্ঞেস করল, "এরা কারা ?"

অর্জুন দ্রুত পরিচয় দিয়ে রিকশাটা দাঁড় করাতে বলল। সামনাসামনি পৌঁছে সে রিকশা থেকে নেমে পোড়া-গদাইয়ের সামনে গিয়ে বলল, "কিছু মনে কোরো না, আমি ভাবতে পারিনি সহদেবদা তোমাদের ধরে রাখবেন। ছেড়ে দিয়েছেন দেখে খুশি হলাম।"

সঙ্গে-সঙ্গে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল পোড়া-গদাই, "আমি কথা রাখতে পারিনি। আপনি আমাকে যে কাজ দিয়েছিলেন তা করতে পারিনি। ক্ষমা চাওয়ার মুখ নেই আমার।"

কাটা-গদাই মুখ নিচু করল। তাকেও খুব দুঃখিত দেখাচ্ছিল। অর্জুন বলল, "কী করে ব্যাপারটা হল, তা সহদেবদার মুখে আমি শুনেছি। কিন্তু তোমাদের কি নতুন কিছু বলার আছে ?"

পোড়া-গদাই প্রথমে মাথা নাড়ল, "আগে বলুন কী করলে ক্ষমা পাব ?"

অর্জুন বলল, "তোমাদের যখন কোনও দোষ নেই, তখন কেন ক্ষমা চাইছ। ঠিক আছে, আমি কিছু মনে করিনি। তোমরা দু'জনে কি সোজা থানায় চলে গিয়েছিলে ?"

এবার কাটা-গদাই মাথা নাড়ল, "না। হাঁটতে-হাঁটতে হাসপাতালের সামনে

pathagar.net

গিয়ে পোড়াকে আমি বলেছিলাম, জিনিসগুলো দেখাতে। ও বলল, খুব দামি-দামি লাইটার আছে ব্যাগে। আমি বললাম যে, আমিও আজ একটা লাইটার পেয়েছিলাম। তখন পোড়া ব্যাগটা খুলে আমাকে লাইটারগুলো দেখাল। আমরা হাসপাতালের সামনের রকে বসে লাইটারগুলো দেখছিলাম। এইসময় একটা লোক আমাদের জিজ্ঞেস করল, ওগুলো কোত্থেকে পেয়েছি? আমি তাকে ভাগিয়ে দিলাম। কিন্তু মনে কুমতলবএল। পোড়াকে ধাপ্পা দিয়ে একটা লাইটার সরিয়ে নিলাম। থানায় গিয়ে দেখলাম বড়বাবু নেই। পোড়া একটা বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে বসে ব্যাগটাকে পাশে রেখেছিল। আমি সিগারেট খাব বলে বারান্দায় বেরিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই একটা নেপালি গাড়ি নিয়ে থানায় এল। সে খুব বড়বাবুর খোঁজ করল। তার কোনও চেনা মানুষ কাল মারা গেছে। মর্গে নাকি ডেডবডি আছে। সেই ব্যাপারে খোঁজ নিতে চায়। একটু পরে লোকটা বেরিয়ে গেল ব্যাগ হাতে নিয়ে। আমার মনে হল ওটা পোড়ার ব্যাগ। সত্যি কি না দেখবার জন্য ভেতরে ছুটে এসে পোড়াকে হেলান দিয়ে একইভাবে বসে থাকতে দেখলাম, কিন্তু ব্যাগটা নেই। পোড়াকে হাত দিয়ে ঝাঁকুনি দিতেই ও বেঞ্চিতে টলে পড়ল। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন বড়বাবু কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না আমাদের কথা।”

কাটা-গদাই থামতে পোড়া-গদাই বলল, “আমি চুপচাপ বসে ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা লোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে। সে সিগারেট ধরাল, কিন্তু আগুন না জ্বেলেই। আমি তাকে বললাম, ওই লাইটার আমি চিনি। তারপরেই আর কোনও খেয়াল নেই। বড়বাবু আমাকে সেপাই দিয়ে পিটিয়েছেন।”

অর্জুন কাটা-গদাইকে জিজ্ঞেস করল, “তুমি যখন দেখলে একটা লোক পোড়া-গদাইয়ের ব্যাগ নিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন তাকে ধরলে না কেন?”

কাটা-গদাই বলল, “আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। পোড়ার কাছ থেকে কেউ কিছু ছিনতাই করবে ভাবতে পারা যায় না।”

অর্জুন হাত বাড়াল, “লাইটারটা দাও।”

কাটা-গদাই পকেট থেকে সেটা বের করে জিজ্ঞেস করল, “পোড়াকে কী ভাবে অজ্ঞান করেছিল? কোনও গন্ধটন্ধ শুঁকিয়ে, তাই না? ও সেটা বলছে না?”

পোড়া-গদাই সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করল, “না, না, সত্যি বলছি, কেউ কিছু শোঁকায়নি আমাকে।”

অর্জুন ওদের কিছু বলল না। এরকম একটা অস্ত্রের অস্তিত্ব জানলে ওদের লোভ বেড়ে যাবে।

সে লাইটারটাকে ভাল করে দেখল। আগেরগুলোর সঙ্গে কোনও তফাত নেই। কাটা-গদাইকে সে বলল, “একটা খুব বড় ঝামেলা শুরু হয়েছে।

pathagar.net

তোমরা বাড়ি চলে যাও।"

কাটা-গদাই বলল, "ঝামেলা? জান লড়িয়ে দেব। কী করতে হবে?"

"এখন কিছু করতে হবে না। লোকটাকে দেখলে চিনতে পারবে?"

"হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। তবে হাসপাতালে যে আমাদের প্রশ্ন করেছিল, তাকে মনে হয় চিনি।"

"আগে নাথুয়া-জলপাইগুড়ি রুটে বাস চালাত," পোড়া-গদাই জানাল।

"এখন কী করে?"

"জানি না। অনেক বছর দেখিনি। খোঁজ নিতে পারি। তবে সেই লোক আর থানার লোক এক নয়।" কাটা-গদাই নিশ্চিন্ত হয়ে বলল।

অর্জুন বলল, "তা হোক, তবু তোমরা ওর খবর নিয়ে যদি পারো একবার রাত্রে আমার বাড়িতে এসো।"

আবার রিকশায় উঠে বসে জেমসকে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলল অর্জুন। এতক্ষণ জেমস চুপচাপ ওদের দেখেছে। এবার জিজ্ঞেস করল, "এরা কি লোকাল ক্রিমিন্যাল?"

অর্জুন একটু সময় দিল, "না, ঠিক ক্রিমিন্যাল বলা যায় না, আবার বলতেও পারো। এরা দুটো সিনেমা হলের টিকিট ব্ল্যাক করে। এতদিন শত্রু ছিল, আজ বন্ধু হয়েছে।"

জেমস হেসে জিজ্ঞেস করল, "কী রকম?"

অর্জুন তখন ব্যাপারটা বলল। তারপর হাতের লাইটারটার লক্ খুলল। সঙ্গে-সঙ্গে জেমস চাপা গলায় বলল, "সাবধানে বোতাম পুশ করবে।"

"এটা তো জাল।"

"জাল তো নিশ্চয়ই। কিন্তু কী ধরনের জাল তা তো জানি না।"

সুধাময় সান্যালের বাড়ির সামনে পৌঁছে গিয়েছিল রিকশাটা। অর্জুন ওকে দাঁড়াতে বলল।

সন্ধে হয়ে আসছে। তিস্তা বাংলোতে যাওয়ার রিকশা এটাকে ছেড়ে দিলে পাওয়া যাবে না।

হাতের লাইটারটার লক্ তখনও খোলা। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এটাকে কী ভাবে পরীক্ষা করব?"

জেমস একটা সত্যিকারের জাল লাইটার আর এইটের ওজন এক কি না অর্জুনকে হাতের তালুতে রেখে যাচাই করতে বলল। সেটা করামাত্র অর্জুন কাটা-গদাইয়ের সরানো লাইটারটার ওজন বেশি টের পেল। সে জেমসকে বলল, "এটা এত ভারী ভাবিনি।"

জেমস ওর হাত থেকে লাইটারটা তুলে নিল। তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত মুখে হাসি ফুটে উঠল, "দ্যাখো, নতুন লাইটারটার পেছনে লেখা রয়েছে জোন্স অ্যান্ড জোন্স। এ. এন. রয়েছে, ডি.

নেই। অবশ্যই এটা সংকেত, যারা ব্যবহার করে তারা জানে! তোমার লোক যদি লোভ সামলে হাতসাফাই না করত তা হলে এইটের অস্তিত্ব আমরা টের পেতাম না। মনে হচ্ছে দ্বিতীয় বোতাম টিপলেই বিস্ফোরণ হবে। অবশ্য তার আগে আমাদের এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করা উচিত।" খুব সাবধানে ওটা নিজের পকেটে রেখে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিল জেমস।

অর্জুন বলল, "এখানেই সুধাময় সান্যাল থাকেন। বৃদ্ধ মানুষ। বিয়ে-থা করেননি। এককালে কলেজে পড়াতেন। কিন্তু লাইটারটার সম্পর্কে জানা গেল না।"

জেমস বল, "কী জানতে চাও? এটা ছুঁড়লে বিস্ফোরণ হয় কি না? যদি হয় তা হলে এটা আর কাজে লাগবে না। তাই না?"

"বিস্ফোরণ হলে কী রকম হবে?"

"একটা হাতি মরে যাবে, এইমাত্র।"

অর্জুন কথা না বলে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিল। কিন্তু মনের মধ্যে অস্বস্তিটা থেকেই গেল। ওই লাইটার সত্যি বিস্ফোরক কি না তা না ছুঁড়লে জানা যাবে না। কিন্তু সেটা না হলে জেমসের ধারণা সঠিক বলে প্রমাণ হবে না। সেক্ষেত্রে নানারকম সন্দেহ উঠতে পারে।

সুধাময় সান্যালের ভৃত্য দরজা খুলল। অর্জুনকে দেখে বলল, "বাবুর শরীর খারাপ, আজ কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।"

অর্জুন অবাক হল। এরকম তো কখনও হয়নি। একবার সুধাময় সান্যালের ম্যালেরিয়া হয়েছে শুনে সে অমলদার সঙ্গে দেখতে এসেছিল। তখন তো কোনও বাধা পায়নি। সে ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করল, "বাবুর কী হয়েছে?"

"আমি ঠিক জানি না, তবে দেখা হবে না।"

"ডাক্তার এসেছিল?"

"সেটাও জানি না।"

অর্জুন জেমসকে সংবাদটা অনুবাদ করে জানাল। জেমস জিজ্ঞেস করল, "এই লোকটা যে বিশ্বাসযোগ্য তাতে তুমি নিশ্চিত?"

অনেকদিন ধরে ভৃত্যটাকে দেখছে অর্জুন। অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। কথাটা জানালে জেমস বলল, "জিজ্ঞেস কর তো, একটু আগে কেউ এসেছিল কি না।"

ভৃত্যটা বলল, "দু'জন লোক এসেছিল। তাদের মধ্যে একজনের চেহারা এই সাহেবের মতন। তারা কথা বলে চলে যাওয়ার পর থেকেই বাবুর শরীর খারাপ করেছে।" অর্জুনকে সে চেনে বলেই এত কথা বলল, নইলে বলত, "বাবু বলেছেন কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলতে।" চাকরটা দরজা বন্ধ করে দিল।

"দু'জন লোক এসেছিল। তার মধ্যে একজনকে তোমার মতো দেখতে।"

"প্রত্যেকটা রাউন্ডে হারছি আমরা।" বিড়বিড় করল জেমস, "প্রার্থনা করছি, এই ভদ্রলোক বেঁচে থাকুন। চল, আমরা আস্তানার খোঁজে যাই।"

অর্জুন রিকশার কাছে চলে এল। সুধাময় সান্যালের ব্যবহারে সে খুব দুঃখিত হয়েছিল। লোক দুটো কী কথা বলল যার জন্য ভদ্রলোক জনসংযোগ ত্যাগ করতে চাইছেন! জেমসের মতো দেখতে, বলল ভৃত্যটা। তা হলে কি আর একজন আমেরিকান এই শহরে এসেছে? তা হলে গদাইরা তো সে কথা বলত! জেমস যাই বলুক, সুধাময় সান্যাল মারা যাননি। ভৃত্যটি এতবড় কথা চেপে যেত না। সুধাময় সান্যাল থাকেন দোতলায়। অর্জুনের মনে হল, কেউ যেন ব্যালকনি থেকে চট করে সরে গেল। সে জেমসকে রিকশায় অপেক্ষা করতে বলে বাড়িটার একপাশে চলে এল। বৃষ্টির জলের পাইপ ছাদ থেকে ব্যালকনির পাশ দিয়ে নীচে নেমে এসেছে। অর্জুন পাইপটা ধরল। উঠতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যালকনিতে পৌঁছে গেল সে। এখন সন্ধে হয়ে গেছে। মশার কারণে আশেপাশের বাড়িগুলোর জানালা বন্ধ। ফলে অর্জুনের মনে হল, সে কারও চোখে পড়েনি। রেলিঙ টপকে ব্যালকনিতে ঢুকতেই সে সুধাময় সান্যালকে দেখতে পেল। পেছনে হাত রেখে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু দেখছেন।

"আপনার শরীর খারাপ?" অর্জুন স্পষ্ট জিজ্ঞেস করল। সঙ্গে-সঙ্গে মুখ ফেরালেন সুধাময় সান্যাল আর সেখানে আতঙ্ক ফুটে উঠল। এক পা পিছিয়ে গেলেন তিনি, "তুমি? তুমি কী করে উপরে উঠে এলে? নো, নো, ইটস নট গুড। এইভাবে বাড়িতে ঢুকতে পারো না তুমি!"

অর্জুন ঘরে ঢুকল, "আপনার কী হয়েছে? এরকম ব্যবহার করছেন কেন আপনি?"

দ্রুত ভেতরের দরজার দিকে ছুটে গেলেন সুধাময়। তারপর চলে এলেন ব্যালকনিতে। মুখ ঘুরিয়ে আশেপাশে তাকালেন। তারপর ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "সাহেবটা কে?"

"আমেরিকান। অমলদার কাছে এসেছে।"

"অমল! অমল ফিরেছে?" সুধাময় ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলেন।

"না।"

উত্তরটা শোনামাত্র সুধাময়ের মুখে কালো ছায়া নামল। তিনি বললেন, "অর্জুন, তুমি এখনই চলে যাও। কিছুদিন আমি কারও সঙ্গে দেখা করতে চাই না।"

অর্জুন শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, "কেন?"

"জোন্স অ্যান্ড জোন্স, অর্জুন জোন্স অ্যান্ড জোন্স আমার সর্বনাশ করেছে। এখন আমি আমার কাজের লোককেও বিশ্বাস করতে পারছি না। ওই লোকগুলো সত্যিকারের খুনি।" কথাগুলো বলার সময় ওঁর মুখের ভঙ্গি

pathagar.net

বোঝাল তিনি যথার্থই ভীত।

"ওরা কী বলেছে আপনাকে ?"

"ওরা ! কাদের কথা বলছি তুমি জানো ?"

"না। তবে অনুমান করতে পারি। জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর লাইটার জাল করে এদেশে যারা ব্যবসা করতে চায়, তারাই এসেছিল আপনার কাছে। আপনি কি জানেন গত চব্বিশ ঘণ্টায় ওরা দু'জন মানুষকে খুন করেছে, যাদের কাছে জাল লাইটার ছিল ? ওরা কী করে জানল যে, আপনি লাইটারটার ব্যাপারে সব খবর রাখেন ?"

"রায়বাবুর ছোট ছেলে ওদের বলেছে, আমি এই লাইটারটার সম্পর্কে সমস্ত লিটারেচার পড়ে জেনেছি। আমিই বলেছি তার সঙ্গে আনা লাইটার জাল। ওরা আমাকে শাসিয়ে গিয়েছে আমি যেন কারও সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা না বলি। বললে কী হবে, তা আমার বেড়ালটার ওপর পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিয়েছে।" সুধাময় সান্যাল হাত বাড়ালেন টেবিলটা দেখাতে। সেখানে বেড়ালটা পাশ ফিরে শুয়ে ছিল। কিন্তু সচেতন চোখে অর্জুন বুঝল ও বেঁচে নেই। জীবিত বেড়াল অতক্ষণ পাশ ফিরে শুয়ে থাকতে পারে না।

হঠাৎ অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওরা আপনাকে দয়া দেখাবে কেন ? শুধু ভয় দেখিয়ে চলে যাওয়ার পাত্র তো ওরা নয়।"

"আমি জানি না, বিশ্বাস কর, আমি জানি না। হরিপ্রসাদের কাছে টেলিফোনে ওরা আমার কথা জেনেছিল। ওদের খুব তাড়া ছিল। একজন চেয়েছিল আমায়...।" ঢোক গিললেন সুধাময়, "কিন্তু দ্বিতীয়জন বলল, চাকরটা ওদের ঢুকতে দেখেছে। আজ রাত্রে ওরা যখন সামচিতে পৌঁছচ্ছে না, তখন আর ঝুঁকি বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। সেটা শুনে প্রথমজন সাবধান করে চলে গেল। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। ওরা কী চাইছে তাও বলল না। শুধু টোব্যাকো পত্রিকাটি নিয়ে চলে গেল।"

"সামচি ? আপনি কি ভুটানের সামচির কথা বলছেন ?"

"আমি বলিনি। ওরাই বলল। ভুটান ছাড়া আর কোথাও সামচি নামে কোনও জায়গা আছে বলে জানি না। ওরা কারা অর্জুন ?"

অর্জুন বলল, "অমলদা ফিরে এলে আপনার সঙ্গে দেখা করব। তার আগে আপনি কারও সঙ্গে এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবেন না।"

যে-পথে ওপরে উঠে এসেছিল সেই পথেই সন্তর্পণে নেমে এল সে। যদিও এর ফলে জামা-প্যান্টে নোংরা লেগে গেছে। রিকশায় উঠে সে তাড়াতাড়ি তিস্তা বাংলোর দিকে যেতে বলল।

জেমস জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার ? কী হল ?"

অর্জুন জেমসের দিকে তাকাল। তারপর বলল, "ওরা এসে ওঁকে এমন শাসিয়ে গিয়েছে যে, উনি খুব ভেঙে পড়েছেন। এখন কথা বলার অবস্থায়

pathagar.net

নেই।"

"দে আর রিয়েলি ডেঞ্জারাস," জেমস মন্তব্য করল।

তিস্তা বাংলোয় পৌঁছানো পর্যন্ত কোনও বিপদ হল না। ঘর পেতে ওদের কোনও অসুবিধে হল না। এবং সেই ঘরটিই পাওয়া গেল, যেখানে গতকাল সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন। বাবুর্চিকে খাবার অর্ডার দেওয়ার পর জেমস বলল, "খুব টায়ার্ড লাগছে আজ। কাল সকালে একবার ট্রাঙ্ককল করার চেষ্টা করতে হবে। তার মধ্যে তোমার ওই লোক দুটো যদি কোনও খবর আনে তো সৌভাগ্য বলতে হবে।"

অর্জুন দেখল জেমস তার লাগেজ না খুলেই বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। সে যাওয়ার জন্য উঠল, "সাবধানে থেকো। যদি কেউ দরজা নক করে তা হলে তৈরি হয়ে খুলবে।"

সেই অবস্থায় জেমস বলল, "থ্যাঙ্কস্। আমি আত্মরক্ষায় অভ্যস্ত।"

॥ সাত ॥

আকাশে বেশ মেঘ। কখন মেঘ জমল তা টের পায়নি অর্জুন। হাঁটতে হাঁটতে সে পুরো ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করছিল। যারা শহরে এসেছে তারা নিশ্চয়ই স্থানীয় কাউকে সঙ্গী করেছে। না হলে এত স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারত না। এই লোক্যাল লোকটি কি সেই ড্রাইভার? তাকেই কি আজ তারা গাড়িটা চালিয়ে যেতে দেখল? সামচিতে যাচ্ছে ওরা। সামচি হল জলপাইগুড়ি থেকে মাইল চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ দূরের ভুটান বর্ডার। নাম শুনেছে, কিন্তু কখনও যাওয়া হয়নি। গাড়িতে দূরের ভুটান বর্ডার। নাম শুনেছে, কিন্তু কখনও যাওয়া হয়নি। গাড়িতে ঘণ্টা দেড়েক লাগে। সুধাময় সান্যালের কথা যদি ঠিক হয় তা হলে ওরা আজ রাত্রেও এই শহরে থাকছে। এখন ওদের অস্তিত্ব একমাত্র অর্জুন ছাড়া এই শহরের কেউ জানে না। অতএব নিশ্চিন্ত ওরা। কিন্তু আজ রাত্রে কী কাজ ওদের? আবার তার লাইটারটার কথা মনে পড়ল। দু' নম্বর বোতামটা টিপলেই চার্জ হবে এবং তখন ছুঁড়ে দিলে দশ সেকেন্ডর মধ্যেই যে বিস্ফোরণ ঘটবে তাতে একটা হাতি মরে যাবেই। কিন্তু ওই লাইটারটাই যে সেই কর্মটি করবে তা প্রমাণিত হল কই; জেমসের কাছ থেকে চেয়ে আনলে ভাল হত। কথায়-কথায় ওটার কথা আসবার সময় একটুও খেয়াল ছিল না।

জলপাইগুড়ির একমাত্র হোটেলটির সামনে পৌঁছে অর্জুনের মনে হল ভেতরে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর খবরটা দিয়ে আসে। গতকাল ভদ্রলোক খুব ক্ষুব্ধ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের ব্যবহারে। তাকে দেখেই ভদ্রলোক বললেন, "কী খবর। সব ভাল? কালকের লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। শুনলাম

pathagar.net

তিনি নাকি মারা গিয়েছেন ? আত্মহত্যা ? যা রাগী লোক। আরে ভাই, এই হোটেলের কেউ কোনও বদনাম কখনও করেনি। এই তো এক সাহেব আজ বিকেলে চলে গেলেন, তিনি তো কোনও বদনাম করেননি।"

কোনও মানুষ মারা গেলেও যারা তার সম্পর্কে রাগ পুষে রাখে তাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয় না অর্জুনের। তবু সে বলল, "আপনার হোটেলে আজকাল খুব সাহেব-মেম আসছে বুঝি ?"

"মেম না শুধু সাহেব। কাল একজন আমেরিকান ছিলেন, আজ চলে গেছেন। আর একজন চাইনিজ এসেছেন। খাওয়াদাওয়ার হেভি ঝামেলা ওদের।"

"আমেরিকান ভদ্রলোক ? কী নাম বলুন তো ?"

"খাতা দেখে বলতে হবে। হ্যাঁ, রবার্ট মিচেল। চা-বাগানের ব্যবসায় এখানে এসেছেন। খুব ভদ্রমানুষ।"

চা-বাগানের ব্যবসা এখানে আমেরিকানরা কখনও করেছে কি না অর্জুন জানে না। তবে রাস্তায় চলতে চলতে অর্জুনের মনে হল, রবার্ট মিচেল কেন ওই হোটেলে থাকতে গেলেন ? তিনি তো টি প্ল্যান্টার্স ক্লাবেই স্বচ্ছন্দে জায়গা পেতে পারতেন।

বাড়ির সামনে এসে সে অবাক হল। তাদের বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। তার মানে কেউ দেখা করতে এসেছে। ইলেকট্রিকের বিল বেশি ওঠে বলে মা অকারণে বাইরের ঘরের আলো জ্বালিয়ে রাখেন না। সে নক করতেই যিনি দরজা খুললেন তাঁকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল অর্জুন। দরজা খুলে নির্বিকার ভঙ্গিতে চেয়ারে ফিরে গিয়ে ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট পত্রিকা ওলটাতে ওলটাতে অমল সোম বললেন, "মাসিমা একা থাকেন। এত রাত পর্যন্ত বাইরে ঘোরার কী দরকার তা বুঝি না !"

অর্জুনের সময় লাগল স্থির হতে, "আপনি ! আপনি কখন এসেছেন ?"

"এই তো। হাবু বলল তুমি গিয়েছিল। তাই চলে এলাম। মাসিমা বললেন গতরাতেও তুমি বাড়ি ফিরতে দেরি করেছ।"

অর্জুন উলটো দিকের চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল, "আপনি বোম্বে থেকে লিখেছিলেন কবে ফিরবেন জানেন না, আপনাকে দেখে খুব ভাল লাগছে।"

অমল সোম কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন, "অর্জুন, তোমার বুদ্ধি আগের থেকে অনেক ধারালো, কিন্তু এখনও পুরো হয়নি। আমার চিঠির ওপরে পোস্টাল স্ট্যাম্প দেখেছ ? ওগুলো বোম্বের নয়। যা হোক, হাবু বেচারা এখন হাসপাতালে। খুব সামান্য চোট লেগেছে যদিও। কিন্তু আমাদের বাইরের ঘরটা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তুমি আসার আধঘণ্টা বাদেই ব্যাপারটা ঘটে।"

অর্জুন চমকে উঠল আবার, "কী হয়েছে বাইরের ঘরে ?"

"একজন নেপালি এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। হাবু তাকে

বোঝাবার চেষ্টা করেছে আমি নেই। তখন সে তোমার কথা জিজ্ঞেস করে। হাবু যা বলে তা সে বোঝেনি। দরজা বন্ধ করার পর হাবু দেখেছে সে সিগারেট ধরাচ্ছে কিন্তু চলে যাচ্ছে না। মনে হয় লোকটা সন্দেহ করেছিল তুমি বাড়িতে আছ। ও বাইরের ঘরে পায়ের শব্দ পেয়েছিল, কিন্তু হাবু তখন পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। তার ওই ঘরে শব্দ করা সম্ভব না। ঠিক তাই সে কিছু একটা ছুঁড়ে দেয় ঘরের মধ্যে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিস্ফোরণটা ঘটে। কী ছুঁড়েছে তা দেখবার জন্য এগিয়ে যেতে হাবু সামান্য আঘাত পায়। আর সেই সুযোগে লোকটা সরে পড়ে।"

অমলদা চুপ করলে অর্জুন উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ঘরের ভেতরে কে শব্দ করেছিল?"

"আমি। তোমরা বেরিয়ে যাওয়ামাত্র আমি ফিরেছিলাম। হাবুকে আমি নিষেধ করি কাউকে আমার ফিরে আসবার খবর জানাতে। তার কিছুক্ষণ বাদেই ওই গাড়িটা নিয়ে নেপালি লোকটা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। এই নিয়ে ভাবনার কিছু নেই।"

"লোকটা কেন এমন করল আপনি অনুমান করতে পারেন?"

"হয়তো কোনওদিন ওকে কোনও অপরাধের জন্য ধরিয়ে দিয়েছিলাম, তার বদলা নিল। লোকটা লাইটার ছুঁড়তে যাচ্ছে দেখেই আমি দ্রুত পাশের ঘরে ছুটে যাই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যখন আমি বাড়ির পেছনে, তখনই বিস্ফোরণ ঘটল। লোকটাকে আমি চেষ্টা করলে ধরতে পারতাম। কিন্তু ও অত দ্রুত গিয়ে গাড়িতে উঠবে ভাবতে পারিনি। তা ছাড়া লাইটার থেকে বিস্ফোরণ তো কল্পনায় ছিল না।" কথা বলে কান খাড়া করলেন অমল সোম। চাপা গলায় বললেন, "দু'জন লোক বাইরে এসেছে। বাইরে গিয়েই কথা বল। আমি যে ভেতরে আছি তা জানানোর দরকার নেই।"

অমলদার এইভাবে ফিরে আসা এবং নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কথা বলা অর্জুনকে এমন অবাক করে দিয়েছিল যে, লাইটার সম্পর্কে অমলদা কতটা জানেন সেটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেল। এই সময় দরজায় শব্দ হল। অর্জুন পরিচয় জানতে চাইলে ওপার থেকে উত্তর এল, "আমরা গদাই।"

সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল অর্জুন। পোড়া এবং কাটা-গদাই সামনে দাঁড়িয়ে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "বল, কী খবর?"

কাটা-গদাই বলল, "লোকটার নাম মান সিং। নাথুয়া লাইনে বাস-ড্রাইভারি করত। কিন্তু বড় একটা চাকরি নিয়ে ও নাকি নেপালে চলে গিয়েছিল। অনেক বছর এখানে আসেনি। চার নম্বর গুমটির কাছে ওর বাসা ছিল। দু'দিনের জন্য নাকি বেড়াতে এসেছিল, আজ চলে গেছে ডুয়ার্সে। ওর এক ভাই এখনও আছে চার নম্বর গুমটিতে। সে বলল।"

পোড়া-গদাই বলল, "আমার খুব লজ্জা করছে। আমার দোষেই ব্যাগটা

হারালাম।”

কাটা-গদাই বলল, “আমাদের দিয়ে যা সম্ভব, তাই করব। ব্যাগটা উদ্ধার না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না। চোরের ওপর বাটপাড়ি।”

অর্জুন বলল, “মাথা গরম কোরো না তোমরা। যারা ওই ব্যাগ সরিয়েছে তাঁদের কাছে খুব জোরালো অস্ত্র আছে। তোমরা যদি আমাকে সাহায্য করতে চাও, তা হলে খুশি হব। তোমাদের মধ্যে একজন তিস্তা বাংলোতে চলে যাও। সেখানে দেখবে এক দুই তিন চার নম্বরের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে কি না। যদি থাকে তো চলে এসো। কাউকে কিছু বোলো না। আর একজন এখানে অপেক্ষা করো। সন্দেহজনক কাউকে দেখতে পেলে আমাদের জানিয়ে দিও।”

‘আমাদের’ শব্দটা উচ্চারণ করে সচকিত হল সে। কিন্তু গদাইরা যে সেটা বুঝতে পারেনি তাতে সন্দেহ নেই। কাটা-গদাই বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে। অর্জুন আবার দরজা বন্ধ করে ভেতরে আসামাত্র অমলদা বললেন, “চমৎকার। তোমার উন্নতি দেখে আমার ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে, এই কেসটা তুমি নিজেই ট্যাকল করতে পারবে অর্জুন।”

অর্জুন অমলদার সামনে চেয়ার টেনে বসল, “আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী করে এই কেসটার কথা জানলেন? কতটাই বা জানেন?”

অমলদা চোখ বন্ধ করলেন। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, “আমি চাই না ভারতবর্ষের মানুষের মন বিষাক্ত করতে বিদেশিরা সক্ষম হোক। একদল মতলববাজের হাতে ওই লাইটার তুলে দিতে আমি চাই না। জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি সম্পর্কে আমি যাবতীয় বৃত্তান্ত জানি। তোমাকে আমি বলেছিলাম, ভারতবর্ষে বেড়াতে যাচ্ছি। তাই ইচ্ছে ছিল। এই সময় আমেরিকা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের একটি চিঠি আমি পাই। তিনি বিষ্টুসাহেবের বোনের কাছ থেকে আমার খবর পেয়েছেন। নিউইয়র্ক টাইমসে পাঙ্কদের ঘটনাটা পড়েছেন। ব্যাপারটা জানিয়ে উনি আমাকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছেন। ওঁদের কাছে খবর ছিল এই গ্যাংটা কাঠমাণ্ডু হয়ে ডুয়ার্সে আসবে। আমি সুধাময় সান্যালকে লাইটারটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। তিনি খুব উৎসাহিত হন সংগ্রহ করতে। ফলে আমার অজানা থাকল না ওই বস্তুটির বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের বদলে আমি চলে গেলাম কাঠমাণ্ডুতে।”

“আপনার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল?”

“হ্যাঁ। আমিই তাঁকে বলেছিলাম জলপাইগুড়িতে গিয়ে আমার খোঁজ নিতে। ওই লাইটার আমার বাড়িতে ফেলে আসতে আমি অনুরোধ করেছিলাম। আমার চিঠি পেলে তুমি লাইটার সম্পর্কে আগ্রহী হবে বলে আমার ধারণা ছিল।”

“চিঠিটা আপনি কোথায় পোস্ট করেছিলেন?”

"নিজের নামে আসা পুরনো খামের ভেতরে চিঠিটা ভরে দিয়েছিলাম। ওটা সত্যেন্দ্রনাথ নিজের হাতে নিয়ে গিয়ে টেবিলে রাখেন। আসলে আমি চেয়েছিলাম আমার অনুপস্থিতিতে তুমি ওদের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ নাও।" অমল সোম উঠলেন।

"কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ মারা গেলেন সেটা আপনি এখানে থাকলে হয়তো হত না। তা-ছাড়া হরিপ্রসাদ রায় মারা গিয়েছেন ওদের হাতেই বলে আমার ধারণা।"

"এগুলো আমি ঠেকাতেও পারতাম না। আমাকে শিলিগুড়িতে থেকে যেতে হয়েছিল তোমার জেমসের জন্য। থেকে অবশ্য লাভই হয়েছে। আমি চলি।" অমলদা পা বাড়ালেন।

"আপনার সঙ্গে জেমসের পরিচয় হয়েছে?"

"বাঃ,কাঠমাণ্ডুতে একসঙ্গে একটি বেলা কাটিয়েছি আমরা, পরিচয় হবে না?"

"অমলদা, এরা খুব ডেঞ্জারাস। জেমস বলেছে, ওরা লাইটারে মিনি গ্রেনেড রাখতে পেরেছে। বোধহয় সেইটেই ছুঁড়েছিল বাড়ির ভেতরে। একটা লোক গাড়ি চালাতে চালাতে জেমসকে রিকশায় বসে থাকতে দেখেছিল। হয়তো ভেবেছিল আমি তখনও ওই বাড়িতেই আছি। ওরা আজকালের মধ্যে সামচিতে যাচ্ছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এখনও, এরা কারা? শুধু একটা নাম পেয়েছি মান সিং। আগে ড্রাইভারি করত, এখন নেপালের বাসিন্দা। কিন্তু তার বিরুদ্ধেও কোনও প্রমাণ নেই। থানায় গিয়ে যে ব্যাগ তুলে নিয়ে এসেছে পোড়া-গদাইকে অবশ করে, সে অন্য লোক।"

"তুমি জেমসকে নিয়ে সামচি রওনা হয়ে যাও। আর ও যদি একা যেতে চায় তো যেতে দাও। মনে হয় ভোরের আগেই তোমার ওখানে পৌঁছানো দরকার।"

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"সহদেব বকসির কাছে।" অমলদা নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। অর্জুনের খুব রাগ হচ্ছিল। মাঝে-মাঝে অমলদা এমন ব্যবহার করেন যেন তিনি অর্জুনের কাছের মানুষ নন। এই যে এখন সমস্যার চূড়োয় তাকে রেখে কী নির্লিপ্তভাবে সরে দাঁড়ালেন!

॥ আট ॥

boiঘar.net

তিস্তা ব্রিজে টোল না দিয়ে যখন অর্জুনরা ছুটে যাচ্ছিল সামচির দিকে, পেছনের সিটে তার পাশে তখন অমলদা বসে। অমলদা চলে যাওয়ার পরে কাটা-গদাই ফিরে এসে জানিয়েছিল, এক দুই তিন চার নম্বর গাড়িটা তিস্তা বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে-সঙ্গে অর্জুন উঠে দাঁড়িয়েছিল।

জেমসের জীবনের জন্য সে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। দুই গদাইকে সঙ্গে নিয়ে সে ছুটে গিয়েছিল তিস্তা বাংলোতে। গিয়ে দ্যাখে, গাড়িটা নেই। কিন্তু কাটা-গদাই শপথ করে বলে সে গাড়িটাকে বাংলোর পাশে দাঁড়াতে দেখেছে। সেই লোকটা গাড়ি থেকে নামে, যে থানায় গিয়েছিল। গাড়িতে আরও একটা লোক বসেছিল স্টিয়ারিং-এর পেছনে। কাটা-গদাইয়ের ধারণা ওই দ্বিতীয়টা লোকটাই মান সিং। অর্জুন নিষেধ করেছিল বলে সে কিছু করেনি, না হলে তার ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে।

অর্জুন সঙ্গীদের নিয়ে ওপরে ছুটে গিয়েছিল। তখন মধ্যরাত। তিস্তা বাংলোর প্রতিটি ঘরের দরজা বন্ধ। জেমসের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। সেখানে ঢুকে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল অর্জুন। কোনও চিহ্ন নেই জেমসের। বাথরুমের দরজা খোলা। তার লাগেজও নেই। অর্জুনের মনে হয়েছিল, আততায়ীরা আরও সাবধানী হয়েছে। তারা জেমসের মৃতদেহ এখানে রেখে যেতে চায়নি। একমাত্র অর্জুন ছাড়া কেউ জানে না জেমস এই বাংলোতে আশ্রয় নিয়েছে। অর্জুন যদি লাইটার-বিস্ফোরণে নিহত হয় তা হলে জেমসের হদিস কেউ পাবে না।

ওরা যখন নীচে নেমে ভাবছে কী করা যায়, তখন আর-একটা জিপ এসে দাঁড়াল সামনে। জিপের পেছন থেকে অমলদা মুখ বাড়ালেন, "উঠে এসো অর্জুন।"

"আপনি ?" অর্জুন কাছে এগিয়ে গেল।

"সহদেব বকসির সঙ্গে কথা বলে মনে হল আমার এখনই রওনা হওয়া উচিত। তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম তুমি নেই। এত রাত্রে এখানে ছাড়া আর কোথাও যেতে পারো না তুমি। তাই চলে এলাম। উঠে এসো।" অমল সোম সোজা হয়ে বসলেন।

কোনও প্রতিবাদ না করে জিপে উঠল অর্জুন। উঠে বলল, "ওরা জেমসকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। আমরা যদি আর-একটু আগে পৌঁছতাম তা হলে... ।" খুব আফসোস হচ্ছিল ওর। অমলদা কোনও জবাব দিলেন না। সামনের সিটে যে ভদ্রলোক বসে আছেন, তাকে দেখে খুব অবাক হল ও। জলপাইগুড়ির এস. পি.-কে সে এই গাড়িতে আশা করেনি। ভদ্রলোক কোনও কথা বলছেন না। সরকারি জিপ বলে তিস্তা ব্রিজে টোল দেবার জন্য দাঁড়াতে হল না।

ময়নাগুড়ি শহরকে বাঁ দিকে রেখে ঝড়ের মতো জিপটা ছুটে গেল ধুপগুড়ি, গয়েরকাটা পেরিয়ে। 'খুঁটিমারি রেঞ্জ' রহস্যটা সে ওই গয়েরকাটায় উদ্‌ঘাটন করেছিল। বানারহাটের চৌমাথায় দেখল একটা পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে আছে। এস. পি. গাড়িটাকে থামাতে বললেন। বানারহাটের ও.সি. এসে ওঁকে স্যালুট করলেন। বোঝাই যাচ্ছে এখানে অপেক্ষা করতে ওঁদের খবর পাঠানো হয়েছিল। ও.সি.-কে এস. পি. জিজ্ঞেস করলেন, "ওয়ান টু থ্রি ফোরকে

দেখেছেন ?”

ও.সি. দ্রুত ঘাড় নাড়লেন, “হ্যাঁ স্যার। আপনার খবর পাওয়ামাত্র বাইরে বেরিয়ে দেখি, গাড়িটা চলে গেল। ধরতে পারিনি। ধরার অবশ্য অর্ডার ছিল না।”

পেছন থেকে অমলদা মন্তব্য করলেন, “ভালই করেছেন। লেটস্‌ মুভ। ওঁদের আধঘণ্টা বাদে স্টার্ট করতে বলুন মিস্টার কাপুর।”

হুকুম দেওয়া হলে জিপ আবার দৌড়তে শুরু করল। পলাশবাড়ি চা-বাগান পেরিয়ে রিয়াবাড়ির পাশ দিয়ে ওরা ছুটে যাচ্ছিল। ভুটানের বর্ডারটা দেখতে পাওয়ামাত্র অমলদা গাড়ি থামাতে বললেন। এস. পি. মাথা ঘুরিয়ে বললেন, “মিস্টার সোম, ওই বর্ডার পেরিয়ে গেলে আমার কিছুই করার থাকবে না।”

অমলদা বললেন, “আমি জানি। আপনি জিপটাকে নিয়ে সামচির ভুটান পুলিশের কাছে চলে যান। ওদের সাহায্য চান। আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। অর্জুনকে ইশারা করে নেমে পড়লেন অমল সোম। অর্জুন নামতেই জিপটা সীমান্ত পেরিয়ে বর্ডার পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সামনে পড়ল। অর্জুন দেখল ওদের ছাড়া পেতে সময় লাগল না। তারপরেই জিপটা ওপরে উঠে যেতে চারপাশে অন্ধকার নামল। শুধু ভুটান পুলিশের চেকপোস্টে হ্যাজাক জ্বলছে। দুজন সান্ত্রী বন্দুক হাতে তার বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

অমলদা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, “ওরা কোথায় যেতে পারে বলে তোমার ধারণা অর্জুন ? সোজা সামচি বাজারে পৌঁছাবে চেকপোস্ট ডিঙিয়ে ?”

অর্জুন বলল, “আমি বুঝতে পারছি না। যদি না যায় তা হলে ওদের গাড়িটাকে দেখতে পেতাম।”

“গুড। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, আমাদের মতন ওদের দু'জন নেমে গেছে মাঝরাস্তায়। মান সিং নামের এদেশি লোকটা গাড়ি নিয়ে পুলিশের কাছে কিছু জবাবদিহি দিয়ে চলে গেছে বাজারে। সেখানে কারও গ্যারাজে গাড়ি রেখে আবার ফিরে অসবে। এই চেকপোস্টগুলোতে কোনওরকম কড়াকড়ি হয় না। কোথা থেকে আসছ, কোথায় যাবে এইটুকু জানালেই চলে। তাই না ?”

অর্জুনেরও তাই মনে হল। এদিকটা এখন গভীর অন্ধকারে ঢাকা। ওপাশে পাহাড়ের শরীর সোজা ওপরে উঠে গেছে। সামচি পাহাড় হিসেবে কোনও কৌলীন্য দাবি করতে পারে না। কিন্তু রাত্রে তাই কত রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই।

অমলদা বললেন, “অদ্ভুত ব্যাপার তো ? এই পাহাড়ে কি ঝিঁঝিও শব্দ করে না ? অর্জুন, তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। আমি একটু ঘুরে আসছি।”

অমলদা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে অর্জুন চারপাশে একবার তাকাল। এইভাবে কোনও সূত্র ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকার কী অর্থ, তা তার মাথায় আসছিল না। সামচিতে যদি ওরা যায়, তা হলে জেমসকে জোর করে ধরে নিয়ে

pathagar.net

গেছে। আর তারই বা কী দরকার। জলপাইগুড়ি থেকে আসবার পথে অন্ধকারে যে-কোনও জঙ্গলের ধারেই ওকে মৃত অবস্থায় ফেলে দিলে কে দেখবে। একজন এফ. বি. আই. অফিসার এত সহজে মারা গেল, ভাবলেই অবাক হতে হয়। অবশ্য মারা যে গিয়েছে, তারও তো কোনও প্রমাণ নেই।

ঠিক সেই সময় দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা বাড়ির সামনে আলো জ্বলে উঠল। আলোটা জ্বলছে নিভছে। অর্জুন সতর্ক হল। এত রাত্রে কেউ আলোর খেলা খেলবে কেন? শেষবার নিভে যাওয়ার পর আর জ্বলল না আলোটা। অর্জুনের মনে হল, কেউ নিশ্চয়ই জেগে আছে ওদিকে। তাকে আলোটা টানছিল। রাস্তা দিয়ে ঘুরে যেতে গেলে সামনেই পড়বে চেকপোস্টটা। অর্জুন ডান দিকে এগোল। অন্ধকারে বেশিক্ষণ থাকলে আকাশ এক ধরনের আলো দেয়। যাদের চোখ থাকে, তারা ঠিক পৃথিবীটাকে চিনে নিতে পারে। অর্জুন চেষ্টা করল।

পাহাড় কখনওই পায়ে চলার জন্য সুন্দর রাস্তা তৈরি করে রাখে না। আগাছা, এবড়ো-খেবড়ো পাথর ডিঙিয়ে অর্জুন সন্তর্পণে উঠছিল। তার একবার মনে হয়েছিল অমল সোমকে খবরটা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে কি না। কিন্তু পরক্ষণেই স্থির করলে আলোর উৎসটা দেখেই ফিরে আসবে। কিছুদূর যাওয়ার পর অর্জুন বুঝল আর এগোন সম্ভব নয়। এখান থেকে পাহাড় খাড়াই উঠে গেছে। ওপাশে অনেক নীচে একটা চওড়া নদীর খাত। আলোটা যেখানে জ্বলেছিল সেখানে এদিক দিয়ে পৌঁছানো যাবে না। সে সমান্তরালভাবে হাঁটতে লাগল। এবং এক সময় আগাছা ভাঙতে-ভাঙতে বড় রাস্তায় চলে এল। এই রাস্তাটাই চেকপোস্টের সামনে দিয়ে চলে এসেছে। অর্জুন আবার ওপরের দিকে তাকাল। সেখানে পৌঁছতে গেলে রাস্তাটা ধরে চলাই সুবিধে।

ক্রমশ সে সামচির বাজারে এসে পড়ল। বাড়িঘরগুলো ঘুমিয়ে আছে। কোথাও কোনও প্রাণের অস্তিত্ব নেই। বাজারটা চৌকো, মাঝখানে চত্বর খোলা পড়ে আছে। আরও একটু এগোতেই সে মানুষের গলা শুনতে পেল। একাধিক মানুষ জড়ানো গলায় কথা বলছে। সন্তর্পণে এগিয়ে সে বুঝতে পারল ওটা দিশি মদের দোকান। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। কথাবার্তা আসছে ওখান থেকেই। একটু অপেক্ষা করল সে। ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে আলো বাইরে আসছে। হঠাৎ তিনটে লোক বেরিয়ে এল বাইরে। তিনজনেই স্থানীয় মানুষ। পা টলছে। তারা বের হওয়ামাত্র আলো নিভে গেল। শেষবার জড়ানো কথা বলে তিনটে লোক তিনদিকে চলে গেল। অর্জুন মুশকিলে পড়ল। প্রথমত এদের সন্দেহ করার কিছু নেই। দ্বিতীয়ত, যদি অনুসরণ করতে হয়, কাকে করবে। যারা জলপাইগুড়ি থেকে এসেছে তাদের একজন আমেরিকান, একজন চাইনিজ আর একজন নেপালি। এই তিনটে মানুষের

নেপালিটাই থাকতে পারে। তিনজনের চেহারাই এক। আর এইসব ভাবতে-ভাবতে ওরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। অর্জুন ঠিক করল যেখানে অমলদা তাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন সেখানেই ফিরে যাবে। ঠিক তখনই পানশালার ঝাঁপ সরিয়ে চতুর্থ লোকটি বেরিয়ে এল। বেরিয়ে একটু অপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নেপালি ভাষায় কিছু বলল কাউকে। ভেতর থেকে জবাব এল। লোকটা একটু অপেক্ষা করে পা ফেলতে লাগল। মধ্যবয়সী লোকটা বেশ স্মার্ট, প্যান্ট আর জ্যাকেট পরা, মাথায় একটা চাপা টুপি। সে হঠাৎ পকেট থেকে টর্চ বের করে কয়েকবার জ্বালল আর নেভাল। অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে ওপারের পাহাড়ের দিকে তাকাল। সঙ্গে-সঙ্গে সেখানেও একই আলোর সঙ্কেত শুরু হল। এবার লোকটা সন্তুষ্ট হয়ে সেদিকে হাঁটতে লাগল। রাস্তাটা দুটো ভাগ হয়ে গেছে। একটা সোজা ওপরের দিকে চলে গেছে, আর একটা বেঁকে ওই পাহাড়ে। মুখ-চোখ এখন ভাল করে দেখা অসম্ভব ব্যাপার, তবু অর্জুনের মনে হল, এই হল মান সিং। লোকটা, এতক্ষণ পানশালায় ছিল কিন্তু একফোঁটাও মদ খেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। ও গাড়িটাকে কোথায় পার্ক করল ?

কিন্তু পাহাড়ের রাস্তায় যেখানে পায়ের তলায় অসমান নুড়ি সেখানে কাউকে শব্দহীন হয়ে অনুসরণ করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এই লোকটা বোধহয় ফুর্তিতে আছে। অর্জুন চেষ্টা করছিল যতটা নিঃশব্দে যাওয়া যায়। লোকটা যেভাবে পা ফেলছে সে তাই করছে। কিন্তু লোকটা একটিবারও পেছন ফিরে তাকিয়েছে বলে মনে হল না। মিনিট দশেক হাঁটল লোকটা। এখনও ওরা পাহাড়ের অনেকটা উঁচুতে উঠে এসেছে। পরপর অনেকটা জায়গা নিয়ে এক-একটা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি বাড়ি কাঠের এবং দেখলেই বোঝা যায় মানুষগুলো অর্থবান। লোকটি যে বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়াল সেখানেই রাস্তার শেষ। তারপরেই পাহাড় নেমে গেছে সোজা নীচে নদীর বুকে।

বারান্দায় যে দাঁড়িয়ে ছিল সে শিস দিতেই আগন্তুক একই সঙ্গে শিস দিল, একই রকম ছন্দে। তারপর সে ভেতরে ঢুকে গেল। অর্জুনের নিশ্চিত ধারণা হল, মান সিং গাড়ি পার্ক করে তার কর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এই মাটি ভুটানের। যদিও পাশপোর্ট-ভিসার দরকার হয় না কিন্তু এখানকার পুলিশ তাকে যে-কোনও মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। কী করবে বুঝতে পারছিল না সে। ওই মানুষগুলো যদি এখানে থাকে তা হলে বিপদ যে-কোনও মুহূর্তেই আসতে পারে। ওই গ্রেনেড-লাইটার ছুঁড়ে দিলেই হল। আর যদি জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর আসল লাইটারের মালিক এখানে থাকে তা হলে তো আর দেখতে হবে না। অর্জুনের সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই। যদি এস. পি. এখানকার পুলিশদের সঙ্গে এনে বাড়ি ঘেরাও করেন, তা হলে সদলবলে ধরা যায়। কিন্তু ওদের তো জানাতে হবে। অমলদা যেখানে থাকতে বলেছিলেন, সেখানে

ফিরে যেতেও তো সময় লাগবে !

এই সময় বাংলোর একটা দরজা খুলে গেল। অর্জুন দ্রুত একটা গাছের আড়ালে সরে গেল। যে লোকটা বেরিয়েছিল, সে বারান্দার রেলিং ধরে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, এত দেরি হল কেন ? কোনও গোলমাল হয়েছে নাকি ?"

"সামচি আমার হাতের মুঠোয়। গোলমাল এখানে হবে কেন ?"

"কোনও গাড়ি এসেছে ?"

"হ্যাঁ। জলপাইগুড়ির এস. পি. একা গাড়ি নিয়ে ঢুকেছে।"

"এস. পি. ! ওই ছোকরা সঙ্গে নেই তো ?"

"না।"

"কেন্টকে বললাম শেষ করে দিতে ছোকরাটাকে কিন্তু ও খেলতে চাইল। কাম অন, আমরা এখনই রওনা হব।" লোকটা এবার বাংলোর ভিতরে ঢুকে গেল। মান সিং সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে তাকে অনুসরণ করল। যে লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, সে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল। তারপর সিঁড়ির মধ্যে বসে পড়ল। ওই লোকটা হয়তো নিরীহ। জাল লাইটার হাতে পায়নি।

কিন্তু ওরা এখন কোথাও যাচ্ছে ! কোথায় ? অর্জুন আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। এবার ওই লোকটি হেঁটে আসছে দেখতে পেল গেটের কাছে। গেটে হাত রেখে চারপাশে তাকাল। তারপর মুখের শেষ-হয়ে-আসা সিগারেটের প্রান্তটুকু ছুঁড়ে দিল রাস্তায়। একবার পেছন ফিরে তাকাল। বাংলোয় কোনও আলো জ্বলছে না। লোকটা গেট খুলে চলে এল এপাশে। তারপর কী জন্য যেন পথের পাশে বসে পড়ল। মুহূর্তেই অর্জুনের শরীর টান-টান হল। বাংলোর কাছে পৌঁছনোর এই একটাই সুযোগ। লোকটা বসেছে তার দিকে পেছনে ফিরে। সে নিঃশব্দে চিতাবাঘের মতো দূরত্বটা অতিক্রম করল। শেষ মুহূর্তে বোধহয় লোকটা অনুমান করল কেউ আসছে। কিন্তু ততক্ষণে অর্জুনের হাত নেমে এসেছে ওর ঘাড়ে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা ককানির মতো শব্দ হল। আর লোকটা এলিয়ে পড়ল মাটিতে। অর্জুন ওকে টেনে নিয়ে এল গাছটার পেছনে। লোকটা নেপালি। কোমরে একটা ভোজালি গোঁজা। সেটা খুলে নিয়ে বাংলোর দিকে তাকাল সে। দরজাটা এখন বন্ধ। কেউ নেই সামনে। দ্রুত ঢুকে পড়ল অর্জুন ভেতরে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর ওপরে না উঠে বাংলোর পাশ দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। বাংলোর ঠিক পেছনেই পাহাড়টা নেমে গেছে নদীর বুকে। সেখানে পৌঁছে সে মানুষের গলা পেল। দুটো ভারী স্যুটকেস নিয়ে কারা কথা বলতে বলতে বাংলো থেকে নামছে। মান সিংয়ের গলা পেল সে, "ওকে কিছু বলে যাওয়া হল না। ও জানবে আমরা বাংলোতেই আছি।"

"তাই জানা উচিত। বেশি লোককে জানাবার দরকার নেই।"

"এর মধ্যে সব একই ধরনের মাল আছে ?"

"কেন ?"

"হাত থেকে পড়ে গেলে তো শেষ হয়ে যাব।"

"শেষ যাতে না হও তার ব্যবস্থা করা আছে।"

অর্জুন এবার লোকটিকে চিনতে পারল। পাতলা, কিন্তু মজবুত শরীর। একটা হিলহিলে ভাব আছে। চেহারা দেখলে চাইনিজ বলে মনে হয়। থাই কিংবা সিঙ্গাপুরিও হতে পারে। ওরা নদীর ধার দিয়ে নেমে যাচ্ছিল। অর্জুনকে অনেকখানি ব্যবধান রাখতে হচ্ছিল। জেমস নিশ্চয়ই একটি মৃতদেহ হয়ে পড়ে আছে কোথাও। লোকটার জন্য কষ্ট হচ্ছিল তার। মিনিট পনেরো হাঁটার পর ওরা একটা প্যাগোডা টাইপের বাড়ির সামনে এসে পড়ল। এদিকে মানুষের বসতি কম। এত রাতেও পাশের মনাস্ট্রিতে অদ্ভুত বাজনা বাজছে। প্যাগোডা টাইপের বাড়িটার ভেতরে ঢুকে গেল ওরা। অর্জুন দেখল দু'জন লামা কথা বলতে বলতে মনাস্ট্রি থেকে বেরিয়ে উলটো দিকে চলে গেলেন। এবং তখনই বাজনা থেমে গেল।

"ডোন্ট মুভ," চাপা গলায় ধমকানিটা শুনে চমকে পেছনে ফিরে তাকাতেই অর্জুন অমল সোমকে দেখতে পেল। অমলদা বললেন, "তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। খুব রেগে যেতাম যদি না ঠিক জায়গায় পৌঁছে যেতে। এস. পি. মিনিট পাঁচেকের মধ্যে এসে পড়বেন। কিন্তু তার আগে আমি ভেতরে যাচ্ছি। তুমি এবার এখান থেকে নোড়ো না।" কথা শেষ করে অমলদা বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ভেতর থেকে শব্দ ভেসে এল। কেউ চ্যালেঞ্জ করছে। অমলদা কিছু জবাব দিতেই আলো দেখা দিল। একটা লোক বেরিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল ওঁকে। নিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে যেন খাতির ছিল।

ঠিক তখনই মনাস্ট্রি থেকে আর-একটি লোক বেরিয়ে চাতালের ওপর দাঁড়াল। লোকটা কোমরে হাত রেখে আকাশ দেখল। তারপর লম্বা-লম্বা পা ফেলে প্যাগোডা-বাড়ির দিকে আসছিল। এই আকাশ-চুঁয়ানো তারার আলোয় কাছাকাছি লোকটাকে দেখে অর্জুনের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। জেমস ব্রাউন বাড়িটায় ঢুকছে।

এই সময় চাইনিজ লোকটি ওপর থেকে ডাকল, "কেন্ট, সামওয়ান ওয়ান্টস টু মিট ইউ।"

"হু ইজ হি ?"

"এ বায়ার। গট ইনফরমেশন ফ্রম কাঠমাণ্ডু। হিজ আইডি ইজ জনিস ফ্রেন্ড।"

"ডিড ইউ টেল জনি দ্যাট উই উড বি হেয়ার ?"

"ইয়া।"

"ও. কে. আই অ্যাম কামিং।" তরতর করে উঠে গেল জেমস ওপরে।

মাথায় কিছু ঢুকছিল না। জেমস আর কেন্ট এক লোক? জেমস তো এফ. বি. আই-এর অফিসার। কেন্ট স্পষ্টতই স্মাগলার। অর্জুন এও বুঝতে পারছিল না অমল সোম কী করে জনি নামক লোকটির বন্ধু হন!

তখনই পায়ের শব্দ পেল অর্জুন। দশ-বারোজন পুলিশ আড়ালে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এস. পি. ওর পাশে এসে নিচু গলায় প্রশ্ন করলেন, "অমলবাবু ভেতরে?"

খুব রাগ হয়ে গেল অর্জুনের। অমলদা এঁকে সব প্ল্যান বলে এসেছেন, কিন্তু তাকে কিছু জানাননি। সে গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল। এস. পি. বললেন, "উনি আমাদের অপেক্ষা করতে বলেছেন যতক্ষণ না বাইরে বেরিয়ে আসেন।"

মিনিট-দশেক কেটে গেল। তারপর আলো জ্বলল। অমল সোম ইংরেজিতে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসছেন, "তোমরা কী করে আশা কর জিনিসগুলো ঠিক কাজ করবে কি-না না জেনে আমি টাকা দেব। অন্তত একটা আমাদের সামনে পরীক্ষা কর। তা ছাড়া আমি শুনেছিলাম লাইটার থেকে রে বের হয়। সেটাই তো দিচ্ছ না।"

জেমস বলল, "লুক ম্যান, এই রাত্রে গ্রেনেড চার্জ করলে সবাই শুনতে পাবে। তা ছাড়া রে-লাইটার যে বিক্রির জন্য নয়, তা জনি জানে। তুমি সত্যি একজন খদ্দের কি না আমার সন্দেহ আছে।"

"সন্দেহ? জনি কখনও তোমাদের বলেনি সে ইন্ডিয়ান খদ্দেরদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে?"

"বলেছিল। কিন্তু তোমার সঙ্গে টাকা কোথায়?"

"আগে মাল দেখব, পরে টাকা। তুমি তো মালই দেখাতে পারলে না।"

"তুমি এখানে এসেছ কী করে?"

"বাই রোড। আমার গাড়ি বাজারে রেখে এসেছি।"

হঠাৎ জেমস ঘুরে ডাকল, "লি, এই লোকটাকে পরীক্ষা করতে বল মান সিংকে।"

চাইনিজ লোকটার নাম লি। সে মান সিংকে হিন্দিতে কিছু বলল। মান সিং মাথা নেড়ে নীচে নেমে এল। অমল সোম পা বাড়াচ্ছিলেন, জেমস বাধা দিল, "নো ম্যান, তোমার গাড়ির নাম্বারটা বল। মান সিং বাজারে গিয়ে দেখে আসবে তুমি ঠিক বলছ কি না। মাল কিনতে তুমি একা এসেছ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"গাড়ি দেখে কী করে বিশ্বাস করবে?"

"সেটা আমি বুঝব। আগে দেখি গাড়িটা আছে কি না।"

এই সময় একজন তিব্বতি ঘর থেকে বেরিয়ে লি'র পাশে দাঁড়াল। তারপর পরিষ্কার হিন্দিতে বলল; "লোকটাকে ছেড়ো না। অনেকক্ষণ থেকে আমি মনে করতে চেষ্টা করছি একে কোথায় দেখেছি। কিছুতেই মনে পড়ছে না। কিন্তু

লোকটাকে দেখে আমার ভাল লাগছে না।" ওর কথা শেষ হওয়ামাত্র লি সিগারেট বের করল এবং পকেট থেকে একটা লাইটার বের করে ধরাল। তার লাইটার থেকে কোনও আগুন বের হল না। এইবার সে সোজা অমল সোমের দিকে সেটা তাক করতেই তিনি লাফিয়ে নীচে পড়লেন। সঙ্গে-সঙ্গে মান সিং ছুটে ধরতে গেল তাঁকে। অমল সোম মাটিতে পড়েই এঁকেবেঁকে দৌড়চ্ছিলেন। এবং তখনই দৃশ্যটা দেখা গেল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল মান সিং। তারপর কাটা গাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। জেমস পকেট থেকে আর একটা লাইটার বের করে মাথার ওপর তুলতেই অর্জুন চিৎকার করে উঠল, "জেমস!" সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ চমকে গেল জেমস। অর্জুন ছুটে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে। অন্য লাইটারটি হাতে লি নামতে যাচ্ছিল। তার রে অবশ্যই দশ ফুটের বেশি যায় না। সে বোধহয় অমল সোমের কাছাকাছি যেতে চাইছিল। অর্জুনকে দেখে দ্রুত ফিরে গেল। তৎক্ষণাৎ একটা গালাগাল দিল জেমস। তারপর হাতের লাইটারটা ছুঁড়ে মারল গেটের ওপর। বিস্ফোরণের আগে অর্জুন যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে পেরেছিল। এবং তখনই পেছনে থেকে গুলি ছুটে গেল ওপরে। প্রথমে আহত হল লি। মাটিতে পড়ে গিয়ে সে চিৎকার করতে লাগল। ততক্ষণে এস. পি. ঢুকে গেছেন ভেতরে। সামচির পুলিশবাহিনী তাঁর সঙ্গে। অমল সোম চিৎকার করলেন, "কেন্ট, আত্মসমর্পণ কর, নইলে তুমি মরবে।"

জেমস ছুটে গেল লি'র কাছে। ওর পাশে পড়ে থাকা লাইটারটার ওপরে দ্বিতীয় গ্রেনেড লাইটার ছুঁড়ে মারতেই বারান্দার কিছু অংশ এবং লি'র শরীরটা নীচে গড়িয়ে পড়ল। তারপর তিন নম্বর বিস্ফোরণ ঘটল। তৃতীয় গ্রেনেড-লাইটারটা ফাটল জেমসের শরীরেই।

খুব ভোরে ফিরে আসছিল ওরা। তিনটে মৃতদেহ এখন ভুটান সরকারের হাতে। মান সিংকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার জ্ঞান ফিরেছিল দেরিতে। সে স্বীকার করেছে কাঠমাণ্ডুতে জনির ক্যাসিনোতে চাকরি করতে করতে সে এদের দলে ভিড়ে যায়। সে স্বীকার করেছিল, রায়বাবুর ছোট ছেলেকে সে মারেনি, কিন্তু অমল সোমের বাড়িতে লাইটার-গ্রেনেড চার্জ করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এবং রায়বাবুর ছেলে মারা গিয়েছে লি'র হাতে।

অমল সোম মুখ খুললেন, "সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে কাঠমাণ্ডুতে গিয়েছিলাম। জনি'র ক্যাসিনোতে সত্যেন্দ্রনাথ খবর পান সামচির মনাস্ট্রিতেই ওরা ঘাঁটি করছে। সেই উদ্দেশ্যেই ওরা এসেছিলেন ডুয়ার্সে। জেমস নামের এফ. বি. আই. অফিসারটির সর্বস্ব চুরি যায় শিলিগুড়ির হোটেলে। আমি তাকে সেখানেই রেখে এসেছি। জলপাইগুড়িতে কেন্ট এসে জেমসের নাম ব্যবহার করে তার পাশপোর্ট এবং আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে। দুটো ভালমানুষ আর

তিনটে বদলোক খুন হল, এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু সুখের ঘটনা সত্যসন্ধানী হিসেবে অর্জুন এখন দক্ষ হয়েছে। জোন্স অ্যান্ড জোন্স নিশ্চয়ই ওকে পুরস্কৃত করবে।"

অর্জুন ঠোঁট কামড়াল। তার খুব আফসোস হচ্ছিল। আসল লাইটারটা যদি পাওয়া যেত! একটাকে চোখের সামনে নষ্ট হতে দেখল। দ্বিতীয় হারানো আসল লাইটার এখন কোথায়?...

pathagar.net

দ্বিতীয় লাইটার

ইদানীং অমল সোম সারাদিন চুপচাপ থাকেন। বাইরের লোকের সঙ্গে দেখাও করেন না, কাজের প্রসঙ্গ এলে এড়িয়ে চলেন। অর্জুন দেখেছে অমলদার সঙ্গী যে বইগুলো তার সবই ঈশ্বর সম্পর্কিত। ওরকম সচল মানুষ এত চুপচাপ হয়ে যাবেন ভাবা যায় না। সেই জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর লাইটার-রহস্যের পর থেকেই এই ব্যাপার। একটি লাইটারের অস্তিত্ব জানা গিয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয়টি কোথায়, কার কাছে, তা কেউ জানে না। অবশ্য যার কাছে আছে সে ছাড়া। এমন লাইটার, যার বোতাম টিপলে অদৃশ্য আগুন বেরিয়ে আসে, যাতে সিগারেট ধরানো যায়, দ্বিতীয়টি টিপলে এমন একটা অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়ে আসে যা দশফুটের মধ্যে যে-কোনও জীবন্ত প্রাণীকে অসাড় করে দিতে পারে। প্রথম লাইটারটি পাওয়া এবং হারানোর গল্প যারা 'আনন্দমেলা'য় পড়েছ তারা জানো ওই লাইটার যারা তৈরি করেছিল, সেই আমেরিকার জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি কতটা উদগ্রীব হারানো লাইটার ফিরে পেতে। তারা ফেডারেল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশনের সাহায্য নিয়েছে কিন্তু দুটো হারানো লাইটার, যা নিয়ে একদল কুচক্রী মানুষ পৃথিবীব্যাপী জাল পাততে চলেছিল তার হদিস করা সম্ভব হয়নি। অর্জুনরা একটি লাইটার পেতে গিয়েও পেল না। সেটি ধ্বংস হয়েছে, কারও কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। এই তথ্যটি অমল সোম ঘটনাটির পর জোন্স অ্যান্ড জোন্সকে জানিয়েছিলেন। তারা তার উত্তরে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। অধিকন্তু দ্বিতীয় লাইটারটি উদ্ধার করতে সাহায্য চেয়েছিল। এ-বাবদ যা খরচ হবে, তা জোন্স অ্যান্ড জোন্স বহন করবে এবং সেইসঙ্গে ভাল পুরস্কারের ব্যবস্থাও থাকছে। স্বভাবতই অর্জুন উত্তেজিত। কিন্তু তারপর থেকেই অমল যেন হঠাৎ বৈরাগী হয়ে গেলেন। একদিন অর্জুনকে বললেন, "এসব আর আমার ভাল লাগে না। তুমি তো এখন বেশ ম্যাচিওর। যা কেস আসবে এখন থেকে তুমিই ডিল করবে।"

দ্বিতীয় লাইটারটি কোথায় আছে অর্জুন জানে না। কিন্তু জোন্স অ্যান্ড

জোন্স নিউইয়র্ক থেকে প্রায়ই তাগাদা দিচ্ছে। অমলদা চিঠিপত্র লিখেছিলেন অর্জুনের নামে। ওরা তো জানে না অর্জুনের বয়স কত! চিঠিপত্র আসছে অর্জুনের নামেই। ওরা প্রয়োজনে আমেরিকায় যাওয়ার কথা লিখেছে। কারণ এফ. বি. আই. যে দুটো লাইটারের একটাকেও খুঁজে বের করতে পারেনি, অর্জুন তার একটাকে বের করে নিশ্চিন্ত করেছে। সেই কৃতিত্ব তারা স্বীকার করেছে। অর্জুন পাশপোর্টের দরখাস্তে করেছিল কিছুদিন আগে বাংলাদেশ বেড়াতে যাবে বলে। সেখানে ন'মাসির দেওর থাকেন এখনও। সেটা হাতে এসেছে। জোন্স অ্যান্ড জোন্স নিউইয়র্ক থেকে জানিয়েছে ভিসা কোনও সমস্যা হবে না।

আমেরিকায় যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করতে পারছে না অর্জুন। তোমরা যারা অর্জুনকে জানো, তারা আর-একজনকে তো জানোই, তিনি কালিম্পং-এর বিষ্টুসাহেব। খুব ভাল মানুষ। বয়স হয়েছে, বিয়ে-থা করেননি, কালিম্পংয়ে কুকুর নিয়ে থাকতেন, অর্জুনকে খুব স্নেহ করেন। অমল সোম বয়সে ছোট হলেও শ্রদ্ধার সঙ্গে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেন। সেই বিষ্টুসাহেব কিছুদিন ধরে কঠিন অসুখে ভুগছেন। তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। স্থানীয় ডাক্তাররা রোগ ধরতে পারছে না। বিষ্টুসাহেবের এক বোন থাকেন নিউইয়র্কে। তিনি বারংবার লিখছেন, ওঁকে সেখানে যাওয়ার জন্যে। চিকিৎসা ভাল তো হবেই, জায়গারও পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু বিষ্টুসাহেব একা সেখানে যেতে সাহস পাচ্ছেন না। ছোটখাটো বৃদ্ধ মানুষটি জানিয়েছিলেন, যদি অমল সোম তাঁর সঙ্গী হন, তা হলে তিনি বিদেশে যেতে রাজি আছেন। অমল সোম আর তাঁর দোতলার কাঠের ঘর ছেড়ে নড়বেন এ আশা নেই। জোন্স অ্যান্ড জোন্সের আমন্ত্রণ আর বিষ্টুসাহেবের শরীরের কারণে বিদেশে যাওয়া, গন্তব্যটা যখন এক তখন অর্জুন এক দুপুরে গিয়ে হাজির হল কালিম্পংয়ে।

বাজার ছাড়িয়ে বাঁ দিকে তিব্বতি কারুশিল্পের শো-রুম রেখে অর্জুন হাঁটছিল। এখন তার শরীর পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা। ছিপছিপে, সামান্য মেদ নেই। ফর্সা গালে তরুণ রবীন্দ্রনাথের মতো দাড়ি যা কিনা এখনও কালচে ভাব ধরেনি। অর্জুন হাঁটছিল খুশি মনে। কালিম্পংয়ের পাহাড়টাকে তার ভাল লাগে। কী শান্ত, আর নীল চাদর মুড়ে চুপচাপ বসে থাকে চারপাশে। রাস্তাটা যাচ্ছে সার্কিট হাউসের দিকে। আরও ছাড়ালে দূরবিন-দাঁড়া। এই পথেই ডান দিকে বিষ্টুসাহেবের কটেজ। কিছু নেপালি মেয়ে বোধহয় স্কুল ফেরত ভর দুপুরেই বাড়ি যাচ্ছে। দু-একজন তিব্বতি গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। রাস্তাটা যেখানে গুলতির মতো দু'টুকরো হয়েছে সেখানে এসে দাঁড়াতেই সে মানুষটিকে দেখতে পেল। পাহাড়ের শরীরে প্রায় নাক লাগিয়ে কিছু দেখছেন। লম্বায় অন্তত ছয়-দুই, বিশাল চেহারা, নীল জিন্সের ওপর সাদার জ্যাকেট, মুখে একজঙ্গল কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথায় বারান্দা-দেওয়া নেপালি টুপি, হাতে ছড়ি আর চুরুট। এই লোকটিকে কোথায় যেন দেখেছে

pathagar.net

বলে মনে হচ্ছিল অর্জুনের। খুব চেনা অথচ ঠাহর করতে পারছিল না। এত মগ্ন হয়ে আছেন যে, বিশ্বচরাচর ওঁর কাছে মুছে গেছে যেন। অর্জুন দাঁড়িয়ে পড়ল। কারণ ভদ্রলোকের হাতের চুরুট তাঁর জ্যাকেটের গায়ে, যে-কোনও মুহূর্তে আগুন ধরতে পারে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ পড়ল অর্জুনের ওপর, "অদ্ভুত! ভাবতে পারিনি এখানে এসে একে দেখতে পাব।" ঘন-ঘন দাড়ি-মুখ নাড়ছিলেন ভদ্রলোক। তারপর 'উঃ' বলে চুরুটটাকে ছুঁড়ে দিলেন রাস্তায়। তাঁর হাতে অবশ্যই ছ্যাঁকা লেগেছিল। দাড়িওয়ালা মানুষটাকে মুহূর্তেই ভাল লাগল অর্জুনের। শিশুর সারল্য আচরণে। বড্ড চেনা।

সে হেসে জিজ্ঞেস করল, "কিছু যদি মনে না করেন, কী দেখতে পেলেন জানাবেন?"

"অফকোর্স," ভদ্রলোক নিজের ছ্যাঁকা-লাগা দুটো আঙুল ঠোঁটের ওপর থেকে সরিয়ে বললেন, "রেয়ার টাইপ অব পপি। সুইজারল্যান্ডেও দেখতে পাইনি। আমার বন্ধু হেনরি ডিমককে বললে এক্ষুনি ছুটে আসবে। কিন্তু বলব না, সারপ্রাইজ দেব। সেবার আইসল্যান্ড থেকে ফিরে ওকে একটা ফসিল দিয়েছিলাম, এবার পপি।"

অর্জুন ফুলটাকে দেখল। এই ধরনের জংলি ফুল পাহাড়ের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। বিশেষ ভাবে কোনওদিন নজর করেনি সে। এখনও মনে হল না অসাধারণ কিছু। ভদ্রলোক আর কথা বললেন না। গম্ভীর হয়ে পাহাড় দেখতে লাগলেন। যেন কোনও এগজিবিশনে গিয়ে ছবি দেখছেন মন দিয়ে।

বিষ্টুসাহেবকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখবে আশা করেনি সে। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠেই সুন্দর বাগানটার পাশে বারান্দায় নজর যেতেই বিষ্টুসাহেব যেন লাফিয়ে উঠলেন, "আরে অর্জুন! কী আশ্চর্য! তুমি? ভাবাই যায় না। এসো, এসো।"

অসুস্থ মানুষটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আন্তরিক হাসিতে। দুটো হাত বাড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করার আগেই অর্জুন সেখানে পৌঁছে গেল, "ব্যস্ত হবেন না, আপনি বসুন। কেমন আছেন?"

"আর আছি। হঠাৎ যে কী হল! এখন তো বারান্দায় বসে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, মাসখানেক আগেও বিছানা ছাড়তে পারতাম না। কেমন দেখছ, ঠিক আছে?" শেষ শব্দ দুটো শুনে হাসি পেলেও মাথা নাড়ল অর্জুন। ওটা বিষ্টুসাহেবের মুদ্রাদোষ। দোষ কেন বলে কে জানে! বলল, "একটু রোগা হয়ে গেছেন। ডাক্তাররা কী বলছে?"

"ফালতু! মানুষের শরীরের রোগ ধরতে পারে না যে, সে কিসের ডাক্তার! তিনি কোথায়?"

"কে, অমলদা!" অর্জুন বিষ্টুসাহেবকে অমলদার বৈরাগ্যের কথা জানাল।

শুনে আফসোসের শব্দ উচ্চারিত হল বিষ্টুসাহেবের মুখে, "ছি ছি। অমন প্রতিভা, যাকে বলে পর্বতপ্রমাণ, তাকিয়ে দেখছ কী, শুয়ে-শুয়ে অনেক বাংলা পড়ে ফেলেছি হে, হ্যাঁ, পর্বতপ্রমাণ প্রতিভার কী অপচয়! ছি ছি! আমি তো আজই চিঠি লিখব ভেবেছিলাম। অতবড় লাইটার-অভিযান আমাকে বাদ দিয়ে হল? তোমাদের খুঁটিমারি রেঞ্জ ছাড়া সবক'টাতেই তো আমি আছি! শরীরটা—দেহপট সনে নট সকলি হারায়।"

অবাক থেকে কৌতুকে পৌঁছে গেল অর্জুন, "ওই লাইনটা অভিনেতাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু আপনি লাইটারের কথা জানলেন কী করে? অমলদা কী লিখেছিলেন?"

"তিনি লিখলে কোনও আফসোস থাকত না। আমাকে পড়তে হল কিনা বিদেশি কাগজে!"

"বিদেশি কাগজ?" অর্জুন আরও অবাক।

"ও ঘরে যাও। ওঠো, হ্যাঁ, বাঁ দিকের টেবিলে ভাঁজ করা আছে। কী কাগজ ওটা? নিউইয়র্ক টাইমস! তার দ্বিতীয় পাতা খোলো। ওপরে কী লেখা?" চেয়ারে বসে বলে যাচ্ছেন তিনি। অর্জুন কাগজটার সামনে দাঁড়িয়ে পুলকিত। বড়-বড় হরফে ছাপা, "ওয়ান মিসিং লাইটার ট্রেসড্ বাই অ্যান ইয়াং ইন্ডিয়ান ইনভেস্টিগেটর।" তার নীচে বিস্তারিত বিবরণ। এমনকী অর্জুনের কৃতিত্বে যে এটা সম্ভব হয়েছে তাও লেখা। সমস্ত শরীরে যেন কদম ফুটল অর্জুনের। সাগরপারের একটা কাগজে তার কথা এমনভাবে লেখা হবে তা কল্পনাতেও ছিল না। কাগজটাকে রেখে দিয়ে সে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই বিষ্টুসাহেব তৃপ্তির হাসি হাসলেন, "আই অ্যাম হ্যাপি। আমি তোমাকে কতবার বলেছি, জলপাইগুড়িতে বসে থেকো না, তোমার মধ্যে সম্ভাবনা আছে। ঠিক আছে?"

"আপনি নিউইয়র্ক টাইমস রাখেন?"

"কালিম্পংয়ে ওসব পাওয়া যায়? পাগল! আমার বোনের দেওর এসেছে আমাকে নিয়ে যেতে। এক নম্বরের পাগল। এর মধ্যে কালিম্পংয়ের সবাই চিনে গেছে। এত জোরে হাসে যে, এই বাগানে পাখিগুলো আর বসতে চায় না। মেজর ছিল। মেজাজেও মিলিটারি। আমারই মতো ব্যাচেলর। একটু আগে ফুল দেখতে বেরিয়ে গেল। কেন, রাস্তায় দ্যাখোনি?" বিষ্টুসাহেব বোধহয় অনেকদিন বাদে অনর্গল কথা বলছেন। কারণ তাঁর মুখে এবার একটু ক্লান্তির ছাপ।

অর্জুন মাথা নাড়ল, "মুখে দাড়ি, হাতে চুরুট?"

"ঠিক আছে।"

বলতে-না-বলতে পায়ের শব্দ হল। অর্জুন দেখল, মেজর ফিরছেন। তাঁর কোলে একটা নেড়ি কুকুরের বাচ্চা। মুখে স্নেহ যেন ঝরে পড়ছে। বিষ্টুসাহেব

pathagar.net

সোজা হয়ে বসলেন, "নো, নো, নেভার। এ-বাড়িতে কুকুর ঢুকবে না। লিলি নেই, ওর পর এ-বাড়িতে আর কুকুর দেখতে চাই না। ঠিক আছে?"

বিশাল চেহারার ভদ্রলোক হঠাৎ জবুথবু হয়ে গেলেন, "অসহায় জীব, রাস্তায় কুঁকড়ে পড়ে ছিল। মনে হচ্ছে এর শরীরে মেক্সিকান ব্লাড আছে। মেক্সিকান উলফের ব্লাড!"

বিষ্টুসাহেব হাঁ হয়ে গেলেন। অর্জুন দেখল, নেড়ি কুকুরটাকে বুকের মধ্যে সন্তর্পণে চেপে ভদ্রলোক কাতর চোখে তাকিয়ে আছেন। এই মুহূর্তে ওঁকে কিছুতেই মেজর বলে মনে হচ্ছে না। বিষ্টুসাহেব বিড়বিড় করলেন, "নেড়ি কুকুরে মেক্সিকান ব্লাড! আমাকে কুকুর চেনাচ্ছে। নামানো হোক ওটাকে! হ্যাঁ, অ্যাই, তুতু, এত্তা আও, তু তু তু।"

নেড়ি-বাচ্চাটা সুড়সুড় করে এসে বিষ্টুসাহেবের পা চাটতে লাগল। ভদ্রলোক হাত ঝাড়লেন। তাঁর সবকটা দাঁত ঝিলিক দিল দাড়ির ফাঁকে, "ঠিক এক রকম, বুঝলেন! সেবার মেক্সিকোতে গিয়েছি মরুভূমিতে এক ধরনের নেকড়ে দেখতে। হেনরি ছিল সঙ্গে। দেখি, নেকড়ের বাচ্চা। ঠিক এইরকম গায়ের লোম, তাকানোর ভঙ্গি, হেনরির পা চাটল ওই এক ভঙ্গিতে। বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পারেনি। মেক্সিকান ফক্স কী করে এদেশে এল তা বুঝতে পারছি না।"

কুকুরেরা বোধহয় ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। না হলে এই নেড়ি কুকুরটি গুটগুট করে কেন ঘরের ভেতর ঢুকে যাবে? সেইদিকে তাকিয়ে বিষ্টুসাহেব একটি প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করলেন, "ওঃ লিলি, লিলি রে—!"

সামনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক নাক কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, "লিলি কে?"

বিষ্টসাহেব বুকে হাত দিলেন, "আমার পাঁজর! ওই যে ওইখানে ওকে শুইয়ে রেখেছি।"

সঙ্গে সঙ্গে যেন ভূমিকম্প হল। ভূমিকম্প শব্দটি মনে করা ছাড়া কোনও উপায় রইল না। কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে হাসির আওয়াজে। একটা পাহাড়ি কাক বসে ছিল গ্রান্ডিফ্লোরার ডালে, ভয় পেয়ে ডানায় শব্দ করে উড়ে গেল। পেটে হাত দিয়ে হাসি থামিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "ওঃ, ভাবতেই পারিনি আপনি আর-একটা কুকুরের শোক করছেন। আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি? ওহো, একটু আগেই, তাই না?" শেষ দুটি প্রশ্ন অর্জুনকে। সে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল। বিষ্টুসাহেব বেজার মুখে বললেন, "এই রকম বিতিকিচ্ছিরি হাসিটা একটু নীচের স্কেলে ধরা যায় না? তৃতীয় পাণ্ডব, ইনি হলেন মেজর, মেজর আমার বোনের দেওর। আর মেজর, এ হল তৃতীয় পাণ্ডব। বুঝতে পারা গেল কি? নিউইয়র্ক টাইমসে যে তরুণ বঙ্গ-সন্তানটির কথা লেখা হয়েছে, এই হল সেই অর্জুন।"

মেজরের মুখের অভিব্যক্তি দাড়ির কারণে দেখা যায় না বটে, কিন্তু চোখ

দুটো যে বিস্মিত এবং পুলকিত হয়ে উঠল, তাতে সন্দেহ নেই। অত্যন্ত গাঢ় গলায় তিনি হাত বাড়িয়ে বললেন, "আই অ্যাম গ্লাড টু মিট ইউ। এত অল্প বয়সে এত বড় কাজ করেছেন, আহা, বড় সুন্দর।"

অর্জুন লজ্জা পাচ্ছিল। প্রসঙ্গ এড়াতে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি বিষ্টুসাহেবকে ওদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন ? বাঃ, খুব ভাল। ওঁর চিকিৎসার পরিবর্তন হলে উপকার হবে।"

"শুনুন তা হলে। উনি যাবেন কি না মনস্থির করতে পারছিলেন না। অথচ আপনার স্নেহধন্য এই তরুণ গোয়েন্দাটি বলছে, গেলে আপনার উপকার হবে।" মেজর চুরুট ধরালেন।

অর্জুন প্রতিবাদ করল, "আমি গোয়েন্দা নই সত্যসন্ধানী।"

"কী সন্ধানী ? সত্য ? মানে ফ্যাক্ট ? সন্ধানী মানে যে খোঁজে ? তা হলে, তা হলে আমার সঙ্গে তো কোনও প্রভেদ নেই। আমিও সত্য খুঁজি। তবে প্রকৃতির মধ্যে, আর আপনি মানুষের লুকিয়ে রাখা সত্যিটাকে খুঁজে বের করতে চান, দ্যাটস দি ডিফারেন্স। ওকে একটু এনকারেজ করুন তো।" মেজর বিষ্টুসাহেবকে দেখালেন।

"আপনি প্রকৃতিতে সত্য খোঁজেন ?" অর্জুন কৌতূহলী হচ্ছিল।

"হ্যাঁ। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছি, দিন রাত। কত রহস্য চারধারে। জলের নীচে, জলের ওপরে। মিলিটারি থেকে বিশ্রাম নিয়ে এই করে কাটাচ্ছি। কালিম্পংয়ে এসে আমার হিলারির কথা খুব মনে পড়ছে। লোকটা ইয়েতি খুঁজতে অত ওপরে উঠেও জন্তুটাকে না ধরে ফিরে এল।" খুব বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মেজর।

বিষ্টুসাহেব প্রতিবাদ করলেন, "জন্তুটার পায়ের ছাপ ইয়েতির কি না তা প্রমাণিত হয়নি।"

হাত তুললেন মেজর। এখন তাঁর চুরুট জ্বলছে, "ঠিক কথা। প্রমাণিত হয়নি বলেই ওটা যে ইয়েতির নয় তাও বলা যাচ্ছে না। আই মাস্ট কাম হিয়ার। নেক্সট সামারেই আসব।"

"আপনি অনেক অভিযান করেছেন ?" অর্জুন মুগ্ধ হচ্ছিল।

"তেমন কিছু না। আমাজনে তিরিশ দিন ডিঙি নৌকোয় ছিলাম, আল্পসের তুষারঝড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম পুরো সাতদিন, ওজন কমেছিল বারো কেজি। আইসল্যান্ডে এক ধরনের শ্যাওলা খুঁজতে গিয়ে গ্লেসিয়ারের ওপর তাঁবু করে আছি টের পেতে দু'দিন লেগেছিল। তবে সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছিল হার্লেমের একটা নিগ্রো ফ্যামিলির কাছে আফ্রিকায় যাওয়ার নেমন্তন্ন জানাতে গিয়ে। দু'জন নিগ্রোর সঙ্গে অলওয়েট বক্সিং-এ তিনটে পাঁজর ভেঙেছিল। আমি কোনও অন্যায় সহ্য করতে পারি না। নো, নেভার। আপনার শরীর কেমন আছে ?" ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন মেজর।

"আছি আর কি," বিষ্টুসাহেব বিরস গলায় বললেন।

"ওয়েল। দেন উই উইল স্টার্ট টুমরো।" ঘোষণা করলেন মেজর।

"না। মনে হচ্ছে শরীর এখানেই সেরে উঠছে।" প্রতিবাদ জানালেন বিষ্টুসাহেব।

"নো! NAWH, NINE, NOH, NAY, NAI!" চিৎকার করে উঠলেন মেজর।

"মানে?" বিষ্টুসাহেব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন।

"এগুলো সবই 'না'। ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, ডাচ ইত্যাদি ভাষায়। আন্তর্জাতিক ভাষায় প্রতিবাদ করলাম। অন্যায় করছেন এখানে পড়ে থেকে। অন্যায় আমি সহ্য করতে পারি না। আপনাকে যেতেই হবে। আপনি কী বলেন?" মেজর অর্জুনের দিকে তাকালেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল, "বিষ্টুসাহেব, আপনি চলুন। আমাকে জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি আমন্ত্রণ করেছে আমেরিকায় যাওয়ার জন্য। আপনি গেলে আমি যাব।"

সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হলেন বিষ্টুসাহেব, "তুমি যাবে? বাঃ। তা হলে আমি রাজি। ঠিক আছে?"

অর্জুন দেখল মেজরের মুখ তখনও গম্ভীর। সে বলল, "আপনি আমাকে 'আপনি' বলবেন না। কত ছোট আপনার চেয়ে আমি।"

মেজর ঘরের দিকে পা চালাতে চালাতে বললেন, "ঠিক আছে। TANK BRAH."

বিষ্টুসাহেব তড়িঘড়ি জিজ্ঞেস করলেন, "এটা আবার কোন্ দেশের ভাষা?"

ঘরে ঢোকার আগে মেজর বললেন, "এটা সুইডিশ ভাষা। মানে ভেরি ওয়েল।"

দিল্লির হোটেলে ওরা পৌঁছেছিল মধ্যরাত্রে। এগারোটাকে তো মধ্যরাতই বলা যায়। অথচ ভোর চারটের সময় এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে। উত্তেজনায় অর্জুনের ঘুমের প্রশ্নই ছিল না। এই প্রথম সে বিদেশে যাচ্ছে। এর আগে জলপাইগুড়ির বাইরে বলতে গিয়েছিল চণ্ডীগড়ে। সেবার সঙ্গে ছিলেন অমলদা। এবার একদম অজানা বিদেশে পা বাড়ানো। আসবার পথে কলকাতায় কয়েকটা দিন কাটাতে হয়েছিল। বিষ্টুসাহেবের ভিসা টিকিট মেজর ব্যবস্থা করেছিলেন। প্যান-অ্যাম এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি অর্জুনের যাবতীয় ব্যবস্থা করেছিল। দিল্লিতে আসার পর তার কেবলই মনে হচ্ছিল একটাও ভাল জামা-কাপড় নেই। স্যুট তো দূরের কথা, বুড়িদির বুনে দেওয়া সোয়েটারটাই সম্বল। তার কাছে টাকাপয়সা নেই যে কিছু কিনবে। তা ছাড়া বিদেশে টাকার মূল্য নেই, সেখানে চাই ডলার। একটা

ডলারের বিনিময়-মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় বারো টাকা সাতাশ পয়সা। শোনার পর থেকেই অর্জুনের মনে হচ্ছিল ভাতবর্ষের চেয়ে বারো গুণ বেশি ধনী দেশে সে যাচ্ছে পকেট শূন্য রেখে। অবশ্য বিষ্টুসাহেব ভরসা দিয়ে যাচ্ছেন। জোন্স অ্যান্ড জোন্স যদি আমন্ত্রণ না জানাত তাতে কিছু যেত না, তাঁর ইচ্ছে ছিল অমল সোম সঙ্গে যাবে। তা অমল সোমের বদলে না হয় অর্জুন যাচ্ছে। অতএব কেউ কিছু দায়িত্ব না নিলে বিষ্টুসাহেবের বোন তো আছে। ভারী আদরের বোন তাঁর। মেজর কিন্তু খুব মেজাজে আছেন। তিনি বলেছেন আমেরিকায় পোশাক নিয়ে কেউ মাথাই ঘামায় না। টাই-পরা লোক রাস্তাঘাটে চোখেই পড়বে না। শীত এড়াবার জন্য জ্যাকেট থাকলেই হল। প্রয়োজনে সেসব ব্যবস্থা হবে। মেজরকে খুব ভাল লাগছে অর্জুনের। যতই হম্বিতম্বি করুন, মনটা খুব সরল। ওঁর দিকে তাকালেই চেনা মনে হয়। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছে না বলে একটা অস্বস্তি আছে। মেজরের কাছে পৃথিবীটা যেন হাতের চেটো।

ভোরবেলায় দিল্লিতে বেশ ঠাণ্ডা থাকে। পকেটে যা ছিল মেজরের পরামর্শে কিছু খুচরো ডলার কিনল অর্জুন কাস্টমস এনক্লোজারে ঢোকার আগে। ডলার দেখতে টাকার মতনই। তবে বেশ বড়সড়। সে কত ডলার নিয়ে যাচ্ছে তা আবার পাসপোর্টে লিখে দেওয়া হল। খবরের কাগজে পড়েছিল যখন কেউ এয়ারপোর্ট দিয়ে বিদেশে যাওয়া-আসা করে তখন তাকে সার্চ করা হয়। কিন্তু তাদের কিছুই করা হল না। বিপদে পড়লেন মেজর। তাঁর ব্যাগের মধ্যে সেলোফেন প্যাকেটে একগাদা ফুল পেলেন অফিসাররা। এই ফুল থেকে কোনও মাদক তৈরি হয় কি না তাই নিয়ে যখন বিস্তর আলোচনা চলছে এবং মেজর ফুলগুলো বিরল ধরনের পপি বলেও বোঝাতে পারছেন না তাঁদের, তখন তিনি ক্ষিপ্ত হলেন। অনর্গল তাঁর মুখ থেকে অচেনা শব্দ বেরোতে লাগল। কাস্টমসের লোকেরা এত তাজ্জব যে, তাঁরা যেন ছেড়ে দিয়ে স্বস্তি পেলেন। প্লেনে বসেও মেজরের রাগ পড়ছিল না। এয়ারহোস্টেস যখন তাঁকে 'যাত্রা শুভ হোক' বলে নমস্কার জানালেন, তখন তিনি গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, "ট্যাক।"

অর্জুন বসেছিল জানলার ধারে, মাঝখানে মেজর, প্যাসেজের ধারে বিষ্টুসাহেব। খুব বিনীত ভঙ্গিতে অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিল, "কথাটার মানে কী? জ-ফলা না থাকলে বাংলা শোনাত।"

মেজর চুরুট ধরাতে গিয়ে থেমে গেলেন। ওপরে 'নো স্মোকিং' লেখা আছে তখনও। বললেন, "শব্দটা ড্যানিশ। মানে হল ধন্যবাদ। চুরুট ধরাবার আগে আমার সঙ্গে কথা বোলো না।"

প্লেনের ভেতরটা বিশাল। সামনের দিকটায় বোধহয় বেশি দামের টিকিট। সুন্দরী এয়ারহোস্টেসরা সবাই বোধহয় আমেরিকান। প্লেনটা তো ওই

দেশের। কোনও আসল খালি নেই। এত লোক প্রতিদিন বিদেশে যায়? ভোর হচ্ছিল বাইরে। জানলা দিয়ে অন্ধকার মুছতে দেখল অর্জুন। নীচে, অনেক নীচে ভারতবর্ষ পড়ে রয়েছে। আকাশের কি কোনও নাম আছে? কিন্তু কী আশ্চর্য! প্লেনটা ঘণ্টাখানেক বাদে যখন করাচিতে থামল, তখন অন্ধকার যায়-যায়। এতক্ষণে তো রোদ ওঠার কথা। মাইকে স্থানীয় সময় যা বলল, তা ভারতীয় ঘড়ির সঙ্গে মিলছে না। অর্জুনের খুব মজা লাগছিল। তারা বোধহয় সূর্যকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে গেলে কখনওই কি ভোর হবে। জানলা দিয়ে এয়ারপোর্টটাকে দেখল অর্জুন। এই হল পাকিস্তান। মানুষজন যারা উঠল, ঘরবাড়ি যা দেখা গেল, ভারতবর্ষের সঙ্গে তো কোনও পার্থক্যই ধরা পড়ছে না।

মেজরের রাগ যে তখনও কমেনি টের পাওয়া গেল, যখন এয়ারহোস্টেস এসে ব্রেকফার্স্ট সার্ভ করে গেলেন। মেজর চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, NOH HUEVOS FRITOS।' এয়ারহোস্টেস চোখ বড় করে হাসলেন। তারপর ট্রলির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "MWEE BYEN, TORTA?" মেজর ঘাড় নাড়তে তাঁর প্লেটে একটি কেক পড়ল। আরও কিছুক্ষণ সেই অবোধ্য বাক্যবিনিময় করে এয়ারহোস্টেস এগিয়ে গেলেন। অর্জুন লক্ষ করল মেজরের মুখে প্রশান্তি ফিরে এসেছে। বিষ্টুসাহেব খাবার মুখে নিয়ে অর্জুনকে বললেন, "ইতালিয়ান! কেকের ইতালিয়ান কী বলব?"

"কে বলেছে ওটা ইটালিয়ান?" শব্দটা এত জোরে মুখ থেকে বের হল যে, বেশ কয়েকটা খাবারের টুকরো তার সঙ্গী হল। কাগজের রুমালে নিজের শরীর যে পরিষ্কার করছেন বিষ্টুসাহেব, তা অর্জুন দেখল, কিন্তু লক্ষই করলেন না মেজর। এক নিশ্বাসে বলে যাচ্ছেন, "না জেনে মন্তব্য করা আমি দু'চক্ষে পছন্দ করি না। এই মেয়েটাকে দেখে মনে হল ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে বাড়ি। আমি স্প্যানিশে বললাম ডিমভাজা খাব না। ওখানকার মানুষ স্প্যানিশ একটু-আধটু জানে। তা আমায় বলল, কেক খাও। আর আপনি বলছেন ওটা ইতালিয়ান?"

বিষ্টুসাহেব নীরবে প্লেট পরিষ্কার করলেন। দিল্লিতে আসার পর থেকেই ওঁর শরীর যেন চনমনে হয়ে উঠছিল। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কেক শব্দটির স্প্যানিশ কী?"

মেজর বললেন, "TORTA।"

পাশ দিয়ে একজন এয়ারহোস্টেস ফিরছিলেন, বিষ্টুসাহেব তাঁর দিকে একটা আঙুল তুলে বললেন, "TORTA!,,

লাইটার-রহস্যের অর্ধেক সমাধানের পর থেকে অস্বস্তিটা রয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর কোনও এক কোনায় এখন একটি লাইটার রয়ে গেছে, যা নিয়ে শুধু জাল অথবা চোরাকারবারিরা তৎপর নয়, ওই মারাত্মক ক্ষমতাবান লাইটারটির

pathagar.net

গঠন-কৌশল জেনে গেলে সারা পৃথিবীর পক্ষে বিপদ হতে পারে। একটা নিরীহ দেখতে লাইটারের দ্বিতীয় বোতাম টিপলে অদৃশ্য রশ্মি দশ ফুট বেরিয়ে এসে যে-কোনও মানুষকে অবশ করে ফেলতে পারে। আশেপাশে দাঁড়িয়েও কেউ সেটা বুঝতে পারবে না। ওই বস্তুটির নকল করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এখন পর্যন্ত কিন্তু অদৃশ্য রশ্মির ব্যবস্থা না করতে পেরে ওরা মিনি গ্রেনেড ঢোকাতে পেরেছে ওই ছোট লাইটারের খোলে।

প্রস্তুতকারক জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি খুব বিব্রত। আমেরিকান সরকার তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। কেন দুটো লাইটার সতর্কতা সত্ত্বেও হারিয়ে গেল! একটি বিনষ্ট হয়েছে খবর পেয়েও তাদের স্বস্তি নেই। অর্জুন এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেও কোনও কূল পায়নি। তবে জালিয়াতরা হংকং, থাইল্যান্ড থেকে নেপাল হয়ে তরাই-ভুটান অঞ্চলে যে কাজকর্ম চালাতে চেয়েছিল, তা ওই ঘটনার পর ভেস্তে গিয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর আর কোনও অঞ্চলে যে এই মুহূর্তে কাজ শুরু হয়নি, তা কে বলতে পারে!

প্যান-অ্যাম-এর এই প্লেন এবার থামবে ফ্রাঙ্কফুর্টে। এর মধ্যে দু-দুটো সিনেমা দেখতে পেয়েছে ওরা। দুটোই জেমস বন্ডের ছবি। বিষ্টুসাহেব আর অর্জুনই ছবি দেখল। মেজর নাক ডাকিয়ে ঘুমোলেন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। খুব সুখী মানুষই ওভাবে চটপট নাক ডেকে ঘুমোতে পারে। ফ্রাঙ্কফুর্ট যখন এল তখন স্থানীয় সময় আর ওদের ঘড়ির সময়ে অনেক তফাত। মালপত্র সব প্লেনেই থাকবে, ওদের শুধু কয়েক ঘণ্টার জন্য এয়ারপোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জে থাকতে হবে। কারণ এই সময়ে প্লেনের ঝাড়পোঁছ, তেল ভরার কাজ সেরে নেওয়া হবে।

প্লেনের দরজা দিয়েই এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর দোতলায় চলে এল ওরা লাইন করে। এরকম ব্যবস্থা দমদম কিংবা দিল্লিতে দ্যাখেনি অর্জুন। মাটিতে পা পর্যন্ত দিতে হল না। ওর মনে হল, বৈধ ভিসা ছাড়া যাতে বিদেশিরা ওদের দেশের মাটিতে পা রাখতে না পারে তাই জার্মানরা এই ব্যবস্থা করেছে। যাই হোক, তবু তো সে জার্মানিতে এল। বিষ্টুসাহেব প্রথমেই উচ্চারণ করলেন, "হিটলারের দেশ হে!"

মেজর সঙ্গে-সঙ্গে চটে গেলেন, "NINE, BIT-TUH জার্মান মানেই হিটলার? আশ্চর্য!"

দাড়িতে হাত বুলিয়ে বোধহয় সংযত করলেন তিনি নিজেকে। তারপর গড়গড় করে অন্তত দশ-বারো জন জার্মানের নাম আওড়ে গেলেন। যাঁরা প্রত্যেকেই স্মরণীয় মানুষ। বিষ্টুসাহেব বললেন, "লোকটার কথাই মনে পড়ল আগে, কেন? আশ্চর্য!"

কিন্তু এই জায়গাটা তো পৃথিবীর যে-কোনও দেশের হতে পারে। অন্তত তিন ফার্লং লম্বা ঝকঝকে প্যাসেজের দু'পাশে আলো-ঝলমল দোকান এবং

অফিসঘর। প্রতিটি দোকানের জিনিসপত্র শুল্কবিহীন। অর্জুন বিস্মিত হয়ে শেষ প্রান্তে চলে এল হাঁটতে-হাঁটতে। বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের ট্রানজিট প্যাসেঞ্জাররা প্যাসেজের মাঝে-মাঝে-রাখা চেয়ারে বিশ্রাম নিচ্ছেন। মেজর বললেন, "এখানে আমার এক বন্ধু আছে। আপনারা কেউ যাবেন আমার সঙ্গে?"

বিষ্টুসাহেব মাথা নাড়লেন, "উঁহু। আমি এই চেয়ারে বসে মানুষ দেখব। জার্মানিতে এসে একটাও জার্মান দেখতে পাচ্ছি না! তোমরা বরং ঘুরে এসো।"

অর্জুন মেজরের সঙ্গী হল। মেজর বললেন, "ওরা এই এয়ারপোর্টের বাইরে যেতে দেবে না আমাদের। ভিসা থাকলে দিত। ফ্রাঙ্কফুর্টের বিখ্যাত জিনিস হল এর অপেরা। আমি SACHESENHAUSEN-এ অপেরা দেখেছি। দ্বিতীয় বিখ্যাত বস্তু হল আপেলের তৈরি মদ। ওদের জাতীয় মদ। আহা, অমৃত।" একটি দোকানে ঢুকে মেজর একটা হাত ওপরে তুলে চিৎকার করে বললেন, "GOO-TEN-TAHK!"

টাকমাথা লোকটার মুখ উজ্জ্বল হল। তিনিও হাত তুললেন, "GOO-TEN-THAK! VEE GAYTESS EE-NEN! বলে করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন। মেজর হাতটা ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "ZAYRGOOT!"

শব্দগুলোর একবর্ণ বুঝতে পারছিল না অর্জুন। মেজর আরও কিছুটা শব্দ খরচ করার পর লোকটি অর্জুনের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন, "ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। এত অল্প বয়সে আপনি এত প্রতিভাবান, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গর্বিত হচ্ছি।"

এই সময় আর-একজন খদ্দের দোকানে ঢুকে কাউন্টারে দাঁড়াতে টাকমাথা ভদ্রলোক, "EN-SHOOL-DIGEN-ZEE,, বলে ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। লোকটার পরনে চমৎকার স্যুট, চোখে চশমা, বয়স তিরিশের সামান্য ওপরে। যা নেবেন সেটা জানিয়ে ভদ্রলোক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে অলস ভঙ্গিতে একটা সিগারেট নিয়ে ওদের দিকে তাকালেন। অর্জুন চোখ ফিরিয়ে নিল। টাকমাথা ফিরে এলে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন সিগারেট না ধরিয়ে। এমন হতে পারে তিনি লাইটার কিনতে এসে না পেয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু পাশের টেবিলের ওপর স্তূপ করা দেশলাই রয়েছে। জলপাইগুড়িতে যেসব দেশলাই দেখেছে সেরকম নয়। বাক্সের বদলে পাতার মধ্যে আটকানো কাঠি। লোকটা তো এই একটাতে সিগারেট ধরাতে পারত। মেজর ততক্ষণে বন্ধুর সঙ্গে গল্প শুরু করেছিলেন। অর্জুন চটপট বাইরে বেরিয়ে এল। অন্তত আট-দশটি প্লেনের যাত্রীরা ট্রানজিট লাউঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতিটি মানুষই যথেষ্ট ধনী, অর্জুনের মনে হল, এখানে কোনও

গরিব নেই। অন্তত পোশাক এবং আচরণে। লোকটি হাঁটছিল অত্যন্ত অলস ভঙ্গিতে। তার ডান হাতে সিগারেটটি ধরা, তাতে এখনও আগুন পড়েনি। প্যাসেজের পাশে রাখা চেয়ারগুলিতে অনেকে বসে। তাদের একজন লোকটিকে দেখে উঠে দাঁড়াল। ওর বয়স বেশি। দু'জনেই বিদেশি। দেখে কোন্ দেশের তা অর্জুনের পক্ষে ঠাওর করা সম্ভব নয়। কিন্তু দ্বিতীয় লোকটিকে বোঝা যায়। ওর তাকানো, শরীর বলে দেয় সহজ পথের মানুষ নয়। তা ছাড়া লোকটার কাঁধে বেশ ভারী ব্যাগ ঝুলছে। টুকিটাকি ছাড়া সবাই জিনিসপত্র প্লেনেই রেখে এসেছে। অত বড় ভারী ব্যাগ লোকটি বইছে কেন ?

ওরা কী কথা বলছে তা বোঝা এতদূর থেকে অসম্ভব। দু-তিনজনের ইংরেজি এর মধ্যে কানে এসেছিল, যার উচ্চারণ এমন যে, চেনা শব্দও অচেনা হয়ে যায়। লোক দুটো এখন পাশাপাশি হাঁটছে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে-বলতে। দু'পাশের দোকান বা জনতার দিকে আর মন দিচ্ছে না। অর্জুনের মনে হল, যদি ও লাইটার কিনতে যেত তা হলে না পেয়ে অন্য দোকানে খোঁজ করত। লাইটার ছাড়া অন্য কিছু হলেও তো এইটে সঙ্গত ছিল। কিন্তু সে কেন ওই লোক দুটোকে অনুসরণ করছে ?

অর্জুন দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর মেজরের জন্য পিছন ফিরল। কিন্তু কী আশ্চর্য, সব দোকান যে এক রকম দেখাচ্ছে ! দোকানের গায়ে যে নাম লেখা, তা ইংরেজিতে নয়। প্রতিটি দোকান তন্নতন্ন করে খুঁজে সে সেই দোকান বা মেজরকে দেখতে পেল না। এমনকী বিষ্টুসাহেব যে চেয়ারটায় বসেছিলেন সেটাও নজরে আসছে না। মাইকে কিন্তু অনবরত ঘোষণা করছে, কখন কোন্ প্লেন ছাড়বে। যাত্রীদের সেইভাবে বিভিন্ন এয়ারলাইনসের কাউন্টারের দিকে এগোতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আচমকা অর্জুনের শরীরে যেন বরফের স্পর্শ লাগল। তার পাসপোর্ট-টিকিট বিষ্টুসাহেবের কাছে রাখা। যদি ওরা তাকে না পেয়ে প্লেনে উঠে পড়ে তা হলে সে কী করবে ? ঠিক তখনই নজরে পড়ল বিষ্টুসাহেব টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসছেন।

প্রাণ ফিরে পাওয়ার মতো আনন্দে ছুটে গেল কাছে, "মেজর কোথায় ?"

"তোমরা তো একসঙ্গে গেলে। কেন, সে হারিয়ে গেছে নাকি ?"

"না, আমরা একটু আলাদা হয়ে পড়েছিলাম, তারপর আর খুঁজে পাচ্ছি না।"

"অ। কোথায় আর যাবে ! যে মরুভূমিতে খ্যাঁকশেয়াল খোঁজে, সে ঠিক আমাদের খুঁজে বের করবে। ঠিক আছে ? এদের টয়লেটে গেছ ? মাথা ঘুরে যায়। কী আধুনিক কায়দা। এসো, এখানে বসি। আমি তখন থেকে বিখ্যাত জার্মানদের নাম ভেবে যাচ্ছি। কিন্তু হিটলার এমন জায়গা দখল করে বসে আছেন যে, হিমলার-টিমলার ছাড়া আর কারও নাম মনে পড়ছে না। তুমি দু-একটা নাম মনে করিয়ে দাও তো।" বিষ্টুসাহেব চোখ বন্ধ করলেন।

অর্জুন হাসল, "বেকেনবাওয়ার, বিখ্যাত ফুটবলার ! ম্যাক্সমুলার।"

"হ্যাঁ, হাঁ, হ্যাঁ !" ঘনঘন মাথা নাড়লেন বিষ্টুসাহেব। "ঠিক আছে হিটলার মরে গেছেন, এখন আমার মাথায় সব বিখ্যাত দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীরা এসে গেছেন ! সোপেনহাওয়ারের নাম শুনেছ ? দার্শনিক !" যেন হৃতরাজ্য ফিরে পেয়েছেন এমন ভঙ্গি করলেন বিষ্টুসাহেব।

ঠিক তখনই মেজরকে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে, "GEN-RAH-DEH-OUS ! প্যান-অ্যাম থেকে প্যাসেঞ্জারদের ডাকছে আর আপনারা এখানে গপ্পো করছেন ! প্লেন চলে যাবে আপনাদের ফেলে। চলুন, চলুন। আর তুমি ! আমাকে না বলে তুমি চলে এলে ?"

প্রায় তাড়িয়ে মেজর নিয়ে এলেন প্যান-অ্যাম এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে। সেখানে তখন লাইন পড়ে গেছে। হঠাৎ বিষ্টুসাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমার ওষুধের কৌটো !"

মেজর হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ওষুধ ?"

"হার্টের। ডাক্তার বলেছিল সব সময় সঙ্গে রাখতে। আমি কৌটোয় রেখেছিলাম।"

"আর নেই সঙ্গে ? কী ওষুধ নাম বলুন, পাশেই মেডিসিন শপ। চটপট।"

"কিন্তু, কিন্তু...। ওই কৌটোর তলায় হিরের আংটি রেখেছি।"

"হিরের আংটি ?" মেজরের দাড়িগুলো যেন ঝুলে পড়ল।

"শুনেছিলাম কাস্টমস খুব চেক করে। যদি আঙুলে থাকলে না নিতে দেয় তাই ওষুধের কৌটোয় রেখে দিয়েছিলাম। প্রথম আমেরিকায় যাচ্ছি। ভাগ্নিকে দেব বলে !" প্রায় কেঁদে ফেললেন ভদ্রলোক, "অনেক দাম, অনেক। কোথায় ফেলেছি !"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি এখানে আসার সময় পকেটে রেখেছিলেন ?"

"ইয়েস। আমি চেয়ারে বসে দেখেছি কৌটোটা। রিয়েল ডায়মন্ড। ঠিক আছে !"

সঙ্গে-সঙ্গে মেজর ছুটলেন বিষ্টুসাহেব যেখানে চেয়ারে বসে ছিলেন সেখানে। অর্জুন যে রাস্তায় ওরা হেঁটে এসেছিল সেটা দেখতে লাগল। আর বিষ্টুসাহেব কাঁদো-কাঁদো ভঙ্গিতে একটি জার্মান পুলিশকে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলেন। অনেক স্মৃতি-বিজড়িত আংটি। খুঁজতে খুঁজতে অর্জুন অনেকটা চলে এল। এত মানুষ হাঁটাচলা করছে, পায়ের তলায় ছোট ওষুধের কৌটো দেখলে নিশ্চয় কেউ পকেটে পুরবে না। কিন্তু যাবে কোথায় ? বিষ্টুসাহেব পুলিশকে কী বলছেন তিনি জানেন, কিন্তু পুলিশ যদি জিজ্ঞেস করে হিরের আংটি কেন তিনি ওভাবে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা হলে উত্তরটা কি বিশ্বাসযোগ্য হবে ?

মিনিট দশেক কেটে গেল, তবু কৌটোর হদিস পেল না অর্জুন। শেষে হতাশ হয়ে যখন ফিরছে, তখন টয়লেট-সাইনটা নজরে পড়ল। মুখ ধুতে গিয়ে ওখানে ফেলে আসেননি তো। অর্জুন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। দারুণ ঝকঝকে আধুনিক টয়লেট। অর্জুন মেঝেতে নজর বুলিয়ে কিছু পেল না। শেষ লোকটি বেরিয়ে গেলে সে ফিরতেই ব্যাগটাকে দেখতে পেল। একটা ভারী ব্যাগ টুপি রাখার স্ট্যান্ডে ঝুলছে। নিশ্চয়ই কেউ ভুল করে এটাকে ফেলে গিয়েছে। কাছাকাছি হতেই সে চমকে উঠল। এটাকে সে সিগারেট না জ্বালানো লোকটার নিষ্ঠুর দেখতে সঙ্গীটির সঙ্গে দেখেছিল। হ্যাঁ, অবিকল এই ব্যাগ। কিন্তু সেই লোকটা তো ভুলে ফেলে যাওয়ার পাত্র নয়। অর্জুন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা তুলে নিয়ে পাশের খোলা ল্যাট্রিনের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

দ্রুত হাতে ব্যাগটা খুলে তেমন কিছু সন্দেহজনক জিনিস দেখতে পেল না অর্জুন। কয়েকটা ছেঁড়া মোজা, ভারী মোটা-মোটা অঙ্কের বই, তোয়ালে, এইসব। অর্জুন হতাশ হয়ে দরজাটা খুলতেই চমকে উঠল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে রোগামতন একটা জার্মান, যার নাকের ওপর সরু ফ্রেমের স্টেনলেশ স্টিলের চশমা। অর্জুন বেরিয়ে আসা মাত্র লোকটি বলল, "GOO-TEN-TAHK."

অর্জুনের ভেতরটা কেঁপে উঠল। সে কাঁপা গলাতেই ইংরেজিতে বলল, "আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।" লোকটি হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে দরজাটা ধরে ভেতরে ঢুকে গিয়ে সেটাকে বন্ধ করল। প্রচণ্ড দুর্বল মনে হচ্ছিল শরীরটা। লোকটার প্রয়োজন বেড়ে গিয়েছিল এবং সবক'টা ল্যাট্রিনে লোক থাকায় সে বিব্রত ছিল এটা বুঝতে সময় লাগল। তারপর ঝটপট ব্যাগটাকে হ্যাট-র‍্যাকে ঝুলিয়ে দিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল।

মেজর অর্জুনকে দেখে বললেন, "পাওয়া গিয়েছে। চল, আমাদের ডাক এসে গিয়েছে।"

"পাওয়া গিয়েছে ? কী করে পাওয়া গেল ?" অর্জুন অনেকক্ষণ পরে খুশি হল।

"ওঁর কোটের ভেতরের পকেটেই ছিল।"

"যা বাব্বা !" অর্জুন বিষ্টুসাহেবের দিকে তাকাল। তিনি তখন অত্যন্ত মন দিয়ে একটি কাগজ পড়ছেন। এইসব কথাবার্তা যেন ওঁর কানেই যাচ্ছে না।

প্লেনে বসে এবার অর্জুন ঘড়ির দিকে তাকাল। যত তারা এগোচ্ছে, তত পাল্লা দিয়ে ঘড়ির কাঁটা পালটাতে হচ্ছে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াবে যে, ভারতবর্ষ ছাড়ার তারিখটা বাইশ ঘণ্টা পরেও আমেরিকায় পৌঁছে একই থেকে যাবে। বিষ্টুসাহেব এখনও কাগজ পড়ছেন। বোধহয় কৌটোটা ভুল পকেটে রেখে হইচই বাধাবার জন্য বেশ লজ্জিত হয়ে পড়েছেন। হঠাৎ কোমরে একটা খোঁচা

খেল অর্জুন। পাশে তাকাতেই দেখল বিষ্টুসাহেব খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে খবরের কাগজের একটা অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। ইংরেজি কাগজটার শেষ পাতায় বক্স করে ছাপা হয়েছে, 'জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি জানাচ্ছে যে, তাদের চুরি যাওয়া একটি লাইটার যে খুঁজে দেবে বা হদিস কিংবা সূত্র জানাবে তাকে দশ হাজার আমেরিকান ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। আমেরিকান এই কোম্পানিটির হারানো লাইটারটি মানবসভ্যতার ক্ষতি করতে পারে। সম্প্রতি হামবুর্গ শহরের গ্রোসে ফ্রেইহিট স্ট্রিটের 'দি ট্যাবু' ক্লাবে, জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির হারানো লাইটারটির একটি নকল পাওয়া গিয়েছে। প্রথম বোতামটি সক্রিয় ছিল কিন্তু দ্বিতীয় বোতাম কার্যকর ছিল না। অনুমান করা হচ্ছে, এই অঞ্চলে ওই জাল-কারবারিদের আনাগোনা হচ্ছে। প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, একযন তরুণ ভারতীয় গোয়েন্দা হারানো লাইটারের জুড়িটিকে ধ্বংস করেছেন।'

মেজর বিরক্ত হচ্ছিলেন খবরের কাগজ নিয়ে এই ধরনের উত্তেজনায়। বিষ্টুসাহেব বললেন, "ওদের তোমার নাম দেওয়া উচিত ছিল। আমি প্রতিবাদপত্র লিখব। ঠিক আছে?"

সেই সময় চোখ তুলতেই অর্জুন অবাক হল। সেই লোক দুটো ঢুকছে। বোর্ডিং কার্ড হাতে নিয়ে সিট নাম্বার খুঁজতে-খুঁজতে ওদের পেরিয়ে চলে গেল। সেই গুণ্ডামতন লোকটার হাতে এখন ব্যাগ নেই। আর সুবেশ মানুষটির হাতে সিগারেট একইভাবে না ধরিয়ে রাখা আছে।

কোনও প্রত্যক্ষ অবলম্বন নেই, কিন্তু অর্জুনের উত্তেজনা বাড়ছিল। একটা লোক অযথা কেন ঘণ্টাখানেক সিগারেট না ধরিয়ে আঙুলের ফাঁকে রেখে দেবে? সঙ্গী লোকটার ব্যাগে কেন শুধু ছেঁড়া মোজা, অঙ্কের বই থাকবে এবং সেগুলোকে টয়লেটে ফেলে আসবে? নিশ্চয়ই আরও কিছু ছিল ব্যাগটায়। কী ছিল? ব্যাগটাকে ওভাবে ফেলে এল কেন? যে জিনিস সঙ্গে ছিল তা কি ব্যাগে রাখা আর নিরাপদ ছিল না?

এইসময় ঘোষণাটা করে প্লেন ছেড়ে দিল। সিটবেল্ট বেঁধে অর্জুন পেছন ফিরে তাকাল। সুবেশ ভদ্রলোকের শরীর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তাঁর সঙ্গীর একটা হাত নজরে এল। কোটের বাইরে আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ। ভঙ্গিটাই বলে দেয় প্রচণ্ড শক্তি ধরে লোকটা। এবার ওরা বসেছে সেই এলাকায় যেখানে সিগারেট খাওয়া চলে না। ব্যাপারটা বিষ্টুসাহেব করেছেন, বোর্ডিং কার্ড নেবার সময় বলেছেন, 'নো স্মোকিং।' আর সেইটাই খেপিয়ে দিয়েছে মেজরকে। তিনি এখন সারাটা পথ চেয়ারে বসে চুরুট খেতে পারবেন না।

আকাশে প্লেন স্বাভাবিক হয়ে এল। মেজর উঠলেন। তার বিরাট শরীরটা বিষ্টুসাহেব এবং অর্জুনকে অতিক্রম করে পেছনের দিকে চলে গেল। উড়ন্ত প্লেন এবং রানিং ট্রেনে হাঁটার সময় একই অনুভূতি। অর্জুন কিছুক্ষণ অপেক্ষা

করল। তারপর সে-ও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। এয়ার হোস্টেসরা খাবারদাবারের ব্যবস্থা করছে। সুবেশ ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। ওঁর পাশের লোকটি অর্জুনের দিকে চলে গেল। একবার তাকাল, তারপর দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাল। শেষ প্রান্তে চলে এসে মেজরকে দেখতে পেল অর্জুন। এক হাতে একটা পানীয়ের গ্লাস নিয়ে চুরুট খাচ্ছেন। অর্জুনকে দেখে বললেন, "অদ্ভুত ! আগবাড়িয়ে নো স্মোকিং বলার কী দরকার ছিল। এখন খাও এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আমি নিউইয়র্কে পৌঁছেই কেটে পড়ছি।"

"কোথায় যাবেন ?"

"আমার ফ্ল্যাটে। ম্যানহাটনে আমার নিজের ফ্ল্যাট আছে। উনি থাকবেন ওঁর বোনের বাড়িতে। এরকম লোক আমি দেখিনি, সবকিছু জেনে বসে আছেন। অসুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে থাকলেই তো চলত। সারা এয়ারপোর্ট চষেছি ওঁর কৌটোর জন্য, জানো ?" মেজর এক চুমুকে পানীয়টা শেষ করে চুরুটে টান দিলেন।

অর্জুন বলল, "বিষ্টুসাহেব কিন্তু ভালমানুষ। বয়স হয়েছে বলে ভুল হয়।"

মেজর বললেন, "সেটা আমাকে বলতে হবে না। ভাল মানুষ না হলে আমি সঙ্গী হতাম ? তুমি তো সিগারেট খেতে এসেছ, ধরাও, আরে, আমি কিছু মনে করব না।"

অর্জুন দ্রুত মাথা নাড়ল, "না, না। আমি আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম।"

মেজর খুব খুশি হলেন, "গুড। তুমি ছেলেটা ভাল। আমার কোনও সাহায্য প্রয়োজন হলে বলবে।"

অর্জুন বলল, "আপনি তো বলেছেন আমরা দু'জনেই সত্য খুঁজছি। তবে দু'রকমের মাধ্যমে। এই দ্বিতীয় লাইটারটা খোঁজার ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।"

"গ্র্যান্টেড। লাইটারটা এখন কার কাছে আছে ?' মেজর ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন।

হেসে ফেলল অর্জুন, "সেটাই তো সবাই জানতে চাইছে। আমিও জানি না।"

ওপর থেকে মনে হচ্ছিল একেই বোধহয় বলে হিরের মালা। কেনেডি এয়ারপোর্টের আলো নিউইয়র্ক শহরকে রহস্যময়ী করে তুলেছিল। বিষ্টুসাহেব আপ্লুত হয়ে বললেন, "অনবদ্য। দারুণ দৃশ্য, তাই না ?"

প্লেন থেকে নেমে প্রথমেই অর্জুনের মনে হল সে আমেরিকায়। ঠাণ্ডা তো তেমন নেই। তারপরে খেয়াল হল তারা প্লেনের পেট থেকে সোজা চলে এসেছে এয়ারকন্ডিশন্ড বিল্ডিং-এর ভেতরে। বাইরের ঠাণ্ডা এখানে ঢুকবে

কেন ? কিন্তু এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের ভেতরে এসে মনে হচ্ছে যেন খুব বড় কোনও শহরে ঢুকে পড়েছে। এত ব্যস্ততা, কিন্তু তাড়াহুড়ো নেই, চিৎকার নেই। অর্জুন লক্ষ করছিল সেই দুটো লোককে। ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমসের বাধা ডিঙিয়ে ওরা তাদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল। এখন সুবেশ লোকটির হাতে সিগারেট নেই। প্লেনের ক্যারিয়ারে রাখা মালপত্রের জন্য সবাই যখন অপেক্ষা করছিল, তখনই ওদের দুটো স্যুটকেস এসেছিল। সুবেশ লোকটা যে সুটকেসটি ধরেছিল তার ওপর লেখা আছে, ১৫-৩২, রাস্তা তিরিশ, ম্যানহাটন।

বিষ্টুসাহেবের বোন এবং ভগ্নীপতি এসেছিলেন এয়ারপোর্টে। দাদাকে পেয়ে স্বভাবতই খুব খুশি। তাঁরা এবং বিষ্টুসাহেব চাইছিলেন অর্জুন ওঁদের ওখানে উঠুক। কিন্তু প্রত্যেকের অনুরোধ নস্যাৎ করে দিলেন মেজর, "না, না। এখন থেকে আমাদের একসঙ্গে অনেক কাজ করতে হবে। তোমাদের ওখানে মাঝে-মাঝে দেখা করতে যাব।"

আলাদা গাড়িতে ওঠার আগে বিষ্টুসাহেব বললেন, "শরীরটা একটু সারিয়ে তুলি। তারপর তোমার সঙ্গে যাব। অভিযান-টভিযান হলে আমাকে বাদ দিও না। ঠিক আছে ?"

মেজর ট্যাক্সি নিলেন না। বললেন, "ট্যাক্সিতে ওঠা মানে গলা বাড়িয়ে দেওয়া। ডলার যাবে একগাদা। তার চেয়ে বাসে উঠি এসো।"

বাইরে কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা। অর্জুনের খুব শীত করছিল। একটা পুরো-হাতা সোয়েটারে শীত আটকাচ্ছে না। সঙ্গের মালপত্র বেশি না থাকায় বাসে আপত্তি করল না কেউ। ঢোকার সময় নব্বুই সেন্ট জমা দিয়ে ঢুকতে হয়। মেজরই দু'জনেরটা দিয়ে দিলেন। সন্ধে হয়েছে, রাত্রের নিউইয়র্ক দেখতে জানলার বাইরে তাকাচ্ছিল সে। মেজর বললেন, "নো, নো, এটা নিউইয়র্ক নয়। কেনেডি শহর থেকে অনেক দূরে।"

বাসে সাদা-কালো দুই ধরনের মানুষ আছে। প্রত্যেকের অঙ্গে ভাল শীতবস্ত্র। হঠাৎ নিজেকে খুব গরিব-গরিব বলে মনে হচ্ছিল। বাইরে তাকিয়ে অর্জুন শুধু বুঝতে পারল তারা দারুণ ঝকমকে একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। বাস যেখানে শেষ করল সেই জায়গাটার নাম টাইম স্কোয়ার। অর্জুনের মনে হল যেন দেওয়ালির উৎসব হচ্ছে চারধারে। এত আলো, এত সাজগোজ যে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মেজরের সঙ্গে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল ঠাণ্ডা সত্ত্বেও। ম্যানহাটনে ওঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছতে সময় লাগল বেশ, তবু।

নিয়মটা অদ্ভুত। মোটা কাঠের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে যে ফ্ল্যাটে যেতে চাও, সেই ফ্ল্যাটের নম্বরে টেলিফোন করলে তারা যাচাই করবে তুমি কে। পছন্দ হলে সেখান থেকে বোতাম টিপলে ও-পাশের দরজাটা খুলে যাবে। সেইটে দিয়ে ভেতরে ঢোকার পর লিফ্‌ট পাবে। চাবি ছাড়া এবং অনুমতি না পেলে দ্বিতীয় দরজা খুলবে না। নিজের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে মেজর ঘোষণা

করলেন, "এখন থেকে এটাকে নিজের বলেই ভাববে। ও-পাশের দুটো বিছানার যে-কোনও একটায় তুমি শুতে পারো। ওখানে কিচেন আছে। কিছু খাবার আমি যাওয়ার সময় রেখে গিয়েছিলাম, নষ্ট হবার কথা নয়। কাল বাজার করব। আর এই নাও নিউইয়র্কের ম্যাপ। আমি এখানে আছি। এই স্পটটায়। বাড়ির নম্বর, টেলিফোনের নম্বর লিখে নেবে। ও. কে.।"

বলতে বলতেই টেলিফোন বাজল। অর্জুন একটা সোফায় আরাম করে বসল। প্লেনে যা খাইয়েছে, আর খিদের প্রশ্ন নেই। ঘরটায় বেশ গরম আছে। মেজর তখন টেলিফোনে কথা বলছিলেন, 'GOO DAH, HOOR STORE DET TILL ? TAHK BRAH ?' এটা কোন ভাষা বুঝতে পারল না অর্জুন। কিছুক্ষণ পরে মেজর ফিরে এসে বললেন, "আমার এক সুইডিশ বন্ধু ফোন করেছিল। রাশিয়ান রকেটের বিস্ফোরণ সুইডেনে খুব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। জলের তলায় একটা নীল রঙের শ্যাওলা হচ্ছে। ও সেই শ্যাওলা দেখতে যাচ্ছে। আমার চুরুট !" মেজর আচমকা পকেটে হাত দিলেন। এ-পকেট সে-পকেট খোঁজার পর নিজের ব্যাগ হাতড়ালেন, "যাঃ, আমার চুরুটের প্যাকেটটা কোথায় ফেলে এসেছি। তুমি বোসো, আমি চুরুট কিনে আনি।"

এই ভরসন্ধেবেলায় অর্জুনের একা এখানে বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। সে সঙ্গ নিতে চাইলে মেজর আপত্তি করলেন না। কিন্তু একটা চোখ ছোট করে অর্জুনকে দেখে সোজা ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন একটা অপেক্ষাকৃত ছোট জ্যাকেট হাতে নিয়ে। কিন্তু সেটা অর্জুনের কাছে আলখাল্লার মতো লাগছিল। ওই বেঢপ জিনিসটা বাধ্য হয়ে পরতে হল মেজরকে খুশি করার জন্য। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে যে আরাম হল, তাতে মনে মনে মেজরকে ধন্যবাদ জানাল অর্জুন।

জায়গাটার নাম ম্যানহাটন। দু'পাশে উঁচু-উঁচু বাড়ি, দোকানপাট কম, সন্ধে পার হওয়ায় লোকজনও দেখা যাচ্ছে না। অর্জুনের চট করে স্যুটকেসের ওপরে দেখা ঠিকানাটার কথা মনে পড়ল। সে মেজরকে জিজ্ঞেস করতে মেজর বললেন, "মিনিট দশেকের হাঁটা। কে থাকে সেখানে ?"

"একবার সেই বাড়িটার সামনে যেতে পারি ?"

"তুমি হাঁটতে পারলে আমার আপত্তি কী ! আহা, এই দোকানটা বন্ধ কেন ?"

মেজর চুরুটের দোকান খুঁজতে-খুঁজতে হাঁটছিলেন। এদিকের রাস্তায় মানুষজন কম কেন ! ফুটপাথে কি বেশি লোক হাঁটে না ! অথচ গাড়ি যাচ্ছে স্রোতের মতো।

অনেকগুলো ব্লক পেরিয়ে মেজর বললেন, "এটাই থার্টিয়েথ স্ট্রিট। কত নম্বর বললে ?"

pathagar.net

"ফিফটিন—থার্টিটু।"

আর একটু হাঁটার পর মেজর একটা পাঁচতলা বাড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী নাম?"

অর্জুন বলল, "নাম জানি না।"

"মানে?" অবাক হলেন মেজর।

"নামটাই তো খুঁজে বের করতে হবে।"

সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠলেন মেজর, "আই সি, আই সি। এক্সপিডিশন!"

ওরা দাঁড়িয়ে ছিল বাড়িটার উলটো ফুটপাথে। বিভিন্ন ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। লোকটা নিশ্চয়ই এখন ওখানে পৌঁছে গিয়েছে। তার সঙ্গী কোথায় কে জানে! কিন্তু কোন্ ফ্ল্যাটটায় লোকটা থাকে, সেটাই বের করতে হবে। এইসময় মেজর একটা চুরুটের দোকান আবিষ্কার করে ফেললেন। তাঁকে খুব খুশি দেখাচ্ছিল। চুরুট কেনার পর মেজর বললেন, "আমি বড্ড লোভী হয়ে গেছি। নিজেকে শাস্তি দিতে অন্তত আধঘণ্টা চুরুট ধরাব না। চলো না, ওই বাড়ির ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে গিয়ে খোঁজ নিই!"

"কী খোঁজ দেবেন?"

"তাও তো বটে। বাড়ির নাম্বার জানো, কিন্তু লোকের নাম জান না। অথচ দশটা ফ্ল্যাট হবে এখানে। লোকটাকে চেনো তো?"

"চিনি।"

"তা হলে দাঁড়িয়ে থাক। একসময় না একসময় বের হবেই।" মেজর ওপাশে তাকালেন, সেখানে একটা দোকানের ওপর দাবার বোর্ডের সাইনবোর্ড, "আঃ, দারুণ। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে লক্ষ করে যাও, আমি ততক্ষণ একহাত খেলে আসি।"

"কী খেলবেন?" অর্জুন অবাক।

"দাবা। একটা গেম জিতলে দশ ডলার, হারলেও তাই দিতে হবে। তবে এ-শর্মা কখনও রিস্ক নেয় না, অভিযান ছাড়া।" মেজর আর দাঁড়ালেন না। ঠাণ্ডা এড়াতে অর্জুন একটা ছাউনির তলায় এসে দাঁড়াল। এত রাতে অতটা পথ উড়ে এসে লোকটা নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে বের হবে না। এখনও কোনও সন্দেহজনক কাজ লোকটা করেনি, কিন্তু ওর সঙ্গী করেছে। ব্যাগটাকে ফ্রাঙ্কফুর্টের টয়লেটে ফেলে এল কেন? হয়তো পুরোটাই অন্ধকারে হাতড়ানো, তবু অর্জুনের মন মানছিল না। মিনিট পনেরো যাওয়ার পর অর্জুন রাস্তাটা পেরিয়ে বাড়িটার সামনে এল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই প্যাসেজ পেরিয়ে লিফট। তার গায়েই একটা বোর্ডে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অধিবাসীদের নাম লেখা। তা দেখে তো কিছু বোঝা মুশকিল। অর্জুন রাস্তায় বেরিয়ে দাবা খেলার দোকানে চলে এল। মেজর ততক্ষণে বিশ ডলার হেরেছেন।

জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানিতে অর্জুনের যে অভ্যর্থনা হল, তা কল্পনার

বাইরে। স্বয়ং কোম্পানির চেয়ারম্যানের পি. এ. এসেছিল মেজরের ফোন পেয়ে গাড়ি নিয়ে। মোটামুটি ভদ্র পোশাকে মেজরকে সঙ্গে নিয়ে সেই গাড়িতে চেপে অর্জুন গিয়েছিল পরের দিন সকালে জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এ। কোম্পানির চেয়ারম্যান বৃদ্ধ মানুষ। তিনি পরের দিন বারংবার ওকে ধন্যবাদ দিলেন প্রথম লাইটারটি খুঁজে বের করার জন্য। তিনি অনুযোগ করলেন কেন অর্জুন তাঁদের জানাল না, কোন ফ্লাইটে সে আসছে। অর্জুনের আমেরিকায় থাকা-খাওয়া এবং সমস্ত রকম খরচ ছাড়া কিছু পুরস্কারের প্রস্তাব দিলেন তিনি।

মেজর জানালেন, অর্জুন তাঁর অতিথি। এখন দ্বিতীয় লাইটারটা খুঁজতে তাঁরা ব্যস্ত। আমেরিকাতে অর্জুন তাই তাঁর কাছেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হল এইরকম, যখনই যা দরকার হবে, তা অর্জুন মিস্টার স্মিথ বলে এক ভদ্রলোককে জানাবে। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে তার ব্যবস্থা করবেন। চেয়ারম্যান আরও জানালেন, ফেডারেল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশন তাঁকে জানিয়েছেন যে, নকল লাইটারের কারবারিরা আপাতত তাঁদের কার্যকলাপ বন্ধ রেখেছে। কিন্তু যতক্ষণ না দ্বিতীয় লাইটারটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ কোম্পানি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

জোন্স অ্যান্ড জোন্স থেকে বের হতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল। মেজর ওকে নিয়ে ঢুকলেন ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানির রেস্তোরাঁয়। অল্প দামে ভাল খাবার দেওয়ার জন্য এই কোম্পানি প্রতিটি শহরে এইরকম অনেক দোকান করেছে। মেজর কাউন্টার থেকে খাবার আনতে গেলে অর্জুন রাস্তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল। কাল থেকে একটা ব্যাপার সে এখানে তেমন দেখতেই পাচ্ছে না। আমেরিকার লোকেরা কি সিগারেট খায় না? একটা মানুষও চোখে পড়ছে না, যার হাতে সিগারেট আছে। একমাত্র মেজর ছাড়া চুরুট খাচ্ছেন এমন কেউ সামনে আসেনি। তা ছাড়া মেজর চুরুট কিনেছিলেন একটা পেট্রল পাম্প থেকে। তারাই সিগারেট চুরুট বিক্রি করে।

অর্জুন রাস্তাটা দেখল। কারও মুখ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে না। অথচ এদেশের কোম্পানি লাইটার তৈরি করেছিল বাজারে চালু করতে। চেয়ারম্যান বললেন, সেটা বিক্রি হয়েছিল যারা আত্মরক্ষা করতে অস্ত্র চায় তাদের উদ্দেশে। রিভলভারের বদলে লাইটার। কিন্তু লাইটারটার প্রথম কাজ তো সিগারেট ধরানো। প্লেনে একটা বুলেটিনে সে পড়েছে, আমেরিকায় অন্যান্য চাষের মাত্র শতকরা ছ'ভাগ তামাক চাষ হয়।

খাবার নিয়ে উলটো দিকের টেবিলে এসে বসলেন মেজর, "এদের মিল্কশেকটা দারুণ। হ্যাঁ, নিউইয়র্ক নিশ্চয়ই ঘুরে দেখতে চাও। স্ট্যাচু অভ্ লিবার্টি? অ্যাঁ! এখনই না? বেশ, বেশ, যখন ইচ্ছে হবে, বলবে। আচ্ছা আমরা এখন কী করব? অ্যাডড্রেস দিয়ে তো কোনও লাভ হবে না। ফ্ল্যাট নাম্বার জানি না, মানুষটার নাম জানি না। মুশকিল। তোমাদের বিষ্টুসাহেবের

সঙ্গে দেখা করতে যাবে নাকি ?" কথাগুলো বলতে বলতেই মেজর তাঁর নিজের প্লেট শেষ করে ফেলেছেন। অর্জুনের মনে হচ্ছিল, মেজর ওরকম শ'খানেক প্লেট অবলীলায় শেষ করতে পারেন। অথচ খাবারগুলো এত ভারী অথচ সুস্বাদু যে, অর্জুনের মনে হচ্ছিল বিকেল পর্যন্ত খেতে হবে না। সে জবাব দিল, "বিষ্টুসাহেবের বাড়িতে না হয় বিকেলে যাব। কিন্তু আমি আর একবার ওই বাড়িটার সামনে যেতে চাই।"

মেজর কাঁধ নাচালেন। তারপর মুখ ফিরিয়েই চিৎকার করে উঠলেন, "হা-ই ! চার্লি !"

ওপাশ থেকে একটি রোগা নিরীহ দেখতে নিগ্রো এগিয়ে এল সাদা দাঁত বের করে, "হা-ই ! মেজর !" অর্জুন অবাক হয়ে গেল। কোনও নিগ্রো এত রোগা হতে পারে তা তার ধারণায় ছিল না। লোকটা কথা বলছে খুব শান্ত ভঙ্গিতে। বোধহয় মেজরের অনেকদিনের পুরনো বন্ধু। কিন্তু পোশাক দেখে মোটেই মনে হয় না খুব আরামে আছে লোকটা। মেজর নিগ্রোটির কোমরে হাত রেখে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে অর্জুনের দিকে তাকালেন, "এই হচ্ছে চার্লস। আমার সঙ্গে মেক্সিকো-এক্সপিডিশনে গিয়েছিল। দারুণ চোর।"

শেষ শব্দটাকে হকচকিয়ে গেল অর্জুন। মেজর কিন্তু একই গলায় অর্জুনের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন চার্লিকে। সেটা শেষ হলে চার্লি অর্জুনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একগাল হেসে বলল, "গ্লাদ টু মিট ইউ।" অর্জুন মেজরকে বাংলায় জিজ্ঞেস করল, "উনি কী করেন বলছিলেন ?"

"এখন কিছু করে না বলল। তবে ওর চুরির খুব নাম-যশ আছে। এগারোবার জেল খেটেছে। হ্যাঁ, সিরিয়াসলি ! তারপরে হেনরি ডিমক ওকে আমাদের অভিযাত্রী সঙ্ঘে ঢোকায়। ওহো, হেনরি এখন শহরে নেই, নইলে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম।"

আমেরিকায় এসে অর্জুন এই প্রথম একজন চোর দেখল, যে দাঁত বের করে সরল হাসে, কিন্তু এই লোকটির সঙ্গে মেজরের যা ভাব দেখা যাচ্ছে সেটা শুধুই চোর হলে হত না। চার্লি অর্জুনকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমেরিকায় বেড়াতে এসেছ, খুব ভাল কথা, এখানকার মানুষের সঙ্গে আলাপ কর। স্ট্যাচুর চেয়ে মানুষ অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং।"

খুব ভাল লাগল কথাটা। অর্জুন সরাসরি এবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি চুরি কর ?"

"করতাম। হোয়াইট হাউস থেকে বাজি রেখে অ্যাশ্‌ট্রে চুরি করেছিলাম একসময়। এই নিয়ে জ্ঞান দিতে এসো না। আমার ভাল লাগেনা।" উদাসীন গলায় বলল চার্লি।

pathagar.net

থার্টিয়েথ স্ট্রিটে পৌঁছে মেজর যথারীতি দাবা খেলতে গেলেন। বিভিন্ন

টেবিলে দাবার বোর্ড নিয়ে লোক বসে আছে। এর আগের দিন হেরে যাওয়ার বদলা নিতে বসে গেলেন মেজর। তিনি চলে গেলে একটা চুরুটের প্যাকেট বের করল চার্লি। বলল, "স্মোকিং খুব খারাপ অভ্যেস। মেজরকে পরে ফেরত দিয়ে দিও। ওরকম নাইস জেন্টলম্যান, শুধু-শুধু শরীর খারাপ করবে কেন?"

অর্জুন অবাক হয়ে গেল। মেজরের পকেট থেকে কখন হাতসাফাই করল চার্লি। দাবা খেলতে-খেলতে চুরুট ধরাতে গিয়ে ফাঁপরে পড়বেন মেজর। ব্যাপারটা নিয়ে আর কথা না বলে অর্জুন সেই বাড়িটা দেখাল চার্লিকে। এর মধ্যে সে চার্লিকে প্লেনের ঘটনা বলেছে। সে ইচ্ছে করেই লাইটার-প্রসঙ্গ চেপে গেছে। লোকটি রহস্যজনক, ওর সম্পর্কে সে জানতে চায়। চেহারার বর্ণনা শুনেছে চার্লি। তারপর হেসে বলেছে, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ইতালিয়ান। ইতালিয়ানরা রেস্টুরেন্টে খেতে খুব ভালবাসে। ওই ব্লকে একটা ইতালিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে। এখন তো লাঞ্চ খাওয়ার সময়। চল, ওখানে যাওয়া যাক। ওদের POLLO BOLLITO খেতে আমার খুব ভাল লাগে।"

ব্যাপারটায় মন সায় না দিলেও অর্জুন রাজি হল। তার পকেটে কয়েকটা ডলার একই অবস্থায় রয়েছে। চার্লির অভিজ্ঞতা যদি ঠিক হয় তা হলে ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টের মালিক নিশ্চয়ই এই লোকটার বর্ণনা শুনে চিনতে পারবে।

রেস্টুরেন্টটা বড়। শুধু ইতালিয়ান নয়, অন্যান্য জাতের লোকেরা যেভাবে খাচ্ছে টেবিলে-টেবিলে, তাতে এই দোকানের রান্না সম্পর্কে সন্দেহ থাকছে না। চার্লি আর অর্জুন এটা টেবিলে বসতেই বয় এসে মেনু-এগিয়ে দিল। প্রথমে লেখা আছে, PASTINA IN BRODO, TORTELLINI IN BRODO, CON CARNE, COTOLETTE, BISTECCA, MANZO, POLLO, RISOTTO, CASSATA."

অর্জুন এর মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছে না দেখে চার্লি জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি এখনও খিদে আছে?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না, মেনুটা দেখছিলাম শুধু।"

চার্লি বলল, "তুমি তা হলে একটা GELATO খাও।" নিজের খাবারটাও দিতে বলল সে।

GELATO মানে যে আইসক্রিম, তা দেওয়ার পর বুঝতে পারল অর্জুন। সে তাই খেতে-খেতে চারপাশে মুখ ফিরিয়ে দেখছিল। না, কোথাও সেই সুবেশ ভদ্রলোক নেই। খাওয়া হয়ে গেলে অর্জুন দাম মেটাল। মোট ছ'টা ডলার খরচ হল তার। এবং তখনই নজরে পড়ল সেই গুণ্ডা টাইপের লোকটাকে। কাউন্টার থেকে খাবার প্যাকেট নিয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে অর্জুন ইশারা করল চার্লিকে। চার্লি চোখ ছোট করে দেখল

লোকটাকে। ওরা খানিকটা দূরত্ব রেখে অনুসরণ করছিল। হঠাৎ চার্লি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে লোকটার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। লোকটা আড়চোখে চার্লিকে একবার দেখল। ওরা দু'জনে একসঙ্গে লিফটে উঠে যেতে অর্জুন থমকে দাঁড়াল। লিফটে আরও দু'জন মহিলা উঠলেন।

মিনিট-পাঁচেক বাদে চার্লি নেমে এল শিস দিতে দিতে। অর্জুন খুব উত্তেজিত ছিল। সে জিজ্ঞেস করল, "কী হল, তুমি সোজা ওপরে চলে গেলে?"

"সোজা ওপরে। ও নামল তিনতলায়, বাঁ হাতের প্রথম ফ্ল্যাটে। আমি পাঁচতলায় উঠে একটু সময় নিয়ে ফিরে এলাম। চল, একটু ওপাশে যাই।" দ্রুত পা চালিয়ে একটু আড়ালে চলে এসে পকেট থেকে একটা ব্যাগ বের করল চার্লি। মানিব্যাগ।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

"এটা ওই লোকটার পকেটে ছিল। কী আছে দেখি এর মধ্যে। বাঃ, প্রচুর ডলার আছে, দশ বিশ তিরিশ। উঃ একশো ষাট। লোকটার ছবি। আরম্যান্ডো ডি কোরো।" চার্লি হাসল, "লোকটা সত্যিই ইতালিয়ান।"

"তুমি, তুমি ওর ব্যাগ চুরি করেছ?" অর্জুন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

"কিন্তু ও জানবে পকেট থেকে পড়ে গেছে।"

এবার অর্জুন হাসল। চার্লি চমৎকার একটা রাস্তা বের করেছে ওই ফ্ল্যাটে যাওয়ার। চার্লি ওকে ব্যাগটা দিয়ে বলল, "ও আমাকে দেখেছে। আমি গেলে সন্দেহ করতে পারে। যদি দরকার মনে কর, তা হলে তুমি যাও।"

অর্জুন এক মুহূর্ত ভাবল। দোকানে না খেয়ে প্যাকেটে করে যখন খাবার নিয়ে এসেছে বোঝাই যাচ্ছে আর-একজন ঘরে আছে। দুটো লোককে একসঙ্গে কীভাবে ম্যানেজ করা যাবে? ঠিক তখনই দেখা গেল গুণ্ডাগোছের লোকটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাড়িটা থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে হেঁট হয়ে খুঁজতে-খুঁজতে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্জুন চটপট এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে। লোকটিকে এড়িয়ে সোজা তিনতলায় উঠে বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের বোতাম টিপতেই সেই সুবেশ ইতালিয়ানটি দরজা খুলে কিঞ্চিৎ অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়েস?"

ব্যাগ থেকে ছবিটা বের করে অর্জুন হাতে রেখেছিল। সেটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার আরমান্ডো এখানে থাকেন কি?"

"হ্যাঁ। কী চাই?"

"আমার কিছু নাই না, উনি কি কিছু হারিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। কিন্তু কেন?"

"ব্যাগটা আমি রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফুটল। বললেন, "ভেতরে আসুন। আরমান্ডো ওই ব্যাগটাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কী নাম আপনার? আমি

pathagar.net

পাওলো।”

“আমি অর্জুন। প্রাচ্যদেশ থেকে এসেছি।” ইচ্ছে করেই ভারত শব্দটা উচ্চারণ করল না সে।

“আই সি। কিন্তু আপনাকে খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় দেখেছি বলুন তো?”

“আমি এদেশে নতুন।” অর্জুন অস্বস্তিতে পড়ল।

এইসময় দরজায় আরমান্ডো এসে দাঁড়াল। তার মুখে-চোখে বিভ্রান্তি। পাওলো বললেন, “এই ভদ্রলোকে ধন্যবাদ দাও হে। তোমার ব্যাগ রাস্তায় পেয়ে ফেরত দিতে এসেছেন।”

অর্জুন ব্যাগটা ফেরত দিতেই আরমান্ডো সেটাকে খুলে ডলারগুলো গুনে বলল, “ধন্যবাদ। কিন্তু আমার পকেট থেকে কখনওই ব্যাগ পড়ে না। তবু ধন্যবাদ।”

অর্জুন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, “আমি একটু আগুন পেতে পারি?”

পাওলো বললেন, “নিশ্চয়ই।” তারপর উঠে একটা দেশলাই-এর পাতা এগিয়ে দিল, “আপনাকে আমি ফ্রাঙ্কফুর্টে দেখেছি। ইয়েস। আপনি কাল এদেশে এসেছেন। তার মানে আমরা একই প্লেনে ছিলাম। তাই না?’

অর্জুন বিপদের গন্ধ পেল। পাওলোর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে সে ভুল ভেবেছিল। অমল সোম হলে নিশ্চয়ই এই ভুলটা করতেন না। সে নীরবে মাথা নাড়ল।

পাওলো বললেন, “তা হলে কি ধরে নেব আরমান্ডোর পকেট থেকে ওই ব্যাগটা পড়েনি?”

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, “কী বলতে চান?”

“কিছুই না। দাঁড়ান। আপনি সিগারেট না-ধরিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমিই ওটা ধরিয়ে দিচ্ছি।” পকেট থেকে লাইটার বের করলেন পাওলো। অর্জুন চমকে উঠল। জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির এই লাইটার, তার কোনও দিন ভুল হবার কথা নয়। আরমান্ডো তখন দরজাটা বন্ধ করছে।

প্রথম বোতাম টিপলেন পাওলো, “নিন, সিগারেটের ডগাটা এখানে আনুন, ধরে যাবে।” হাসলেন তিনি, “বাঃ, আপনি জানেন দেখছি। আমার মনে হচ্ছে আপনি সেই মানুষ যার কথা নিউইয়র্ক টাইমস ছেপেছে। আপনার অভিযানের গল্প আমি পড়েছি। আজ জোন্স অ্যান্ড জোন্সের চেয়ারম্যান তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছে। তাই না?” পাওলো কথা শেষ করে আরমান্ডোর দিকে ইঙ্গিত করামাত্র অর্জুন ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবং কিছু বোঝার আগেই লাইটারটা মুঠোয় নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে তার মাথায় আঘাত এবং চোখে অন্ধকার নেমে এল।

জ্ঞান ফিরলে অর্জুন প্রথমে ভাল করে তাকাতে পারছিল না। মাথাটা খুব ভারী এবং যন্ত্রণা পাক খাচ্ছে। ক্রমশ সে বুঝতে পারল হাসপাতাল বা ওরকম কোথাও শুয়ে আছে। একটি মহিলা-কণ্ঠ বলল, "ধন্যবাদ, ওর সেন্স ফিরেছে। ক্রাইসিস ইজ ওভার।"

দ্বিতীয়বার জ্ঞান এল যখন, তখন স্পষ্ট তাকাতে পারল। মেজর, বিষ্টুসাহেব সামনে দাঁড়িয়ে। মেজর বললেন, "কেমন আছ এখন ?"

"কী হয়েছিল আমার ?" দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

"ওরা তোমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিল। তারপর ফ্ল্যাট খালি করে চম্পট দেয়। চার্লি আমাকে দাবার দোকান থেকে তুলে নিতে দেরি করলে বাঁচানো যেত না। আমরা গিয়ে দেখলাম তুমি মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছ। ডাক্তার বলছে, দিন-দশেক লাগবে ছুটি পেতে।" মেজর বললেন।

"ওরা ধরা পড়েনি ?"

"না," বিষ্টুসাহেব বললেন, "জোন্স অ্যান্ড জোন্সের চেয়ারম্যান দেখতে এসেছিলেন। ঠিক আছে ?"

অর্জুন চোখ বন্ধ করল। তারপরেই তার লাইটারটার কথা মনে পড়ল। জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া লাইটারটা এখন কোথায় ?

ঠিক তখনই চার্লির গলা শুনতে পেল, "হাই ইয়ংম্যান। হিয়ার ইজ ইওর টেন থাউজেন্ড ডলার্স! হঠাৎ দেখি আকাশ থেকে নেমে আসছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লুফে নিলাম। এটা কী করে খোলে তাই বুঝতে পারছি না।"

চার্লি সরল হেসে বস্তুটি অর্জুনের দিকে এগিয়ে ধরল। এক ঝলক দেখে অর্জুন চিনতে পারল। জোন্স অ্যান্ড জোন্স।

অর্জুন হাসতে চেষ্টা করল, "টাকাটা তোমার আমার আধাআধি চার্লি। তুমি খুব ভাল, খুব।"

pathagar.net

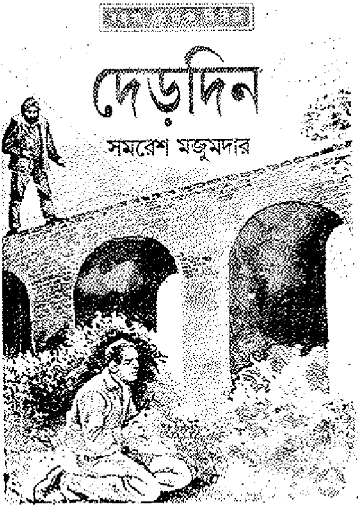

দেড়দিন

pathagar.net

জিনসের প্যান্ট আর ব্যাগি শার্ট পরে সাইকেল চালাচ্ছিল অর্জুন। এখনও জলপাইগুড়িতে তেমন শীত পড়েনি। গরমটা নেই এই যা। এই সময় একটু বৃষ্টি হবার অপেক্ষা। তারপর কয়েক মাস ধরে হাড় কাঁপাবে। এখন হাওয়ায় একটা মিষ্টি আরাম। কদমতলার মোড়ে এই সকালে তেমন ভিড় নেই। বেলা বাড়লেই রিকশার দাপটে পথ চলাই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় এই তল্লাটে।

মোড়টা পার হতেই অর্জুন দেখল, জগুদা মর্নিং ওয়াক শেষ করে ফিরছেন। ছোটখাটো এই মানুষটি এই সেদিনও অর্জুনের জন্য চাকরির খুব চেষ্টা করেছিলেন। দেখতে পাওয়া মাত্রই জগুদা হাত তুললেন, "কোথায় চললে?"

"এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি।" অর্জুন সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল।

"আমি অনেক ভেবে দেখলাম, তখন তোমার চাকরি না হয়ে খুব ভাল হয়েছে। একবার একটা চাকরিতে ঢুকলে ভবিষ্যৎ বারোটা। চাকরিতে ঢুকলে তোমার ইউরোপ-আমেরিকায় যাওয়া হত না। ভাবতে পারা যায়, আমাদের মতো আর্থিক অবস্থার পরিবার থেকে তোমার মতো বয়সের কেউ ও দেশে বেড়াতে যাচ্ছে? একবার মালবাজারে চলে এসো।"

"আপনি কি ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করছেন?"

"না। শনি-রবিবার এখানে থাকি। একটা ইন্টারেস্টিং কেস হচ্ছে ওখানে।"

"কী রকম?" অর্জুন কৌতূহলী হল।

জগুদা আশেপাশে একবার নজর বুলিয়ে বললেন, "এসো, চা খাওয়া যাক।"

কদমতলার মোড়েই যে ভাঙাচোরা চায়ের দোকানে জগুদাকে অনেক দিন আড্ডা মারতে দেখেছে, অর্জুন সেখানেই গেল। সবে চায়ের জল গরম হচ্ছে। বেঞ্চিতে আরাম করে বসে জগুদা বললেন, "আমাদের ব্যাঙ্ক-লোনের জন্যে রোজ একগাদা দরখাস্ত পড়ে। বাছাই করে জামিনদার রেখে উপযুক্ত লোককে আমরা ধার দিই। ব্যবসা করে তাদের সেই টাকা শোধ করে দেওয়ার কথা।

কিন্তু সত্তর ভাগ মানুষ পুরো টাকা শোধ দেয় না।”

ঘটনাটা সবাই জানে। এর মধ্যে ইন্টারেস্টিং কেস কী আছে বুঝতে পারছিল না অর্জুন। সে নড়ে-চড়ে বসল। অমল সোমের কাছে যাওয়ার কথা আছে। কাল রাত্রে হাবুকে দিয়ে তিনি চিঠি পাঠিয়ে দেখা করতে বলেছেন।

জগুদা বললেন, “এদের ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু সম্প্রতি আর-এক ধরনের লোনের জন্যে মানুষ আসছে। তুমি হয়তো জানো, ব্যাঙ্কে সোনার গয়না রেখে লোন পাওয়া যায়। সুদ সমেত সেই টাকা শোধ করে দেওয়ামাত্র গয়না ফেরত দেওয়া হয়। তুমি দেখলে অবাক হয়ে যাবে, এমন সব মানুষ গয়না রেখে লোনের জন্যে আসছে, তাদের দু' বেলা পেট ভরে খাওয়ার অবস্থা নেই। লোকগুলো হঠাৎ গয়না পেল কী করে কে জানে?”

চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “এই লোকগুলো কারা?”

“কাছেপিঠের আদিবাসী মানুষ।”

“চা-বাগানে কাজ করে?”

“না, না। সেটাই বিস্ময়ের। চা-বাগানে যারা কাজ পায় না, ঝুপড়ি বেঁধে জঙ্গলে বা রাস্তার ধারে থাকে, ঠিকাদারদের কাছে কাজ করে, তারাই আসছে সোনার গয়না নিয়ে। আর ওই গয়নাগুলো সব এক ধরনের, আঙুলের রিং। খাঁটি সোনার।”

“পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস অথবা জামিনদার আছে?”

“দরকার নেই। তিন-চার ভরি সোনার গয়না থাকলে ব্যাঙ্ক কোনও প্রশ্ন করবে না। মজার কথা হল, যদি বেশি গয়না থাকত, তা হলে তার সোর্স নিয়ে পুলিশকে তদন্ত করতে বলা যেত। প্রশ্ন করলে বলে কয়েক পুরুষ ধরে নাকি ওরা ওই গয়না রেখেছিল। কিন্তু গত তিন মাসে দু'শো পঁচিশজন লোক তিন ভরি থেকে সাড়ে তিন ভরি করে গয়না বন্ধক রেখে পঁচাত্তর ভাগ টাকা ধার নিতে এল, এটা নিশ্চয়ই অভিনব ব্যাপার। তুমি কী বলো?”

সমস্ত ব্যাপারটা শুনে অদ্ভুত ধোঁয়াটে লাগল অর্জুনের। সে জিজ্ঞেস করল, “ঠিক কত ভরি সোনার গয়না আপনারা পেয়েছেন?”

“টোটাল ছ'শো দশ ভরি। পাকা সোনা। আংটি কিংবা বালা। প্রায় দু' কোটি টাকা। আমাদের ব্রাঞ্চের ক্ষমতা মাঝারি। অত ধার দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আর ব্যক্তিগতভাবে সোনার পরিমাণ এত কম, কিছু করতেও পারা যাচ্ছে না।”

“এত সোনা কী করে ওদের হাতে আসছে, অনুমান করছেন?”

জগুদা মাথা নাড়লেন, “না। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। লোকাল থানার ও. সি-কে বলেছিলাম। দু'-তিন ভরি সোনার জন্যে তিনি কিছু করতে পারেন না, যদি কেউ অভিযোগ না করে যে, সে ওই গয়না হারিয়েছে। ব্যাঙ্ক তো গয়না খাঁটি জেনেই খালাস। তাই তোমাকে বলেছিলাম, কেস খুব

ইন্টারেস্টিং। পারলে চলে এসো মালবাজারে।"

চা খাওয়া হয়ে যেতে জগুদার কাছ থেকে বিদায় নিল অর্জুন। সত্যিই ব্যাপারটা খুব রহস্যজনক। কোনও মানুষ বোধহয় এইভাবে নিজের গোপন সোনার গয়না ব্যাঙ্কে রেখে কিছু টাকা হাতিয়ে নিতে চান, যা প্রকাশ করলে আয়কর দপ্তরের জেরার সামনে পড়তে হবে। এ অনেকটা কালো টাকাকে সাদা করে নেওয়া। কিন্তু তা-ই বা হবে কী করে? যার সঞ্চয়ে অত সোনা রয়েছে; যে বুদ্ধি খরচ করে নিঃস্ব লোকগুলোকে পাঠিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করে নিচ্ছে—সে ইচ্ছে করলে দেশের যে-কোনও কালোবাজারে বিক্রি করে পুরো টাকা পেত। লোকগুলোকে নিশ্চয়ই কিছু দিতে হচ্ছে কাজ করার জন্যে। তা ছাড়া ধার তো নিজের নামে পাচ্ছে না, তাই আয়কর দপ্তর থেকে নিস্তারও পাবে না। কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল সমস্ত ব্যাপারটা। সাইকেল চালিয়ে হাকিমপাড়ায় চলে এল অর্জুন।

এই সকালে বাগানে কাজ করছিলেন অমল সোম। গেট খোলার শব্দ পেয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অর্জুন লক্ষ করল, অমলদার পরনে ইস্ত্রি-ভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবি। বেশ সৌখিন মানুষ বলে মনে হচ্ছে। অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার হাসছ যে?"

অমলদার সঙ্গে তরল কথা কখনও বলেনি অর্জুন। আজও বলতে বাধল। গম্ভীর হয়ে বলল, "কিছু নয়। কাল রাত্রে হাবুর হাতে আপনার চিঠি পেলাম।"

"হ্যাঁ। তোমার হাতে এখন কোনও কেস আছে?"

"বাঃ, কেস থাকলে আপনি জানতে পারতেন না?" অর্জুনের গলায় একটু অভিমান।

"কী জানি। এখন তো তোমার নামডাক হয়েছে। আমার খুব ভালই লাগে। চা খাবে?"

"না। একটু আগে জগুদা খাওয়ালেন।"

"জগুদা?"

"কদমতলায় থাকেন। মালবাজারের ব্যাঙ্কে কাজ করেন।"

"তোমার হাতে যখন কোনও কেস নেই, তখন তুমি আমার একটা উপকার করতে পারো। দিল্লিতে আমার এক পুরনো ক্লায়েন্ট থাকেন। ভদ্রলোককে কোটিপতি বললে কম বলা হবে। লোকটি ভাল। কোনও সাতে-পাঁচে থাকেন না। তাঁর মেয়ে স্কুলের ওপরের দিকে পড়ে। সে তার তিন বন্ধুর সঙ্গে দার্জিলিং-এ বেড়াতে আসছে। সেই সঙ্গে ডুয়ার্সের ফরেস্টে দু'-তিন দিন থাকতে চায়। ভদ্রলোক আমাকে অনুরোধ করেছেন, ওরা যে ক' দিন উত্তর বাংলায় থাকবে, তত দিন যদি ওদের জন্যে একটি ভাল গাইডের ব্যবস্থা করি, যে ওদের নিরাপত্তার ভার নিতেও পারবে, তা হলে ভাল হয়। ওঁর বাসনা ছিল

আমি যদি কয়েকটা দিন ওদের সঙ্গে থাকি। তা আমি ভাবলাম, অল্পবয়সী মেয়েদের মানসিকতা বা স্বভাবের সঙ্গে আমার ধরনটা ঠিক মিলবে না। ওরাও একজন বয়স্ক মানুষকে সব সময় কাছে থাকতে দেখে অস্বস্তি বোধ করবে। তার চেয়ে তুমি যদি যাও, তা হলে খুব ভাল হয়। খরচের জন্যে ভেবো না। ওঁর মেয়ের নাম নন্দিনী। তার হাতে একটা আলাদা প্যাকেটে তোমার খরচের টাকা থাকবে।"

অমলদা কথা শেষ করা মাত্র হাবু চায়ের কাপ নিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। তার হাতে এক কাপ চা। অর্জুনকে দেখে জিভ বের করল সে। অর্জুন হাত নেড়ে নিষেধ করল। সে চা খাবে না। হাবু কথা বলতে পারে না। কানেও কম শোনে, কিন্তু ওর বোধশক্তি, বুদ্ধি, গায়ের জোর খুব। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওরা কবে আসছে?"

"আজই। বাগডোগরায় দিল্লি ফ্লাইটে। তুমি বেশি সময় পাবে না তৈরি হতে।"

অর্জুনের প্রস্তাবটা মোটেই ভাল লাগল না। কোনও থ্রিল বা রহস্য নেই। চারটে বড়লোকের মেয়েকে পাহারা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। মেয়ের বন্ধু যখন, তখন নিশ্চয়ই মেয়ে। মেয়েদের সঙ্গে থাকার কোনও মানেই হয় না। আর ওদের বাবা-মা কী করে কোনও গার্জেন ছাড়াই এত দূরে আসতে দিচ্ছে! অর্জুনকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অমল সোম বললেন, "না, তোমার ওপর আমি কাজটা জোর করে চাপিয়ে দিতে চাই না। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।"

অর্জুন নাড়া খেল। আজ পর্যন্ত সে কখনও কোনও অবস্থায় অমল সোমকে অস্বীকার করেনি। তাঁর যে-কোনও অনুরোধই অর্জুনের কাছে আদেশ। আজ পিছিয়ে যাওয়ার কোনও কথাই ওঠে না। যত খারাপ লাগুক, কাজটা তবু সে করবে। অর্জুন বলল, "না, অমলদা, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমার যেতে কোনও আপত্তি নেই।"

শিলিগুড়িতে বাস থেকে নেমে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যাওয়া খুব ঝামেলার। কোনও বাস নেই সরাসরি। বাগডোগরা শহর থেকে, অবশ্য যদি শহর বলা যায়, রিকশা নিয়ে কয়েক কিলোমিটার পথ ডিঙিয়ে তবে এয়ারপোর্ট চত্বরে পৌঁছনো যায়। যাত্রীদের নিজের গাড়ি না থাকলে ট্যাকসি কিংবা অটো ভাড়া করেন। অর্জুনের মনে পড়ল, বিদেশের সব শহরেই এয়ারপোর্ট থেকে শহরে যাতায়াত করে এয়ারলাইনসের বাস। সেটা নিশ্চয়ই এখানে পাওয়া যাবে। বাসস্ট্যান্ড থেকে রিকশা নিয়ে অর্জুন চলে এল সিনক্লেয়ার হোটেলে। ওর সামনেই এয়ারলাইনসের অফিস। কিন্তু সেখানে গিয়ে হতাশ হল সে। শিলিগুড়ি শহর থেকে সে রকম কোনও ব্যবস্থা নেই এয়ারপোর্টে যাওয়ার।

অর্জুন ঘড়ি দেখল। সময় বেশি নেই। সিনক্লেয়ার হোটেলটা শিলিগুড়ি শহরের বাইরে। ভুল হয়ে গেল। বাসস্ট্যান্ড থেকে চেষ্টা করলে হয়তো শেয়ারে ট্যাকসি পাওয়া যেত। অর্জুন ঠোঁট কামড়াল। এই সময় হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন স্যুট-পরা এক ভদ্রলোক। ঘড়ি দেখলেন। সঙ্গে-সঙ্গে একটা প্রাইভেট ট্যাকসি পার্কিং লট থেকে গড়িয়ে এল। ড্রাইভার মুখ বের করে বলল, "বলিয়ে সাব, কাঁহা যানা হ্যায়।"

"এয়ারপোর্ট। জলদি।"

"ষাট রুপিয়া ওয়ান ওয়ে।"

"ঠিক হ্যায়।" ভদ্রলোক পেছনের দরজা খুলে গাড়িতে উঠে বসলেন। অর্জুন আর ইতস্তত করল না। দৌড়ে গাড়ির কাছে গিয়ে বলল, "আমাকে দয়া করে এয়ারপোর্ট নিয়ে যাবেন? আমি কোনও ট্রান্সপোর্ট পাচ্ছি না।"

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। কিন্তু সেই সময় ড্রাইভার বলল, "নিয়ে নেব স্যার?"

ভদ্রলোক যেন অনিচ্ছায় মাথা নাড়লেন। গাড়ি হোটেল থেকে বেরিয়ে ডান দিকে বাঁক নিল। অর্জুন চুপচাপ বসে ছিল। লরি, টেম্পো, মিনিবাস ছুটে যাচ্ছে হাইওয়ে দিয়ে। বাঁ দিকে চা-বাগান। শেষ পর্যন্ত বাগডোগরা বাজার হয়ে বাঁ দিকে সংরক্ষিত এলাকায় তারা ঢুকে পড়ল। একজন সান্ত্রী দাঁড়িয়ে থাকে লক্ষ করার জন্য। ইচ্ছে হলে গাড়ি থামিয়ে প্রশ্ন করতে পারে, কিন্তু করল না। অর্জুন দেখল, এয়ারফোর্সের লোকজন সাইকেলে চেপে ফিরছে।

বাগডোগরা এয়ারপোর্টটাকে দেখে চট করে এয়ারপোর্ট বলেই মনে হয় না। যদিও প্রচুর গাড়ি রয়েছে, হলঘর, কাউন্টার, সিকিউরিটি এনক্লোজার এবং রেস্টুরেন্ট আছে, কিন্তু তবু এয়ারপোর্ট বলে মনে হয় না। সব কিছুই শিথিল, ঘরোয়া। ট্যাকসি থেকে নেমে সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, "কত দিতে হবে?"

"দশ টাকা।"

অর্জুন টাকাটা দিয়ে আর দাঁড়াল না। ছুটে হলঘরে ঢুকে কাউন্টারের কাছে পৌঁছে দেখল, দিল্লি ফ্লাইট ঠিক সময়ে আসছে। অর্থাৎ আর মিনিট-দশেক বাকি। সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ফ্লাইট পৌঁছে গেলে মেয়েগুলো নিশ্চয়ই ওর জন্যে দাঁড়াত না। তখন অমলদাকে কী কৈফিয়ত দিত সে?

সিগারেট ধরাল অর্জুন। বাড়ি ফিরে খুব অল্প সময় পেয়েছে তৈরি হবার। নিউ ইয়র্ক থেকে কেনা ব্যাগটায় জামাকাপড় পুরে চলে এসেছে কোনও মতে। আবার দাড়ি রেখেছে সে। ছোট্ট সুন্দর দাড়ি। অনেকটা তরুণ রবীন্দ্রনাথের মতো। ফলে দাড়ি-কাটার ঝামেলায় পড়তে হয় না আজকাল। অর্জুনের খেয়াল হল, তাড়াহুড়োতে নীল বাহারি জ্যাকেটটা ফেলে এসেছে বাড়িতে। ওটা পরলে তাকে খুব সুন্দর দেখায়।

সিগারেটে টান দিতে-দিতে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল অর্জুন। সর্বনাশ হয়ে গেছে। অমলদাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, নন্দিনীকে দেখতে কী রকম! কীভাবে সে চিনবে তাকে! যদি চারজন মেয়েকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়, তা হলে নাহয়...! যদি চারজন মেয়ের বদলে দু'জন ছেলে, দু'জন মেয়ে হয়? অর্জুন সিগারেট নিভিয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল। বেশ নার্ভাস হয়ে পড়ছিল সে। এই সময় বাইরের আকাশে প্লেনের গর্জন শোনা গেল। যে সব মানুষ এয়ারপোর্টে এসেছেন, তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অর্জুন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। প্লেন নীচে নেমে এল। রানওয়ে দিয়ে দৌড়ে দম নিয়ে বাঁক খেয়ে শেষ পর্যন্ত কাছাকাছি এসে থেমে যেতেই সিঁড়ির গাড়ি দৌড়ে গেল। যাত্রীরা নামতে আরম্ভ করলেই অর্জুন প্রত্যেককে লক্ষ করতে লাগল। এবং এই সময় পনেরো-ষোলো বছরের প্যান্ট শার্ট পরা চারটে মেয়েকে ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে নেমে আসতে দেখল। মেয়েগুলো সুন্দরী কিন্তু পুতুল-পুতুল নয়। হাঁটার ভঙ্গিতে সপ্রতিভতা পরিষ্কার। অর্জুন দেখল, আত্মীয়স্বজন-বন্ধুরা আগত যাত্রীদের আপ্যায়ন করে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েরা গেট পেরিয়ে এসে চার পাশে তাকাতে লাগল। অর্জুন আরও একটু অপেক্ষা করল। ওরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলছে। দিল্লির মেয়ে বাঙালি হবে না এমন ভাবার কোনও কারণ ছিল না। অথচ অর্জুন তাই ভেবেছিল। একটি মেয়ে বলল, "স্ট্রেঞ্জ! সামওয়ান শুড কাম। ড্যাড টোল্ড মি লাইক দ্যাট।"

দ্বিতীয়জন ইংরেজিতে জবাব দিল, "না এলে আমরা অনন্তকাল বসে থাকতে পারি না। লেটস গো।" ওরা কোনও বড় লাগেজ আনেনি। যে-যার হাতের ব্যাগ তুলে নিল বিরক্ত মুখে। এবার অর্জুন এগিয়ে গেল, "নমস্কার।"

ওরা চারজন থতমত হল এক মুহূর্তের মতো। সামনের মেয়েটি মুখে বিরক্তি নিয়ে বলল, "ইয়েস?"

অর্জুন গম্ভীর হয়ে ইংরেজিতে বলল, "আমার নাম অর্জুন। দিল্লি থেকে মিস্টার রায় আমার সিনিয়র অমল সোমকে চিঠি দিয়েছেন।" অমলদার দেওয়া চিঠিটা এগিয়ে ধরল অর্জুন। ওই চিঠি মিস্টার রায় অমলদাকে পাঠিয়েছিলেন।

মেয়েটি চিঠি নিয়ে খুলে ফেলল খামটা। একবার আগাগোড়া তাকিয়ে নিয়ে আবার ফেরত দিয়ে বলল, "আমি নন্দিনী। আমরা ভেবেছিলাম কেউ হয়তো আসেনি। হোটেল কত দূরে?" অর্জুন মাথা নাড়ল, "দুঃখিত, এখানে হোটেল নেই। আধঘণ্টার গাড়ির দূরত্বে শিলিগুড়ি শহর। সেখানে যেতে হবে।"

অন্য একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমরা আজই দার্জিলিং যেতে পারি না?"

"পারেন।" অর্জুন ওদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই ট্যাকসিওয়ালারা ছুটে এল। সবাই ওদের নিয়ে যেতে চায়। সে একটু দরাদরি করতে চাইল। এই সময় এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন মেয়েদের কাছে। কথা বলার জন্য

অর্জুন খানিকটা দূরে ট্যাকসিগুলোর সামনে দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে ভদ্রলোককে দেখতে গেল। পেয়ে চমকে উঠল। এই লোকটির সঙ্গেই সে সিনক্লেয়ার হোটেল থেকে এয়ারপোর্টে এসেছিল। ইনিই ট্যাকসিটাকে ভাড়া নিয়েছিলেন। সে বুঝতে পারছিল না তার সঙ্গী মেয়েদের সঙ্গে ওঁর কী দরকার। মনে পড়ল, এয়ারপোর্টে আসার সময় ইনি সঙ্গে কোনও লাগেজ আনেননি। অর্থাৎ ইনি যাত্রী নন, কাউকে নিতে এসেছেন। তিনশো টাকায় দার্জিলিং-এ যাওয়া রফা করে অর্জুন ফিরে আসতেই নন্দিনী বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কল, উই ক্যান টেক কেয়ার অব আওয়ারসেলফ। আপনি যে খবর পেয়ে আমাদের জন্যে এসেছেন, তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।"

ভদ্রলোক সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর চোয়াল শক্ত। তিনি বললেন, "তোমাদের একটা কথা মনে রাখা উচিত। এই সব এরিয়া শান্তিপূর্ণ নয়। এখানে তোমরা খুব সেফ নও।"

নন্দিনী হাসল, "সে সব খবরের কাগজেই পড়েছি। তা ছাড়া এসকর্ট হিসেবে এই ভদ্রলোক আছেন। বাবা এঁদের ওপর খুব নির্ভর করেন।"

ভদ্রলোক অর্জুনের দিকে তাকালেন, "আপনি...আপনাকে একটু আগে লিফট দিয়েছি না?"

"ঠিকই।" অর্জুন মাথা নাড়ল। তারপর নন্দিনীকে বলল, "দার্জিলিং-এ যেতে হলে এখনই রওনা হওয়া উচিত। ট্যাকসি ঠিক হয়ে গিয়েছে।"

সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েরা হই-চই করে ট্যাকসিটার দিকে এগিয়ে গেল। সবাই জানালার পাশে জায়গা চায়। ডিকিতে ড্রাইভার হাতব্যাগগুলো রেখে দিতেই অর্জুন পা বাড়াতে যাচ্ছিল। এই সময় ভদ্রলোক ওকে থামালেন, "ইয়েস ইয়ংম্যান, আমি কি তোমার পরিচয় জানতে পারি? এই মেয়েরা আমার পরিচিত। তুমি কোথায় থাকো?"

"জলপাইগুড়ি শহরে। আমার নাম অর্জুন।"

"কী করো তুমি?"

"কিছু না।" কথাটা বলে অর্জুন ট্যাকসির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পেছনে তিনজন বসেছে, ড্রাইভারের পাশে যে মেয়েটি বসেছে তার নাম জানা নেই। বসতে হলে তাকে সামনে বসতে হবে। মেয়েটি দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল, "আপনি নিশ্চয়ই দার্জিলিং-এ অনেক বার গিয়েছেন। তাই ভেতরে বসতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না!"

অর্জুন কথা না বাড়িয়ে মাঝখানে বসতেই ট্যাকসি ছাড়ল। মেয়েরা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল। এই চিৎকারের অর্থ অর্জুন বুঝল না। প্রায় চার-পাঁচবার চিৎকারটা করে নন্দিনী বলল, "আপনার নামটা কী যেন?"

"অর্জুন।"

"ও, মহাভারাতা? ও. কে! শুনুন, আমরা এ রকম আওয়াজ মাঝে-মাঝেই

করি। আপনি কিছু মনে করবেন না। শুধু রিলে করে যান রাস্তাটা। আমরা শুনে চিনব।"

এয়ারপোর্টের চৌহদ্দি থেকে ন্যাশনাল হাইওয়েতে পড়ামাত্র নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, "আরে, এখানে কি পাহাড় নেই?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না। পাহাড় পাবেন শিলিগুড়ি ছাড়ালে। এই জায়গাটার নাম বাগডোগরা। এর কাছাকাছি আছে ফাঁসিদেওয়া, যেখানে সত্তর দশকের আন্দোলন শুরু হয়েছিল।"

নন্দিনীর বান্ধবীদের নাম ইতিমধ্যে শুনে-শুনেই জেনে গিয়েছিল অর্জুন। রোগা মেয়েটি, যার চোখে চশমা, চুল ছেলেদের মতো ছাঁটা, জিজ্ঞেস করল, "আন্দোলন? কিসের আন্দোলন?"

এই মেয়েটির নাম টিনা। অর্জুন বুঝল, এরা প্রায় কুড়ি বছর আগের ঘটনাবলী সম্পর্কে নেহাৎই অজ্ঞ। আর অত কথা বোঝাবার সময় এবং ইচ্ছে দুটোই এখন নেই। সে বলল, "একটা রাজনৈতিক আন্দোলন।"

টিনা বলল, "ওঃ, আমরা রাজনীতিতে ইন্টারেস্টেড নই।"

অর্জুন হাসল, "আপনারা কিসে-কিসে ইন্টারেস্টেড?"

"স্পোর্টস, ক্রাইম ফিকশন, মিউজিক আর অ্যাডভেঞ্চার।" নন্দিনী জবাব দিয়েই জানতে চাইল, "আপনি? আচ্ছা আপনার বয়স কত?"

"তেইশ।"

"তা হলে কুড়ি বছর আগের ঘটনা আপনি জানলেন কী করে?"

"যে ভাবে আমরা মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার কথা জেনে থাকি।"

"আ-চ-ছা! হ্যাঁ, আপনার কিসে ইন্টারেস্ট?"

"সত্যসন্ধান।"

"হোয়াটস দ্যাট?"

"যে ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর মনে হয় রহস্য লুকিয়ে আছে অথবা আপাতভাবে কোনও রহস্য নেই বলে মনে হলেও কয়েকটা ব্যাপারে খটকা থাকে, সেই ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করতে আমার ভাল লাগে, তা ছাড়া ওটা এখন আমার পেশা।"

"মাই গড! আপনি ডিটেকটিভ?"

"ঠিক তা নয়। আমি সত্যসন্ধান করি মাত্র।"

সঙ্গে-সঙ্গে কান ফাটানো সেই চিৎকারটা ছিটকে বেরোল মেয়েদের মুখ থেকে। অর্জুনের কান লাল হয়ে গেল। এরা কি তাকে অবিশ্বাস করছে? ট্যাকসির ড্রাইভার পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেল। নন্দিনী বলল, "ওঃ দারুণ! আমরা তা হলে একজন ডিটেকটিভের সঙ্গে থাকব। কিন্তু আপনার কি মনে হয় না, ডিটেকটিভ হবার পক্ষে যে বয়সটা দরকার, সেটা হতে অনেক দেরি আছে। বিদেশি উপন্যাসে এত ইয়ং ডিটেকটিভ—'হার্ডি বয়েস' বা 'ফেমাস ফাইভ'-দের

তো ম্যাচিওরড্ বলা যায় না।”

অর্জুন বলল, “আমি জানি না। তবে একটা তদন্তের ব্যাপারে আমি ইংল্যান্ড আর আমেরিকায় গিয়েছিলাম, সেখানে কিন্তু বয়স নিয়ে ঝামেলা হয়নি।”

সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল। চারটে মেয়েই পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। যেন তারা নিজেদের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। টিনা অবিশ্বাসী-গলায় জিজ্ঞেস করল, “আপনি স্টেটসে তদন্ত করতে গিয়েছিলেন?”

“হ্যাঁ। একটা লাইটার নিয়ে সমস্যা হয়েছিল।”

নন্দিনী চোখ কপালে তুলল, “ও মাই গড! মনে পড়েছে। কাগজে পড়েছিলাম, একজন তরুণ ভারতীয় গোয়েন্দা স্টেটসে গিয়ে ক্যান্টার করেছে। সেই লোক আপনি?”

এই সময় ড্রাইভার হাইওয়ে থেকে গাড়ি বাঁ দিকের কয়েকটি ঝুপড়ি দোকানের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কী ব্যাপার?”

“তেল নেব স্যার।”

“তেল? এখানে পেট্রল-পাম্প কোথায়?”

“দু' নম্বর তেল। এক নম্বর কিনলে পোষাতে পারব না। এরা পাঁচ টাকা লিটার নেয়, তিন টাকা সস্তর কম। একশো টাকা দিন। অ্যাডভান্স।”

অর্জুন হতভম্ব। সে কোনও দিন এই ঘটনা চোখে দেখেনি। এই বেআইনি তেল কিনতে দেওয়াটা এক ধরনের অন্যায়কে সমর্থন করা। সে মাথা নাড়ল, “আপনি যদি আমাকে না জানিয়ে তেল নিতেন, তা হলে আমার কিছু বলার ছিল না। কিন্তু জানতে পারার পরে এখান থেকে আপনাকে তেল নিতে দিতে পারি না।”

“আমি জানাতে গেছি নাকি? আপনিই তো জানতে চাইলেন।”

“আপনার একবারও মনে হচ্ছে না, এই গরিব লোকগুলো সস্তায় তেল দিচ্ছে কী করে?”

“চোরাই তেল। প্রাইভেট কিংবা কম্পানির গাড়ির ড্রাইভারেরা লুকিয়ে তেল বিক্রি করে দেয় এদের কাছে হাফ দামে। ওরা আবার আমাদের কাছে বিক্রি করে।”

“এই সব গরিব মানুষগুলোর ক্ষমতা আছে তেল কিনে ব্যবসা করার?”

“তা জানি না। হয়তো পেছনে কেউ আছে, সেই টাকা ঢালছে। আমার কী দরকার ও সবে, আমি তেল পাচ্ছি, তাই নিচ্ছি।”

ওরা যখন কথা বলছে, সেই সময় দু'জন আদিবাসী মহিলা এগিয়ে এসেছে গাড়ির কাছে। তাদের একজন জিজ্ঞেস করল, “ক' লিটার লাগবে?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “তেল লাগবে না। চলুন, সামনের পাম্প থেকে নেবেন।”

ড্রাইভার একটু ভাবল। তারপর বলল, "তা হলে আমাকে মাপ করবেন। আমি দার্জিলিং যেতে পারব না। কথাটা সরাসরি বলে দেওয়াই ভাল।"

"তা, এই কথা এয়ারপোর্টেই বলেননি কেন?"

"আমি তো যেতেই চেয়েছিলাম। কে জানত, আপনি এমন ঝামেলা করবেন?"

অর্জুন পেছনে তাকাল, "আপনারা কী চাইছেন?"

টিনা বলল, "আপনাকে আমি সাপোর্ট করছি।"

নন্দিনী বলল, "কাছাকাছি কোনও পুলিশ স্টেশন নেই?

এবার ড্রাইভার হাত জোড় করল, "মাপ করবেন দাদা, আপনারা পুলিশে খবর দিলে কী হবে জানি না, তবে এই লাইনে ট্যাকসি চালানো আমার বন্ধ হয়ে যাবে। দয়া করে গরিবের ভাত মারবেন না।"

ড্রাইভার আর কথা না বাড়িয়ে গাড়ি চালু করল। নন্দিনী মন্তব্য করল, "এখানে পা দিয়েই করাপশন দেখলাম। আপনি তো সত্যসন্ধানী, এর একটা বিহিত করুন, তেল কম্পানি থেকে নিশ্চয়ই ফি পাবেন।"

অর্জুন জবাব দিল না। হঠাৎ বাঁ দিকে চোখ পড়ায় সে বলল, "ওইটে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি।"

মেয়েরা দেখল। কিন্তু কোনও মন্তব্য করল না। শিলিগুড়িতে পৌঁছে বাঁ দিকে না ঘুরে ট্যাকসি শহরের দিকে যেতে লাগল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি সত্যিই দার্জিলিং-এ যাবেন না?"

ড্রাইভার কথা না বলে মাথা নেড়ে 'না' বলল।

অর্জুন ঘড়ি দেখল। লোকটাকে আর অনুরোধ করবে না বলে ঠিক করল। সে পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের প্রোগ্রামটা যদি আমাকে খুলে বলেন।"

নন্দিনী বলল, "কোনও স্টিরিও-টাইপ প্রোগ্রাম নেই। ঘুরব, হই-হই করব।"

"আপনারা কি আজ রাত্রে শিলিগুড়িতে থাকতে চান?"

নন্দিনী ঘাড় ঘুরিয়ে দু' পাশের রাস্তাঘাট দেখল। তারপর বলল, "এইটেই শিলিগুড়ি? না-না, এটা তো ঘিঞ্জি শহর। দার্জিলিং যদি না যাওয়া যায়, তা হলে কোনও নির্জন জায়গায় যাওয়া যায় কি না ভেবে দেখুন।"

ততক্ষণে গাড়ি 'এয়ার ভিউ' হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্জুন ড্রাইভারকে বলল, "আপনি কি দয়া করে আর একটু এগিয়ে যাবেন?"

লোকটি কথা শুনল যেন অনিচ্ছায়। বিশেষ একটি বাড়ির সামনে গিয়ে অর্জুন ভাড়া মিটিয়ে দিল। সিনক্লেয়ার হোটেল থেকে সেই ভদ্রলোক এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় যে ভাড়া দিয়েছিলেন, তার থেকে দশটা টাকা বেশি দিল শহরে ঢোকার বাড়তি পথটুকু আসার জন্যে। অর্জুন মেয়েদের বলল,

"আপনারা আমার সঙ্গে আসতে পারেন।"

পুনম নামের মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছেন?"

"ওপরে টুরিস্ট-ব্যুরোর অফিস। আমার পরিচিত একজন ভদ্রলোক আছেন চার্জে, ওঁর সঙ্গে কথা বললে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

মেয়েদের নিয়ে অর্জুন ওপরে উঠে এল সরু সিঁড়ি বেয়ে। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে সে একজনকে জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার ভট্টাচার্য আছেন?"

"ও পাশের ঘরে।" ভদ্রলোক দেখিয়ে দিলেন। ট্যুরিস্ট-ব্যুরোর এই অফিসারের সঙ্গে অর্জুনের আলাপ হয়েছিল অমল সোমের মাধ্যমে। খুব ভদ্র মানুষ, নিয়মিত সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। দরজায় দাঁড়ানো মাত্র তিনি চিৎকার করলেন নিজের চেয়ারে বসে, "আরে অর্জুনবাবু যে, এসো এসো। হঠাৎ শিলিগুড়িতে, কী ব্যাপার?"

অর্জুন ভদ্রলোকের সঙ্গে মেয়েদের আলাপ করিয়ে দিল। ওরা কেন এসেছে, তাও জানাল।

সব শুনে মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন, "দেখুন, আপনারা এসেছেন উত্তর বাংলা দেখতে। আমি সাজেস্ট করব, প্রথমেই দার্জিলিং-এ না গিয়ে আপনার ডুয়ার্সটা দেখুন।"

"ডুয়ার্স?" টিনা জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। উত্তর বাংলার আসল সৌন্দর্য যেখানে, জঙ্গল।"

"ওহ্ ফ্যান্টাস্টিক!" নন্দিনী বলে উঠল, "কিন্তু জঙ্গলে আমরা থাকব কোথায়?"

"প্রত্যেকটা ফরেস্ট বাংলোয় আমাদের একটা করে ঘর আছে।" মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন, "কিন্তু সেগুলোতে ব্যবস্থা আমি আগামী কাল থেকে করে দিতে পারব। আজকের রাতটা আপনারা মালবাজার ট্যুরিস্ট লজে থাকুন। আমি টেলিফোন করে দিচ্ছি, যাতে দুটো ডাব্‌ল আর একটা সিঙ্গল রুম আপনারা পান।"

মেয়েরা রাজি হয়ে গেল। মিস্টার ভট্টাচার্য ওদের ট্যুর-প্রোগ্রাম করলেন। সেই রাত ওরা থাকবে মালবাজার টুরিস্ট লজে। পরের দিন যাবে চাপড়ামারি ফরেস্টে। সেখানে একটা রাত থেকে তার পরের দিন যাবে গরুমারা ফরেস্টে। গরুমারা থেকে ওরা যাবে হলং ডাকবাংলোতে। সেখান থেকে সোজা শিলিগুড়িতে ফিরে এসে দার্জিলিং-এর বাস ধরবে। প্রোগ্রাম তৈরি করে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের সঙ্গে কী রকম লাগেজ আছে?"

টিনা বলল, "জাস্ট এই ব্যাগগুলো।"

"ও, তা হলে ভালই হল। এখনই বাসে রওনা হয়ে যান। ট্যাকসি ভাড়া করে খরচ বাড়ানোর দরকার নেই। আমি সমস্ত ফরেস্ট বাংলোয় খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বাইরে বেরিয়ে এসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনারা নিশ্চয়ই বাসে যেতে পারবেন না। চলুন, ট্যাকসি দেখি।"

টিনা বলল, বাসে বসার জায়গা পেলে ট্যাকসি নেওয়ার কী দরকার ? আমরা বাসে গেলে লোক্যাল মানুষের সঙ্গে মিশতে পারি।"

অর্জুন হাসতে গিয়ে সামলে নিল। দিল্লির এই মেয়েরা জিন্সের প্যান্ট আর শার্ট পরে এসেছে। স্থানীয় মানুষেরা ওদের কিছুতেই সহজ মনে নিতে পারবে না। মেলামেশা তো দূরের কথা !

সেবক রোড হয়ে যে সব বাস মালবাজার দিয়ে ডুয়ার্সে যায়, তার একটাতে উঠে বসল ওরা। বসার জায়গা পাওয়া গেল মেয়েরা অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল লেডিস সিটে বসে। অর্জুন পেছনে জায়গা পেয়েছিল। সে ভাবছিল, অমলদা তাকে অদ্ভুত এক ঝামেলায় ফেলে দিয়েছেন। এই মেয়েগুলোকে ডুয়ার্স ঘুরিয়ে দেখানো মানে কিছুটা সময় নষ্ট করা। তার মনে পড়ল অমলদা বলেছিলেন, নন্দিনীর বাবা খরচ চালানোর জন্যে একটা খাম মেয়ের হাতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এতক্ষণে একবারও নন্দিনী সেই প্রসঙ্গ ওঠায়নি। আর লজ্জায় অর্জুন নিজেও বলতে পারেনি।

বাসে তেমন ভিড় নেই। বাস ছাড়ার মুহূর্তে অর্জুনের নজর পড়ল একটা ট্যাকসির দিকে। এইমাত্র এসে দাঁড়াল সেটা। ড্রাইভারটা যেন পরিচিত। তারপরেই খেয়াল হল, ওই ট্যাকসিতে চড়ে সে আজ এয়ারপোর্টে গিয়েছিল। এবং তখনই দেখতে পেল ভদ্রলোককে। নন্দিনীর সঙ্গে এঁর একটা আলাপ হয়েছিল। কিন্তু ভদ্রলোক এখানে কী করছেন। পেছনের দরজা খুলে এপাশ-ওপাশ তাকাতে লাগলেন তিনি, আর অর্জুনদের বাসটা চলা শুরু করল।

লোকটার সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। ওর হাবভাব মোটেই ভাল লাগছে না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই এই চিন্তাটা মাথা থেকে সরে গেল। মেয়েরা চিৎকার করে জানতে চাইছে ওটা কী নদী, এটা কোন পাহাড়, আর সে পেছনে বসে জানিয়ে যাচ্ছে। বাসের অন্য যাত্রীরা কৌতুক বোধ করছিল। অর্জুন দেখল, তাদের অনেকেই মেয়েদের কৌতূহল মেটাচ্ছে আগ বাড়িয়ে। সে খুশি হল, আর চেঁচাতে হচ্ছে না। সেবক ব্রিজ পেরিয়ে বাসটা যখন পাহাড় থেকে নেমে ওদলাবাড়ি-বাগরাকোট দিয়ে ছুটছে, তখন সূর্যদেব পাটে বসেছেন। অর্জুন টাকার কথা চিন্তা করছিল। এর মধ্যে অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। প্রচুর টাকা নিয়ে সে বের হয়নি। এবার মুখ ফুটে চাইতে হবে। এই সময় নন্দিনী গলা তুলে জানতে চাইল, "কোথাকার টিকিট কাটতে হবে ?"

অর্জুন গম্ভীর গলায় জানিয়ে দিল, "আমিই কাটছি।"

মালবাজারের বাসস্ট্যান্ডে বাস দাঁড়াতেই অর্জুন ট্যুরিস্ট লজটা দেখতে পেল। দেখেই বেশ পছন্দ হয়ে গেল। এমন সুন্দর ডিজাইনের বাংলোবাড়ি দেখলেই থাকতে ইচ্ছে হয়। মেয়েরাও দেখে বেশ উত্তেজিত। একটা মাঠ

পেরিয়ে স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসকে ডান হাতে রেখে ওরা ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছে গেল। পুনম বলল, "ফ্যান্টাস্টিক। এ রকম জায়গায় এমন বাংলো, ভাবা যায়? আমাদের থাকতে দেবে তো?"

অর্জুন হাসল, কিন্তু কোনও জবাব দিল না। ভট্টাচার্যদা যখন আশ্বাস দিয়েছেন, তখন এরা বিমুখ করবে না। দোতলার বারান্দায় চেয়ার সাজানো। সেখান থেকেই মেয়েরা দূরের পাহাড়, মাঠ, চা-বাগান আর ডুবন্ত সূর্য দেখতে পেল। ওরা তিনখানা ঘর পেল। জানা গেল, শিলিগুড়ি থেকে টেলিফোনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নন্দিনী আর টিনা এক ঘরে, পুনম আর চিঙ্কি দ্বিতীয়টায়, আর কয়েকটা স্টেপ ওপরে এক ঘরে অর্জুন ঢুকে পড়ল। ব্যাগটাকে রেখে সে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল জানালা খুলে দিয়ে। আকাশে এখন লাল রং ছড়ানো। সেদিকে তাকিয়ে অর্জুনের মনে হল, তার পাহারা দিতে আসাই সার হবে, এই সব মেয়ে এমন-কিছু লবঙ্গলতিকা নয়, নিজেদের ঝুঁকি নিজেই নিতে পারে। এই ঘরে দ্বিতীয় বিছানাটি খালি। এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় নিশ্চয়ই এই সন্ধের সময়ে কেউ এসে উঠবে না মালবাজারে...। হঠাৎ মাথার ভেতর জগুদার মুখ ভেসে উঠল। একেই কি কাকতালীয় ব্যাপার বলে? আজ সকালে যখন কদমতলার মোড়ে জগুদার কাছে সোনা বিক্রির গল্প শুনছিল, তখন বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, তাকে এই মালবাজারে সন্ধেবেলায় আসতে হবে। জগুদা তাকে একবার এখান থেকে ঘুরে যেতে বলেছিলেন। মনে হয়, আজ রাত্রে জগুদা জলপাইগুড়ি থেকে এখানে আসবেন না। ব্যাঙ্ক খোলার আগেই কাল সকালের ফার্স্ট বাস ধরে পৌঁছে যাবেন। কাল তাদের যাওয়ার কথা চাপড়ামারি আর গরুমারা ফরেস্টে। এ-যাত্রায় জগুদার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম। তা ছাড়া সে এসেছে পাহারাদার হিসেবে, সোনার উৎস সন্ধান করতে নয়।

এই সময় দরজায় শব্দ হল। অর্জুন মার্কিনি কায়দায় উচ্চারণ করল, "ইয়া।"

সঙ্গে-সঙ্গে চারটে মেয়ে একসঙ্গে ঢুকে পড়ল ঘরে। পুনম ছুটে গেল জানালায়, "কাম হিয়ার, এখান থেকে সূর্য-ডোবা দেখা যাচ্ছে।"

"আমি সান-সেট দেখতে ভালবাসি না। আমি প্রেফার করি সান-রাইজ।" চিঙ্কি বলল।

ওরা ঘরে ঢুকতেই অর্জুন উঠে বসেছিল। মেয়েরা দুটো খাটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসল। শুধু নন্দিনী টেবিলের উপর উঠে বসে চেয়ারে পা তুলে দিল। অর্জুন লক্ষ করল, এর মধ্যেই ওরা পোশাক পালটে ফেলেছে। প্যান্ট ছেড়ে ম্যাকসি পরেছে চারজনেই। তাদের রং খুব জোরদার।

নন্দিনীর কাঁধে একটা সরু স্ট্র্যাপের চামড়ার ব্যাগ। অর্জুনকে জিজ্ঞেস করল, "এখন আমাদের প্রোগ্রাম কী? নিশ্চয়ই বাংলোয় বসে থাকার জন্যে আমরা এত

দূর আসিনি ?"

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল। সে বলল, "মুশকিলে ফেললেন, এ সব জায়গায় সন্ধে নামতেই ভূতেদের রাজত্ব হয়ে যায়। তখন কেউ বাড়ির বাইরে বের হয় না।"

"ভূত ? দারুণ ব্যাপার। আই রেড লট অব ঘোস্ট স্টোরিস।" টিনা বলল।

অর্জুন তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাল, "না, না, মানে, ভূত বলতে আমি অন্ধকার মিন করেছি। সন্ধের পর কেউ এখানে পথে বের হয় না।"

"কেন ?" নন্দিনী জিজ্ঞেস করল।

"রাস্তায় তেমন আলো নেই, কিছু দেখা যায় না। দেখার জিনিসও বিশেষ কিছু নেই মালবাজারে। আজকের রা রেস্ট নিয়ে কাল যেখানে যাব...।"

"শুনুন মিস্টার মহাভারত! আমরা এখানে ঘরে বসে থাকার জন্যে আসিনি। আমদের সঙ্গে টর্চ আছে। অন্তত ঘন্টা-খানেক হাঁটব আমরা। রাত্রের গাছপালা, তার সৌন্দর্য দেখব। শুনেছি সাইলেন্সেরও একটা সাউন্ড আছে। সেটা জানতে চাই। কিন্তু তার আগে আমাদের কিছু খাওয়া দরকার।"

অর্জুন খাট থেকে নেমে দাঁড়াল, "আপনারা লাউঞ্জে অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।"

"কেন ?" চিঙ্কি বলল, "আপনি আবার সাজগোজ করবেন নাকি ? এই পোশাকেই চলুন। বললেন তো রাস্তায় লোক থাকে না রাত্রে, দেখবে কে আপনাকে ?"

এমন কথা কোনও মেয়ের মুখে কখনও শোনেনি অর্জুন। তার চেনাজানা চৌহদ্দিতে অল্পবয়সী মেয়ের সংখ্যা খুব কম। যারা আছে তারা কথা গিলতে পছন্দ করে, কথা বলতে নয়। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে নিয়ে বলল, "চলুন, আপনারাও কি এই পোশাকেই যেতে পারবেন ?"

নন্দিনী লাফ দিয়ে টেবিল থেকে নামল, "ইয়েস জনাব! রাত্রে তো কেউ আমাদের সাজ দেখবে না।"

শুধু চা-টোস্ট আর ওমলেট পাওয়া গেল লজের ক্যান্টিনে। তাই খেয়ে ওরা যখন নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে, তখন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হল। ভদ্রলোক ফিরছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "এই সময়ে চললেন কোথায় ?"

নন্দিনী জবাব দিল, "ঘুরতে।"

"ও। যেতে হলে বাঁ দিকে যান, দোকানপাট কিছু পাবেন, ডান দিকে না যাওয়াই ভাল।"

ওরা নেমে এল মাঠে। নন্দিনী বলল, "আমরা ডান দিকেই যাব।"

অর্জুন বলল, "শুনলেন তো ম্যানেজারের কথা।"

"দুর। দোকানপাট দেখতে কি আমরা দিল্লি থেকে আসছি!"

অগত্যা বড় রাস্তায় উঠে ওরা ডান দিকে এগোল। এদিকে আলো নেই। নন্দিনীর হাতে টর্চ ছিল। পুনম বলল, "দারুণ লাগছে। কী রোমান্টিক ব্যাপার।"

চিঙ্কি বলল, "এক-আধটা ভূত থাকলে ভাল হত।"

টিনা নির্জন অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে গান ধরল, "ইয়ে রাত ভিগি ভিগি।"

অর্জুনের ভাল লাগছিল। এই রকম বাঁধন-হারা উচ্ছলতায় ডুবে যাওয়া তার ওই বয়সে হয়নি। অথচ এরা তার থেকে এমন কিছু ছোট নয়। টিনা গান গাইছে আর বাকি তিনজন তালি অথবা টর্চ বাজিয়ে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। মেয়েটার গলা ভাল। ডান দিকে পার্কটাকে রেখে ওরা মিনিট দশেক হাঁটল। এখন অন্ধকারে জোনাকি ছবি আঁকছে। মাঝে-মাঝে একটা-দুটো গাড়ি তীব্র আলো জ্বেলে ছুটে যাচ্ছে। সেই সময় অন্ধকার এবং নির্জনতা ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে। নন্দিনীর গলায় বিরক্তি ফুটে উঠল, "হরিবল্। এভাবে হাঁটা যায়? কোনও নির্জন রাস্তা নেই? ওই তো ও দিক দিয়ে একটা রাস্তা গিয়েছে।"

অনুমতির অপেক্ষা না করে মেয়েরা নেমে পড়ল হাইওয়ে ছেড়ে। বাঁ দিকে জঙ্গলের জন্যে আরও অন্ধকার। অর্জুনের পছন্দ হচ্ছিল না ওরা ওই দিকে যাক। সে বলল, "একটা কথ জ্ঞেস করছি, আপনাদের সাপের ভয় নেই তো?"

"সাপ? ওরে বাবা! এখানে সাপ আছে নাকি?"

"প্রচুর। নর্থ বেঙ্গলের সাপ বিখ্যাত।"

সঙ্গে-সঙ্গে চারটে গলা থেকে একসঙ্গে চিৎকার ছিটকে বেরোল। সবাই দ্রুত পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করল। তড়িঘড়ি বড় রাস্তায় পৌঁছে নন্দিনী বলল, "আগে বলবেন তো?"

"বলার সুযোগ পেলাম কোথায়?"

হঠাৎ টিনা প্রশ্ন করল, "আপনি গুল মারছেন না তো?"

অর্জুন কিছু বলার আগেই দু'জন মানুষ তাদের সামনে এসে নমস্কার করল। জায়গাটা অন্ধকার। তবু যেটুকু বোঝা যায় তাতে অর্জুনের মনে হল, এরা চা-বাগানের শ্রমিক অথবা কোনও কন্ট্রাক্টরের কাছে কাজ করে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী চাই?"

একজন হিন্দিতে বলল, "সাব—আপনারা বস্তিতে যেতে গিয়েও ফিরে এলেন, তাই এলাম।"

"হ্যাঁ। ওদিকটায় বড় অন্ধকার।"

"জি সাব। গরিব লোকের বস্তি, তাই আলো জ্বলেনি। আপনারা মালবাজারে নতুন?"

"হ্যাঁ, আজ বিকেলে এসেছি, কাল সকালে চলে যাব।"

"তা হলে সাব, মেমসাহেবদের বলবেন—আমাদের যেন একটু কৃপা করেন।"

"কী কৃপা?" নন্দিনী জিজ্ঞেস করল।

"মেমসাব, আমরা খুব গরিব। কাজকর্ম নেই। ঘরে যা ছিল, তা বিক্রি করে এত দিন চালিয়েছি। কিন্তু আর পারছি না।"

নন্দিনী বলল, "উফ্। যেখানে যাব, সেখানেই এই প্রবলেম। আমি ভিক্ষে দিই না।"

"না মেমসাব। আমরা ভিক্ষে চাই না। আমার ঘরে তিন পুরুষের জমানো একটু সোনা আছে, এত-দিন অনেক অভাবেও বিক্রি করিনি, তাই কিনে যদি আমাদের বাঁচান।"

"সোনা?" চিঙ্কি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, মেমসাব।"

"খাঁটি না নকল? আমরা সোনা চিনি না।"

"কসম খেয়ে বলছি মেমসাব। আমরা গরিব মানুষ, ব্যবসাদার নই।"

পুনম জিজ্ঞেস করল, "সোনা থাকলে গয়নার দোকানে গিয়ে বিক্রি করছ না কেন?"

"ঠিক দাম দেয় না মেমসাব। তা ছাড়া বলে, আমরা চুরি করেছি, পুলিশে ধরিয়ে দেবে।"

ততক্ষণে অর্জুনের মাথার ভেতরে জগুদার কথাগুলো কাজ করতে আরম্ভ করেছে। এই মালবাজারের ব্যাঙ্কে হাজার-হাজার টাকার সোনা জমা দিয়ে গরিব মানুষগুলো টাকা ধার নিয়ে যাচ্ছে। এটা জগুদার কাছে রহস্য বলেই মনে হয়েছে। এই লোক দুটো কি সেই দলের? অর্জুন এখনই কথা বাড়াতে চাইল না। সে বলল, "শোনো, এই অন্ধকারে কথা বলে লাভ নেই। তা ছাড়া আমাদের কাছে কত টাকা আছে তাও দেখতে হবে। তুমি বরং ঘন্টাখানেক বাদে সোনা নিয়ে ট্যুরিস্ট লজে এসো। আমি সামনেই থাকব। তখন কথা বলা যাবে।"

নন্দিনী ইংরেজিতে বলল, "আপনি কেন মিছিমিছি ডাকছেন? আমি সোনা কিনতে একদম ইন্টারেস্টেড নই। ও সব বিশ বছর আগে মেয়েদের শখ ছিল।"

অর্জুন হেসে বলল, "আমি ইন্টারেস্টেড।"

নন্দিনী শুধু মন্তব্য করল, "স্ট্রেঞ্জ!"

এর পরে সোনাটা খাঁটি কি না এ নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলল। ট্যুরিস্ট লজের কাছে এসে নন্দিনী ঘুরে দাঁড়াল, "আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। ড্যাডি একটা খাম দিয়েছিলেন, বলেছিলেন মিস্টার সোম অথবা তাঁর লোক

boiboi.com

এয়ারপোর্টে এসে যদি আমাদের রিসিভ করেন, তা হলে তাঁর হাতে যেন খামটা দিয়ে দিই। আমাকে ওটা খুলতে বিশেষ করেছিলেন। আপনি জানেন ওতে কী আছে ? মিস্টার সোম কি আপনাকে বলেছেন ?"

অর্জুন স্বস্তি পেল, "ব্যাপারটা যখন আপনাকে উনি জানাননি, তা হলে আমি জানব কী করে। ওটা সম্ভবত মিস্টার রায় আর মিস্টার সোমের ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

মেয়েরা যে-যার ঘরে চলে গেলে অর্জুন লাউঞ্জে চেয়ার টেনে বসল। ও-পাশের একটা চেয়ারে এক প্রৌঢ় বসে ছিলেন। দূরে মালবাজার বাজারের আলো দেখা যাচ্ছে। এই সময় নন্দিনী আবার ফিরে এল। খামটা দিয়ে বলল, "আপনার ঘরে গিয়ে দেখলাম দরজা বন্ধ। এখানে একা বসে বোর হচ্ছেন কেন ? ওহো, সেই লোক দুটোর জন্যে অপেক্ষা করছেন ?"

অর্জুন হাসল, জবাব দিল না।

এই সময় ওপাশের টেবিলের লোকটি বলে উঠলেন, "কী ব্যাপার ? এক্সকারশন ? এক কলেজ থেকে আসা হচ্ছে ? গুড গুড।" প্রশ্ন আর উত্তর তিনি একই সঙ্গে দিলেন।

নন্দিনী লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি এখানে থাকেন ?"

"নো নো। আমি শহরে থাকি না। শহরে এক দিনের বেশি থাকলেই আমার মনে অ্যালার্জি বের হয়। কোত্থেকে আসা হচ্ছে ?"

"ডেল্‌হি।"

"গুড। অ্যাডভেঞ্চার করতে চাও তো আমার ওখানে চলে এসো। এখান থেকে কিছু দূর গেলেই ফুন্টসিলিং বলে একটা জায়গা পড়বে। সেখানকার 'কাফে দ্য মাউন্টেন'-এ আমার খোঁজ করলেই তোমরা হদিস পেয়ে যাবে। আমার নাম রতনলাল গুপ্ত। ও হ্যাঁ, জায়গাটা ভুটানে। অর্থাৎ, তোমাদের এক রকম বিদেশ ঘোরাও হয়ে যাবে সেই সঙ্গে। নো ভিসা।" উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক ফিরে গেলেন তাঁর ঘরের দিকে।

"দারুণ ব্যাপার!" নন্দিনীর মুখে-চোখে উৎসাহ, "আমার মনে হচ্ছে ওঁর ওখানে গেলে খুব মজা হবে। ফুন্টসিলিং-এর কাছাকাছি কি আমরা যাচ্ছি ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু উনি বললেন শহরে এক দিনের বেশি থাকলে ওঁর অ্যালার্জি হয়, অথচ ফুন্টসিলিং পুরোদস্তুর শহর।" অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ডিনার করবেন কখন ?" নন্দিনী ঘড়ি দেখল, "এই সন্ধে বেলায় ?"

অর্জুন বলল, "বেশি রাত করবেন না।" নন্দিনী চলে গেল। অর্জুন সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা নিতেই নীচের সিঁড়িতে সেই দুটো লোক হাতজোড় করে এসে দাঁড়াল। অর্জুন সোজা হয়ে বসল, "ও, এসো তোমরা।"

যে লোকটা তখন বেশি কথা বলছিল, সে দু' হাত জড়ো করেই জিজ্ঞেস করল, "ওপরে যাব স্যার ? কেউ কিছু বলবে না তো ?"

"না না, কেউ কিছু বলবে না, উঠে এসো।"

লোক দুটো সামনে এসে দাঁড়াল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের কাছে সোনা আছে, নাকি সোনার গহনা ? নিয়ে এসেছ ?"

"হ্যাঁ সাব। সোনার গহনায় খাদ থাকে বলে আমাদের পূর্বপুরুষ সোনার কাঠি করেছিল। আপনি যদি বলেন, তা হলে এখানে বের করতে পারি।"

অর্জুন ইশারা করতেই লোকটা ধুতির খুঁট খুলে একটা ছোট্ট কাপড়ের ব্যাগ বের করল। জলঢাকা হাইড্রোইলেকট্রিক্যাল প্রজেক্টের আলো এত টিমটিমে যে, অর্জুনকে চোখ বড় করতে হল। কাপড়ের ব্যাগটা সন্তর্পণে খুলে একটা সোনালি কাঠি বের করল লোকটা। । অর্জুনের হাতে দিল। প্রথম দর্শনেই অর্জুনের মন বলল, জিনিসটা খাঁটি সোনা। কিন্তু সত্যিই কি সোনা ? সে হাতের তালুতে কাঠিটাকে রেখে একবার নাচাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কতখানি সোনা আছে এতে ?"

"সাব, এক ভরি।"

"কী করে বুঝব ?"

"আপনি যে-কোনও সোনার দোকানে গিয়ে যাচাই করতে পারেন।"

"এখন কি সোনার দোকান খোলা পাব ?"

"তা হয়তো পাবেন না।"

সঙ্গের লোকটা বলল, "লালচাঁদের দোকান খোলা আছে।"

"মালবাজারে ক'টা সোনার দোকান আছে ?"

"বেশি না সাব।"

"তুমি কী করে জানলে এতে এক ভরি আছে ?"

"সাব, আমার বাবার কাছে শুনেছি।"

অর্জুন লোকটার মুখের দিকে তাকাল। কী সাবলীল ভঙ্গিতে মিথ্যে কথা বলছে। যদি থিয়েটারে নামত, তা হলে নিশ্চয়ই নাম করত। সে বলল, "পয়সা দিয়ে জিনিস কিনছি, সোনার মতো জিনিস, যাচাই না করে তো কিনতে পারি না।"

"আপনি এটা নিয়ে লালচাঁদের দোকানে চলে যান সাব।"

"তুমি সঙ্গে যাবে ?"

"না সাব। আমি গেলে সন্দেহ করবে। আজেবাজে কথা বলবে।"

"তা হলে তুমি আমার হাতে বিশ্বাস করে সোনা ছেড়ে দেবে ?"

"আমরা গরিব মানুষ, কিন্তু মানুষ চিনি সাব।"

অর্জুন এক সেকেন্ড সিগারেট টানল। সোনার কাঠি তার হাতের মুঠোয়। এটা তার কেস নয়। সে এসেছে মেয়েদের পাহারাদার হিসেবে, স্বর্ণ-রহস্য সন্ধানে নয়। অতএব এ-নিয়ে কথা বলে কোনও লাভ নেই। সে বলল, "ঠিক আছে, কাল সকালে তোমরা এসো। আমি দেখতে চাই সোনাটা খাঁটি কি

না।"

"আপনি তখন বললেন, কাল সকালেই এখান থেকে চলে যাবেন?"

অর্জুন লোকটার দিকে তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?"

লোকটা হকচকিয়ে গেল। সঙ্গীর দিকে তাকাল। তারপর যেন বাধ্য হয়েই বলল, "মাংরা।"

অর্জুন হাসল, "আচ্ছা। মাংরা ভাই, এই সোনা যদি খাঁটিও হয়, তবু তো সাধারণ মানুষের সন্দেহ যাবে না। তার চেয়ে তোমরা যদি এই সোনা নিয়ে ব্যাঙ্কে যাও, তা হলে ব্যাঙ্ক এটা জমা রেখে তোমাদের ধার দেবে। এতে সুবিধে হল যখন তোমরা টাকার ব্যবস্থা করতে পারবে, তখন ব্যাঙ্ককে ধার শোধ করে দিলে পরিবারের গয়না ফেরত পেয়ে যাবে।"

মাংরা মাথা নাড়ল, "না সাব, আমরা প[ড়]তে-লিখতে জানি না। ব্যাঙ্কে যেতে ভয় লাগে। আপনাদের ভদ্রলোক [ব]লে মনে হওয়ায় সাহস করে এসেছি।"

"এটা কত দাম পেলে বিক্রি করবে?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"এক ভরি আছে। সোনার যা দাম, তাই দিন।"

"সোনার দাম কত?"

মাংরা তার সঙ্গীর দিকে তাকাল। স্পষ্ট হল সে বুঝতে পারছে না অর্জুনকে। তারপর বলল, "আপনি যদি মেমসাহেবদের জিজ্ঞেস করেন, তা হলেই জানতে পারবেন।"

"আজকালকার মেমসাহেবরা সোনার খবর রাখে না।" সে কাঠিটাকে আবার দেখল। তারপর মনে-মনে ভাবছে এমন ভঙ্গি নিয়ে বলল, "জিনিসটা সত্যি সুন্দর। এ রকম গোটা চারেক পেলে ঠাকুরের জন্যে মুকুট তৈরি করতে পারতাম।" কথাগুলো বলতে-বলতেই সে চোখের কোণে তাকিয়ে ছিল। মাংরা আর তার সঙ্গী দৃষ্টি বিনিময় করল। লোক দুটো সত্যিই বুদ্ধিমান। কোনও মন্তব্য করল না। অর্জুন সোনার কাঠি ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "মাংরা ভাই, আজকের রাত্রের জন্যে তুমি দশটা টাকা নিয়ে যাও। কাল সকাল সাতটায় নিয়ে এসো, দিনের আলোয় দেখে তারপর দাম করব।"

মাংরা মাথা নাড়ল, "না সাব, দশ টাকা এখন দিতে হবে না। আমি কাল সকালেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসব।" সোনার কাঠিটা ফেরত নিয়ে দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে সঙ্গীকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। এই সময় একটা গাড়ির হেডলাইট মাঠ দিয়ে ছুটে আসতে লাগল ট্যুরিস্ট লজের দিকে। লজের সামনে পৌঁছেই পেছনের দরজা খুলে কেউ নামল। নেমেই মাংরাকে জিজ্ঞেস করল, "ইয়ে ট্যুরিস্ট লজ হ্যায়?"

"জি মালিক।"

"তুমলোগ কৌন হো ?"

"মুঝে সবকোই মাংরা পুকারতা। বলদেবজী মুঝে আচ্ছাসে জানতা।"

"কৌন বলদেব ?" লোকটি বিরক্তি হল, "ক্যা ফালতু বকোয়াস করতা হ্যায় তুম। যাও, ভাগো ইঁহাসে।" কথা শেষ করে লোকটি বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলেন। ঠিক তখনই লজের ম্যানেজার এসে দাঁড়ালেন সিঁড়ির মুখে। ভদ্রলোক তাঁর দিকে তাকিয়ে নীচ থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "ট্যুরিস্ট লজের ম্যানেজার কোথায় ?"

"আমিই ম্যানেজার।"

"আপনার এখানে ঘর খালি আছে ? আই নিড এ রুম, সিঙ্গল রুম।"

ঠিক তখনই অর্জুন সোজা হয়ে ব[illegible]। লোকটিকে দেখেই চমকে উঠেছে সে। চটপট চেয়ার ছেড়ে ভেতরে চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। লোকটি তখন ম্যানেজারকে কিছু বলতে-বলতে ওপরে উঠে আসছে। মনে হল, তাকে লক্ষ করার অবকাশ পায়নি।

নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় চুপচাপ বসে রইল অর্জুন কিছুক্ষণ। অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেট ধরাল। এটাও কি কাকতালীয় যোগ ? লোকটা নিশ্চয়ই মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে এয়ারপোর্টে গিয়েছিল। ধরা যাক, নিজের কোনও কাজে সেখানে গিয়ে হয়তো মেয়েদের দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু শিলিগুড়ির বাসস্ট্যান্ডে কার খোঁজে যাবে এমন লোক ? আর উত্তর বাংলার এত জায়গা থাকতে এই মালবাজারে রাত্তির বেলায় এসে ট্যুরিস্ট লজে উঠবে কেন ? এমন হতে পারে, বাস ছেড়ে যাওয়ার অনেক বাদে লোকটি খবর পেয়েছিল, চারটে মেয়ে (এই মেয়েদের বর্ণনা মনে রাখতে কারও অসুবিধে নেই), আর একটা ছেলে মালবাজারের বাসে উঠে চলে গিয়েছে। খবর পেয়ে, এখানে চলে আসা অসম্ভব নয়। হয়তো এখনও জানে না কোথায় উঠেছে ওরা ! এমন হতে পারে পথে যে কয়েকটা জায়গা পড়েছে তার সব-ক'টাতেই খোঁজ নিতে-নিতে এসেছে যে, তারা সেখানে নেমেছে কি না। ফলে মালবাজারে পৌঁছতে দেরি হয়েছে। এই সব ভাবনা যদি সত্যি হয় তা হলে লোকটা এখনও জানে না এই ট্যুরিস্ট লজেই মেয়েরা রয়েছে। অবশ্য ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বললেই জেনে যাবে এক মুহূর্তে। এত ঘন ঘন সিগারেট খায় না অর্জুন, তবু সিগারেট শেষ করে উঠে দাঁড়াল। মানুষটার পরিচয় জানা দরকার।

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অর্জুন মাথা নাড়ল। এই লজে যদি ঘর থাকে, তা হলে ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করারও দরকার হবে না। রেজিস্টারে নাম-ঠিকানা লেখার সময় ভদ্রলোক দেখতে পাবেন চারটি মেয়ে দিল্লি থেকে এখানে এসে উঠেছে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে সরু প্যাসেজে দাঁড়িয়ে দু' পাশে তাকাল। ভদ্রলোক ঘর পেলেন কি না বোঝা যাচ্ছে না। সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল মেয়েদের ঘরের দিকে। পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা ঘর থেকে হঠাৎই সেই

বিশ্রী চিৎকার ভেসে এল। অর্থাৎ চারজন একই ঘরে রয়েছে। অর্জুন দরজায় নক্ করল।

হাসি থামছিল না, কিন্তু একটি গলায় প্রশ্ন হল, "হু ইজ দেয়ার ?"

"অর্জুন।"

দরজা খুলল পুনম। খুলে ওকে দেখে খুশি হল, "ও, আপনি ! ওয়েলকাম।"

ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল অর্জুন। চারটে মেয়ে সম্ভবত দুটো বিছানায় ভাগাভাগি করে শুয়েছিল। নন্দিনী ছাড়া বাকি দু'জন উঠে বসেছে, পুনম নন্দিনীর পাশে গিয়ে বসল। অর্জুন দুটো চেয়ারের একটাকে টেনে নিয়ে বলল, "নন্দিনী, আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।"

নন্দিনীর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, "কী ব্যাপার ?"

সঙ্গে-সঙ্গে বাকি তিনজন পরস্পরকে ইশারা করল। অর্জুন বলল, "না, না, আপনারা থাকতে পারেন। সত্যি বলতে কী, কারও বাইরে যাওয়ার দরকার নেই।"

টিনা বলল, "ও জরুরি, কিন্তু প্রাইভেট নয়।"

অর্জুন বলল, "নন্দিনী, আজ এয়ারপোর্টে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনি কথা বলেছেন, তিনি কে ? কীভাবে ওঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হয় ?"

নন্দিনী উঠে বসল, "কেন বলুন তো ?"

"দুটো ঘটনা ঘটেছে। ভদ্রলোক উঠেছেন শিলিগুড়ির একটা নামী হোটেলে। জলপাইগুড়ি থেকে আসতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে আমি ওঁর গাড়িতে লিফ্‌ট নিই। আমরা যখন শিলিগুড়ি থেকে বাসে উঠি, তখন ওই ভদ্রলোক ট্যাকসি নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে আসেন। সেখানে কী করেছেন আমি জানি না, কারণ বাস তখনই ছেড়ে দিয়েছিল। আর-একটু আগে সেই একই ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ে এই ট্যুরিস্ট লজে জায়গা খুঁজতে এসেছেন। তাই আমি ভদ্রলোক সম্পর্কে কৌতূহলী।" অর্জুন একটানা কথাগুলো নন্দিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে গেল।

"ভার্মা-আঙ্কল এই লজে এসেছেন ?" নন্দিনী বিস্মিত।

"হ্যাঁ। এই ভার্মা-আঙ্কল কে ?"

"আমার বাবা এককালে নেপাল এবং বার্মায় এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট বিজনেস করতেন। তখন ভার্মা-আঙ্কল বাবার পার্টনার ছিলেন। আমার মা ওঁকে ঠিক পছন্দ করতেন না বলে আমি এড়িয়ে যেতাম। বাবার সঙ্গে বিজনেস নিয়ে কিছু মত-বিরোধ হতে বাবা বিজনেস বন্ধ করে দিলেন। তারপরও অবশ্য দিল্লিতে গেলে ভার্মা-আঙ্কল আমাদের সঙ্গে দেখা করতেন। ব্যস, এইটুকু।"

"মিস্টার ভার্মা শেষ কবে দিল্লি গিয়েছিলেন ?"

"সপ্তাহখানেক আগে উনি আমাদের দিল্লির বাড়িতে এসেছিলেন।"

"তখন কি আপনার বাবা ওঁকে বলেছিলেন যে, আপনি এ দিকে আসছেন ?"

"আমি জানি না।"

অর্জুন এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কিছু মনে করবেন না, আমি যদি জানতে চাই, আপনার বাবা কী করেন, তা হলে আপনি কি অসন্তুষ্ট হবেন ?"

"না, না। বাবা এখন আর ব করেন না। উনি কোনও কোনও কম্পানিতে টাকা ইনভেস্ট করেন আজকাল।"

"উনি কি মিস্টার ভার্মার কোনও বিজনেসে টাকা দিয়েছেন ?"

"আপনাকে একটু আগে বললাম, বাবার সঙ্গে মিস্টার ভার্মার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাওয়াতে তিনি বিজনেস বন্ধ করে দিয়েছেন। আসলে বাবা ওঁর কাছে অনেক টাকা পান।" নন্দিনী বলল, "সেটা সম্প্রতি আমরা জানতে পেরেছি।"

"কীভাবে ?"

"গত সপ্তাহে যখন ভার্মা-আঙ্কল আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, তখন বাবার সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি হয়। আমি পাশের ঘরে ছিলাম বলে শুনতে পেয়েছিলাম।"

"কী বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল ?"

"বাবা টাকা ফেরত দিতে বলেছিলেন। ভার্মা-আঙ্কল সেটা দিতে চাননি। এই নিয়ে ঝগড়া। টাকার অ্যামাউন্ট আমি জানি না।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনি বলদেব নামে কাউকে চেনেন ?"

"বলদেব ! না তো।"

অর্জুন হাসল, "নন্দিনী, আপনার ভার্মা-আঙ্কলের ব্যাপারস্যাপার আমার ঠিক ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে উনি আপনার সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড।"

"হোয়াট ডু ইউ মিন ?"

"ঠিক বোঝাতে পারব না। হয়তো উনি আপনাকে বিপদে ফেলতে পারেন।"

"হোয়াই ?"

"আমি বিশ্বাস করি, উনি আপনাকে অনুসরণ করছেন। ওঁর সম্পর্কে সাবধান হতে হবে।"

"কীভাবে ?"

"আমার কথা আপনারা শুনবেন ?"

"কী বলছেন, তার ওপর নির্ভর করছে।"

"আজ রাত্রের ডিনার আপনারা যে-যার ঘরেই করুন। আমি বা লজের বেয়ারা ছাড়া আর অন্য কেউ ডাকলে আপনারা দরজা খুলবেন না।"

"বেশ। কিন্তু কাল সকালে কী হবে ?"

pathagar.net

"সকাল হতে এখনও অনেক দেরি আছে।"

"বেশ, তাই হবে।" নন্দিনী মুখ ফেরাল, "গার্লস, শুনলে তো?"

পুনম একটু রাগত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, "হু ইজ দিস ম্যান, যার ভয়ে আমাদের এইভাবে লুকিয়ে থাকতে হবে। এটা খুব সরল প্রশ্ন, তাই না?"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "উত্তরটা নন্দিনী দিতে পারেন। আমরা যদি একটা রাত অপেক্ষা করি, তা হলে ক্ষতি কী।" অর্জুন ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দেখল বেয়ারা প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে আসছে। সে লোকটাকে ডাকল, "শোনো, আজ রাত্রে এই দুটো ঘরে ডিনার এনে দেবে। দিদিমণিরা ডাইনিং রুমে ডিনার খেতে যাবেন না।"

"ঠিক আছে সাব।"

"আর-একটা কথা, মিস্টার রতনলাল গুপ্ত কোন্ ঘরে আছেন?"

"চার।" বেয়ারা চলে যেতে-যেতে ঘুরে দাঁড়াল, "এখানে সাড়ে ন'টার মধ্যে ডিনার খাওয়া হয়ে যায়। আপনি কি ঘরে খাবেন?"

"তুমি আমার ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে যেও।"

"আপনারা কি এখানে কালকে থাকবেন?"

"তাই তো ইচ্ছে আছে।"

বেয়ারা চলে গেলে অর্জুন সতর্ক পায়ে হাঁটতে লাগল। ভার্মা যদি সামনে পড়েন, তা হলে তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলবেন। ফেললে কী করতে পারেন? না, এই রকম জেদের কোনও অর্থ হয় না। ভদ্রলোককে এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

চার নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়াল অর্জুন। দরজা বন্ধ। সে মৃদু টোকা দিল। ভেতর থেকে কোনও সাড়া এল না। অর্জুন হতাশ হল। তবু দ্বিতীয়বার শব্দ করল অর্জুন। এবং তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গেল। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে মিস্টার গুপ্ত বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে একটা খোলা কলম।

"হু আর ইউ? কী দরকার?"

লোকটার গলার স্বর শুনে অর্জুন থমকে গেল। সে বলল, "আপনাকে বিরক্ত করেছি বলে দুঃখিত। ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি।"

"দাঁড়াও। তুমি একটু আগে লাউঞ্জে বসে ছিলে, তাই তো? দিল্লি থেকে এসেছ?"

"প্রথমটা ঠিক। কিন্তু মেয়েরা দিল্লি থেকে এসেছেন, আমি জলপাইগুড়ির ছেলে।"

"ও। কী দরকার?"

"এখন থাক। আপনি সম্ভবত লিখছিলেন, আমি জানতাম না।"

"ভেতরে এসো।" রতনলাল গুপ্ত সরে দাঁড়ালেন দরজা থেকে। ফিরে গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। সেখানে টেবিলের ওপর লাইন-টানা ফুলস্কেপ

Pathagar.net

কাগজ, যার অর্ধেকটা লেখা হয়ে আছে। দরজা ভেজিয়ে বিছানায় একধারে বসল অর্জুন।

রতনলাল বললেন, "তোমাকে 'তুমি' বলছি বলে কিছু মনে করছ ?"

"না, না।"

"গুড। কী নাম তোমার ?"

"অর্জুন। আপনি কি কিছু লিখছেন ?"

"হ্যাঁ। আমার আত্মজীবনী। তোমরা হয়তো হাসবে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের একটা নিজস্ব জীবন আছে। সেই জীবনে নানান গল্প আছে। আমিও ব্যতিক্রম নই। সারা জীবন জঙ্গল আর পাহাড়ে কাটিয়েছি। আমার এক পরিচিত বন্ধুর বন্ধু বাংলা ভাষায় গল্প লেখেন। জঙ্গলের গল্প। তাঁর সঙ্গে একবার লালজির ওখানে আলাপ হয়েছিল। লালজিকে চেনো ? অত বড় জঙ্গল-প্রেমিক খুব কম দেখেছি আমি। তা, তখন সেই সাহিত্যিক আমাকে বলেছিলেন, আমরা তো বাইরে থেকে বেড়াতে এসে যা দেখি, তাই লিখি। আপনারা তো ভেতরে রয়েছেন, একটু-আধটু লিখে ফেললে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারবে সবাই। কথাটা মনে ধরেছিল হে। তাই এখন কলম ধরেছি।" রতনলাল গুপ্ত একনাগাড়ে বলে গেলেন।

অর্জুনের ভাল লাগল মানুষটাকে।

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল, এই রকম ভঙ্গিতে রতনলাল জিজ্ঞেস করলেন, "তা কী কারণে আমার ঘরে আসতে হল, সেটা এখনও বলোনি তুমি ?"

"আমরা যদি আগামীকাল সকালে আপনার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি ?"

"পারবে না।" খুব দ্রুত মাথা নাড়লেন রতনলাল গুপ্ত।

"কেন ?"

"আমি বের হব ভোর পাঁচটায়, যখন পাখি ডাকবে। তোমাদের নিশ্চয়ই তখন মধ্যরাত।"

"না, কাল ভোর পাঁচটায় বেরোতে আমার কোনও অসুবিধা হবে না।"

চোখে চোখ রাখলেন রতনলাল, তারপর সপ্রশংস ভঙ্গি নিয়ে মাথা নাড়লেন।

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "আপনার গাড়িতে আমাদের পাঁচজনের জায়গা হবে কি ?"

"আমার গাড়ি একটা স্টেশন ওয়াগন। এখান থেকে বেরিয়ে একটা গ্যারাজ পাবে বাঁ দিকে। সেখানে সেটা দাঁড়িয়ে আছে। দু'-একটা কাজ ড্রাইভার করিয়ে নিচ্ছে ওখানে। বুঝতেই পারছ, স্টেশন ওয়াগনের পেটে পাঁচজন কিছুই নয়।"

"নমস্কার। তা হলে কালই দেখা হবে।" অর্জুন হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে দরজা ভেজিয়ে দিল। চারপাশ নিস্তব্ধ।

কাঠের এই ট্যুরিস্ট লজে নিশ্চয়ই কেউ চলাফেরা করছে না, হলে শব্দ বাজত। কাল ভোরে যদি চলে যেতে হয়, তা হলে ম্যানেজারকে হিসেব মিটিয়ে দেওয়া দরকার। অর্জুন পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সে ফিরে এল মেয়েদের দরজায়। নন্দিনীর ঘরে মৃদু শব্দ করল। কেউ সাড়া দিল না। দ্বিতীয় বারেও না। অর্জুন আস্তে দরজা ঠেলল। দরজা খুলে গেল। জিনিসপত্র চারপাশে ছড়ানো, কিন্তু ঘরে কেউ নেই। সে বিস্মিত হল। এরা গেল কোথায়? দ্বিতীয় ঘরটিতেও কেউ নেই। ফাঁপরে পড়ল অর্জুন। এমন কথা ছিল না। সে মেয়েদের বারংবার বলে দিয়েছিল ঘর ছেড়ে না বেরোতে। কোথায় খুঁজবে এদের সে? এমন সময় পায়ের আওয়াজ উঠল। অর্জুন দেখল দু' হাতে দুটো ট্রেতে খাবারের প্লেট নিয়ে বেয়ারা আসছে। সে জিজ্ঞেস করল, "এই দুই ঘরের মেমসাহেবদের তুমি দেখেছ? মানে, কোথায় গিয়েছে, জানো?"

"না সাব। খাবার কি ঘরে দিয়ে যাব?"

"হ্যাঁ, দিয়ে ঢেকে রাখো।" অর্জুন ঢ়াল, যতক্ষণ লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে না যায়। সে বাইরের দিকে যাওয়ার সময় ভাবল একটা টর্চ নিয়ে এলে হয়। প্রথমবার ওটার কথা খেয়াল ছিল না। তার সুটকেসের কোণে একটা টর্চ তো থাকার কথা। অর্জুন উলটো দিকে ফিরল। নিজের ঘরের দরজা টানা ছিল। বাইরে থেকে। কিন্তু সেটা এখন ভেতর থেকে বন্ধ। অর্জুন নক্ করতেই নন্দিনীর গলা পাওয়া গেল। সে জানতে চাইছে কে এসেছে। অর্জুন গম্ভীর গলায় বলল, "খুলুন, আমি।"

টিনা দরজা খুলতেই নন্দিনী বলল, "স্যরি। আপনাকে না জানিয়ে এই ঘর দখল করেছি।"

অর্জুন দেখল, দুটো খাটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে মেয়েরা তাস খেলছে। সে খুব বিরক্ত হল, "আপনারা কাজটা ঠিক করেননি। আপনাদের অনুরোধ করেছিলাম ঘর থেকে না বেরোতে।"

"ঘর থেকে বেরিয়ে ঘরে ঢুকেছি।"

"নিজেদের ঘরে ফিরে যান, আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে।"

নন্দিনী উঠে বসল, "লুক মিস্টার মহাভারত! আপনি তখন থেকে এমন ব্যবহার করছেন যেন আমরা বেড়াতে আসিনি, কোনও ক্রিমিনালের ডেরায় ঢুকে পড়েছি। আমি এখনই ভার্মা-আঙ্কলের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করছি, কেন তিনি আমাদের অনুসরণ করছেন বা আদৌ করছেন কি না?"

"উনি স্বীকার করবেন বলে মনে করছেন?"

"অস্বীকার করলে সব সমস্যা মিটে গেল।"

অর্জুন হাসল, "আপনি আমাকে বোঝার চেষ্টা করুন। আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। তাই একটা বিকল্প ব্যবস্থা করেছি। আপনারা তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়ুন। কাল ভোর সাড়ে চারটের মধ্যে সবাই উঠে

পড়ব। ঠিক পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে এই লজ ছেড়ে সামনের একটা গ্যারাজে যাব। পাঁচটায় গাড়ি ছাড়বে। পরিষ্কার?"

টিনা প্রায় চিৎকার করে উঠল, "ইম্‌পসিব্‌ল! আমি অত সকালে উঠতেই পারব না।"

"এটা আপনাদের ওপরে নির্ভর করছে। চেষ্টা করলে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়।"

নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, "আমরা কেন চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছি?"

"আমরা যে চলে যাচ্ছি, তা মিস্টার ভার্মাকে জানতে দিতে চাই না।"

"উনি জানেন যে, আমরা এখানে রয়েছি?"

"জানাটা অস্বাভাবিক নয়।"

নন্দিনী তার পকেট থেকে একটা পার্স বের করে চারটে একশো টাকার নোট এগিয়ে ধরল, "তা হলে পেমেন্ট করে দিন।"

"এত লাগবে না।"

"ব্যালান্সটা রেখে দেবেন। খরচ তো আপনিই করবেন। আমার কাছে টাকা আছে, যখন প্রয়োজন হবে চেয়ে নেবেন।"

"টাকাটা আপাতত আপনাকে দিতে হবে না। মিস্টার রায় যে খামটা আপনার হাতে পাঠিয়েছেন, তাতে কিছু টাকা আছে। অবশ্য সেটা মিস্টার অমল সোমের পারিশ্রমিক। আপাতত আমি সেখান থেকেই খরচ করছি। যান, নিজেদের ঘরে চলে যান।"

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মেয়েরা একে একে উঠে যেতেই, বেয়ারা খাবার নিয়ে এল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ম্যানেজার সাহেব কোথায়?'

"দু' নম্বর ঘরে।"

"দু' নম্বরে কে আছেন?"

"ওই যে, এক সাহেব একটু আগে এলেন।"

"ঠিক আছে, কিন্তু ম্যানেজার সাহেবকে এখনই আমার একটু দরকার।"

"ডেকে দেব?"

"দাও।"

খাবার ঢাকা দিয়ে বেয়ারা চলে গেলে অর্জুন খাম থেকে টাকা বের করে ঘরের বাইরে পা দিল। বেয়ারার পায়ের শব্দ অনুসরণ করে সে দোতলায় চলে এল। দু' নম্বর ঘরের দরজায় বেয়ারা মৃদু শব্দ করল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা গর্জন ভেসে এল। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কেউ চিৎকার করেই দরজা খুলে চোস্ত হিন্দিতে ধমক দিল, "কী চাই এখানে? এত বার বলে দিলাম ম্যানেজারকে, কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। কেন এসেছ, কী চাই?"

এই সময় ম্যানেজার ছুটে এলেন, "আরে কী হয়েছে? কেন দরজায় নক্ করছ?" তারপর ঘরের দিকে ফিরে বললেন, "আই অ্যাম সরি মিস্টার পুরি।

আর এমন হবে না।"

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আর কিছুটা দূরে দাঁড়ানো অর্জুন হতভম্ব। মিস্টার পুরি ? সে কি ঠিক শুনল ? অসম্ভব। সে স্পষ্ট দেখেছে মিস্টার ভার্মাকে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসতে। কিন্তু ততক্ষণে বেয়ারা ম্যানেজারকে বোঝাচ্ছে, কেন সে দু' নম্বরের দরজা নক্ করেছিল। ম্যানেজার অর্জুনকে দেখে নিয়ে বেয়ারাকে বললেন, "দু' নম্বর ঘরে কেউ যেন আজ রাত্রে না যায়।" তারপর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এনি প্রব্লেম ?"

অর্জুন এগিয়ে এল, "আমি বিল ক্লিয়ার করতে চাই।"

"কেন ? আপনারা কাল ব্রেকফাস্ট নেবেন না ?"

"না।"

ম্যানেজার আর কথা বাড়ালেন না, "আসুন

ভদ্রলোককে অনুসরণ করল অর্জুন। খাতা বের করে ম্যানেজার বিল কাটলেন। টাকা মিটিয়ে দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওই ভদ্রলোক অত বিরক্ত হলেন কেন ?"

কাঁধ ঝাঁকালেন ম্যানেজার, "মানুষের ধরন এক-এক জনের এক-এক রকম।"

"কী নাম ভদ্রলোকের ?" অর্জুন খাতা দেখল প্রশ্ন করেই। ম্যানেজার জবাব দেবার আগেই সে নাম পড়ে নিয়েছে, এস এম পুরি, পাটনা।

"উনি কি এখনই এলেন ?"

"হ্যাঁ, এই একটু আগে।"

অর্জুন তার আগের নামটি পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগে ম্যানেজার খাতাটা বন্ধ করে দিয়েছেন। বেশি কৌতূহল দেখানো এক্ষেত্রে সমীচীন হবে না ভেবে অর্জুন সরে এসে লাউঞ্জে দাঁড়াল। তার দৃঢ় বিশ্বাস হল, ভার্মাই এখানে নাম পালটেছেন। এবং যদি কোনও লোকের বদ মতলব না থাকে, তা হলে সে নাম পালটায় না।

অন্ধকার মাঠ, দূরের হাইওয়ের আলো, মাঝে-মধ্যে ছুটে যাওয়া লরির হেডলাইট দেখতে দেখতে অর্জুনের এক-ধরনের অস্বস্তি শুরু হল। মাংরা লোকটা সোনা বিক্রি করতে এসেছিল। এবং এখন চোখ বন্ধ করেই বলা যায়, সোনাটা মাংরার পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। অর্থাৎ, এই রকম 'মাংরা'-দের পেছনে কেউ আছেন, যাঁর সোনা পালটে টাকা পাওয়া দরকার। অবশ্যই এই সোনা কালো পথে পাওয়া, তাই ন্যায্য দামে বিক্রি করার সাহস তাঁর নেই। কিন্তু মাংরাদের তিনি সংগঠিত করলেন কী করে, এটাই ভাবার কথা। কাল সকালে এখানকার পাট চুকিয়ে চলে গেলে এই ব্যাপারটার সঙ্গেও তার সম্পর্ক চুকে যাবে। অর্জুন ঠিক করল, জলপাইগুড়িতে ফিরে গিয়ে অমল সোমকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলবে। যদি তখনও খুব দেরি না হয়ে যায়, তখন নিশ্চয়ই

অমলদা অনুসন্ধান করতে পারেন।

অর্জুন সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল। বাঁ দিকে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে। লজের আলো ওর গায়ে পড়েছে। ট্যাক্সির ভেতরে কেউ নেই। কিন্তু নম্বরের প্লেটটা ভাল করে দেখে অর্জুন লজের দিকে তাকাল। না, আর কোনও সন্দেহ নেই, ভার্মাই লজে এসেছেন। এই ট্যাক্সি তাদের নিয়ে এয়ারপোর্ট ছুটেছিল, এটাই শিলিগুড়ির বাসস্ট্যান্ডে গিয়েছিল।

অর্জুন অন্ধকার মাঠের ভেতর দিয়ে হাইওয়ের দিকে হাঁটতে লাগল। বাসস্ট্যান্ডে এখন কোনও মানুষ [illegible]। এমন কি, চায়ের দোকানের ঝুপড়িগুলো পর্যন্ত ঝাঁপ-ফেলা। অর্জুন হাইওয়ে ধরে শহরের দিকে হাঁটতে লাগল। গ্যারেজের মুখে হ্যাজাক জ্বলছে। স্টেশন ওয়াগনটাকে নজরে পড়ল, এটি রতনলাল গুপ্তর বাহন নিশ্চয়ই। গ্যারাজের পাশেই একটা লাইন হোটেল। এ রকম জায়গায় বলদেব নামের লোকটার খবর পাওয়া যেতে পারে, যে মাংরো আর ভার্মাসাহেবের মধ্যে সংযোগ রেখে চলে।

গোটা পাঁচেক লোক বেঞ্চিতে বসে খাচ্ছিল। এ সব জায়গায় দিশি-বিদেশি পানীয় রাতের অন্ধকারে প্রকাশ্যেই বিক্রি হয়। বেশির ভাগ খদ্দেরই ড্রাইভার। দূর-পাল্লার লরি থামিয়ে তারা খাওয়া-দাওয়া করতে আসে। অর্জুন ঢুকতেই একটা বাচ্চা ছেলে ছুটে এল, "বলিয়ে সাব।" এবং তখনই সে সেই ড্রাইভারকে দেখতে পেল। মন দিয়ে রুটি-মাংস খাচ্ছে। অর্জুন ছেলেটাকে হাত নেড়ে 'না' বলে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল। লোকটা আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে খাবারে মন দিতে গিয়ে আবার মুখ ফেরাল, "খুব চেনা লাগছে।"

অর্জুন হেসে সিগারেট ধরাল, "আজ আপনার গাড়িতে আমি এয়ারপোর্ট-এ গিয়েছিলাম।"

লোকটার মনে পড়ল, 'ওহো! হ্যাঁ। আসলে এত প্যাসেঞ্জার রোজ তুলি, কিন্তু আপনি এখানে? কখন এলেন?"

"এই তো একটু আগে। আপনি ভাড়া নিয়ে এসেছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ। একটা বড় পার্টি পেয়েছি। সেই ভদ্রলোক—যিনি এয়ারপোর্ট গিয়েছিলেন। এখন ডেইলি বেসিসে গাড়ি নিয়েছেন, পেট্রল-মবিল ওঁর।"

"শিলিগুড়ি থেকেই চলে এলেন?"

"না। এখানে-ওখানে উনি কাজ মেটাতে মেটাতে আসছেন।"

"ব্যবসায়ী?"

"তাই মনে হয়।" ড্রাইভার খেতে খেতে বলল, "আমি তো বুঝতেই পারছি না, কী কাজ। প্রায়ই গাড়ি দাঁড় করিয়ে, দশ মিনিট থেকে আধ ঘণ্টার জন্যে উধাও হয়ে যান। আমাকে অবশ্য অ্যাডভান্স দিয়েছেন, টাকা মার যাওয়ার কোনও ভয় নেই।"

"এখান থেকেই ফিরে যাবেন?"

"জানি না ভাই। বলেছেন গাড়িতেই শুতে। হুট করে নাকি প্রয়োজন হতে পারে।"

অর্জুন বুঝল, লোকটাকে ভার্মাসাহেব অন্ধকারে রেখেছে। এর কাছে নতুন কোনও খবর পাওয়া যাবে না। হঠাৎ লোকটা জিজ্ঞেস করল, "আপনি কিছু খাবেন না?"

"নাঃ, আমি একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। লোকটাকে আমি চিনি না, নামটা জানি, বলদেব—এ রকম নামের কোনও লোককে এখানে দেখেছেন? মানে, কেউ যদি ডেকে থাকে নাম ধরে।" অর্জুন আন্দাজে একটা ঢিল ছোঁড়ার চেষ্টা করল।

ড্রাইভার মাথা নাড়ল, "না, আমি শুনতে পাইনি। বলদেব কি পাঞ্জাবি?"

"হ্যাঁ।'

"না, কোনও পাঞ্জাবিকে তো এখানে আমি আসার পর দেখিনি।"

অর্জুন মাথা নাড়ল। তারপর, "আচ্ছা, চলি," বলে উঠে এল বাইরে।

ভোর সাড়ে চারটের সময় দরজায় শব্দ হতে ঘুম ভেঙে গেল অর্জুনের। বিছানায় শুয়েই সে সময়টা দেখল, তারপর তড়াক করে উঠে পড়ল। এই সময় দ্বিতীয়বার শব্দ হল। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে অবাক হল। নন্দিনী দাঁড়িয়ে আছে বাইরে বেরোবার পোশাকে তৈরি হয়ে। হেসে বলল, "মিস্টার মহাভারাতা, আর মাত্র আধঘণ্টা দেরি আছে।"

"অনেক ধন্যবাদ। আমি এখনই তৈরি হয়ে নিচ্ছি।" অর্জুন ব্যস্ত হল।

"আমরা চারজনই তৈরি। যদি অনুমতি দেন, তা হলে এখনই বেরিয়ে পড়তে পারি। গাড়িটা গ্যারাজে থাকবে বলেছিলেন, গ্যারাজটা কোন দিকে?"

অর্জুন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। এখনও পৃথিবী জুড়ে ঘন অন্ধকার। সে মাথা নাড়ল, "একটু অপেক্ষা করুন। বাইরে এখনও আলো ফোটেনি, আমরা একসঙ্গে যাব।"

"আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন। আমরা যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক। বয়সটা কোনও ফ্যাক্টর নয়। তা ছাড়া আমি ক্যারাটে জানি।"

"খুবই ভাল কথা। তবু জায়গাটা আপনাদের অচেনা। আলোও নেই। পথ গুলিয়ে ফেললে মিস্টার রতনলাল গুপ্ত আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন না।"

"রতনলাল গুপ্ত?"

"কাল রাত্রে লাউঞ্জে বসে ছিলেন যে ভদ্রলোক।"

"আচ্ছা! আমরা তাঁর গাড়িতে যাচ্ছি? উনি কোথায়?"

"আমাদের সঙ্গে গাড়িতেই ওঁর দেখা হবে।"

নন্দিনী হাসল, "আপনি সত্যিই বুদ্ধিমান। তৈরি হয়ে নিন।"

boighar.net

পাঁচটা বাজতে দশে অর্জুন মেয়েদের নিয়ে বের হল। সে প্রত্যেককে সাবধান করে দিয়েছিল, যাতে কাঠের মেঝেতে পায়ের শব্দ না হয়। কোনও অতিথির ঘুম ভাঙাতে চায় না সে। ধীরে ধীরে ওরা লাউঞ্জের মুখে চলে এল। একটা হলদেটে বাল্‌ব জ্বলছে লাউঞ্জের মুখে। লজের কেউ জেগে আছে বলে মনে হচ্ছে না। অর্জুন চাপা গলায় বলল, "আমি আগে লাউঞ্জ পার হয়ে যাচ্ছি। আপনারা পর-পর নিঃশব্দে চলে আসুন।"

অর্জুন গিয়ে ট্যাক্সির পিছনে দাঁড়াল। ভেতরের সিটে ড্রাইভার চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ট্যুরিস্ট লজটাকে এখন ভৌতিক বাড়ি বলে মনে হচ্ছে। হঠাৎ একটি ঘরে আলো জ্বলে উঠল। ওটা ক[illegible]ক্ষের ঘর, বুঝতে পারছে না অর্জুন নীচ থেকে। যদি মিস্টার ভার্মা জেগে ওঠেন, তা হলে এই চুপিসাড়ে চলে যাওয়ার কোনও মানে থাকবে না। অর্জুন প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করেই লক্ষ করল, মেয়েরা একে একে নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল। সে আর দাঁড়াল না। ঠোঁটে একটা শব্দ করে এগিয়ে গেল অন্ধকার মাঠের দিকে। মেয়েরা আসছে পেছনে। কেউ কোনও কথা বলছে না। সম্ভবত অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছে ওরা। বাসস্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছানো মাত্র অর্জুনের কানে মোটরবাইকের আওয়াজ ভেসে এল। মোটরবাইক আসছে শিলিগুড়ির দিক থেকে। সাধারণত এত রাত্রে—যেহেতু এখনও অন্ধকারই, তাই রাতই বলা উচিত—কেউ ডুয়ার্সের রাস্তায় মোটরবাইক চালায় না। অবশ্য কাছেপিঠের চা-বাগান থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনে কেউ ওই সময় বেরোতে পারে। ওরা হেডলাইটের আলো দেখতে পেল। পিচের রাস্তা আলোকিত করে ছুটে আসছে। অর্জুন মেয়েদের ইশারা করল চায়ের দোকানের ঝুপড়ির পেছনে দাঁড়াতে। মোটরবাইকটা হাইওয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলে আবার হাঁটা শুরু করবে ওরা। অন্তত ওর হেডলাইটের আলোয় নিজেদের আলোকিত করার কোনও মানে হয় না। দূর থেকেও জেগে-থাকা কেউ সেটা দেখে বুঝতে পারবে।

মোটরবাইকটার স্পিড কমতে লাগল। শেষ পথটুকু বরাবর আলোকিত করে সেটা নেমে এল হাইওয়ে থেকে, মাঠের ভেতরে ঢুকে সোজা ট্যুরিস্ট লজের সামনে গিয়ে থামল।

অর্জুন অবাক হল। এই ভোরের আগে কে এল লজে মোটরবাইক চালিয়ে? পাশ দিয়ে লোকটা যখন মাঠে নামল, তখন স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে ওর সঙ্গে কোনও জিনিসপত্র নেই। তা হলে এখনই কী প্রয়োজন পড়তে পারে? এই সময় পুনম বলল, "আমাদের কি দেরি হয়ে যাচ্ছে? পাঁচটা বাজতে আর মাত্র দু' মিনিট বাকি আছে।"

ওরা দৌড়তে লাগল। হাইওয়েতে পায়ের শব্দ বাজল। পুবের আকাশ একটা নীল ছোপ মাখতে আরম্ভ করেছে। গ্যারাজের বাইরে দাঁড়িয়েছিল গাড়িটা। তার গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল এক নেপালি ড্রাইভার।

অর্জুন তার সামনে পৌঁছে বলল, “মিস্টার গুপ্ত এখনও আসেননি ?”

ড্রাইভার জবাব দেবার আগেই পেছন থেকে গলা শোনা গেল, “গুড মর্নিং।”

ওরা পাঁচজন পেছন ফিরে দেখল একটা বড় ব্রিফকেস হাতে নিয়ে মিস্টার গুপ্ত আসছেন। তিনি যখন গাড়ির সামনে এলেন, তখন কাঁটায়-কাঁটায় পাঁচটা। রতনলাল গুপ্ত আবার বললেন, “গুড মর্নিং এভরিবডি।”

মেয়েরা প্রায় একই সঙ্গে জানান দিল, “গুড মর্নিং।”

রতনলাল বললেন, “কাঞ্ছা, পেছনের দরজা খুলে দাও, এঁরা আমাদের সঙ্গে যাবেন।” তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসলেন, “খুব অবাক হয়ে গেলাম। ইয়ং লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান যে এত সময়-মাফিক বিছানা ছেড়ে উঠে আসবে, তা আমি ভাবিনি।”

মেয়েরা হাসল। অর্জুন কিছু বলল না।

স্টেশন-ওয়াগনটা একটু নিজস্ব ধরনের। ড্রাইভারের সিটের পাশে দু'জন বসতে পারে। পেছনে ড্রাইভারের দিকে মুখ ফেরানো সিটে বারোজনের অবলীলায় বসে যেতে কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়। রতনলাল মেয়েদের দু'জনকে সামনে বসতে, বললে নন্দিনী আর চিঙ্কি সেখানে উঠে পড়ল। পেছনের সিটের মাঝখানে বসল অর্জুন। দুটো মেয়ে দু' দিকের জানালায়। স্টেশন-ওয়াগনের আরও পেছনে জিনিসপত্র স্তূপ হয়ে রয়েছে। গাড়ি ছাড়ল।

সবে ভোর হচ্ছে। সূর্যদেব এখনও দেখা দেননি। কিন্তু অন্ধকার ফরসা হতে আরম্ভ করেছে। হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে স্টেশন-ওয়াগন। দু' পাশের গাছগুলো থেকে অন্ধকার মিলিয়ে যাচ্ছে। অর্জুন পেছনে তাকাল। সূর্য ওঠার আগের আলোয় মায়াবী হয়ে শূন্য রাজপথ পড়ে আছে। কাউকে সে অনুসরণ করতে দেখল না। রতনলাল গুপ্ত হাসি-হাসি মুখে বসে আছেন। নন্দিনী ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, “এই সব নদী কি বর্ষার সময় ফেরোসাস হয়ে যায় ?”

স্টেশন-ওয়াগন তখন একটা শুকনো নদীর ওপর পাতা ব্রিজ পেরিয়ে ছুটছিল। রতনলাল বললেন, “মাই ডিয়ার ইয়ং লেডিস, যদি অনুমতি দাও তা হলে বলি, বর্ষাকালে এই সব নদীর চেহারা সুন্দর হয়ে যায়। এখন তো হাড়-জিরজিরে, নুড়ি আর পাথরের ফাঁকে তিরতিরে জল। দেখলেই মন খারাপ হয়ে যায়।”

চালসা পেরিয়ে খুনিয়ার মোড়ে পৌঁছনো মাত্র সূর্যদেব দেখা দিলেন। গাড়ি থামাতে বললেন রতনলাল, “বাঁ দিকের রাস্তাটা দ্যাখো কী সুন্দর। দু' পাশে ঘন জঙ্গল আর মাঝখানে সরু পিচের রাস্তাটা চলে গেছে ঝালং বিন্দু পর্যন্ত। জলঢাকা হাইড্রো-ইলেকট্রিক্যাল প্রজেক্ট সেখানে। এই জঙ্গলটার নাম চাপড়ামারি।”

অর্জুন নামটা কানে যাওয়ামাত্র সোজা হয়ে বসল, “আরে, আমাদের তো

এখানেও থাকার কথা ছিল। চাপড়ামারি ফরেস্ট বাংলো।"

রতনলাল গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে এখন তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে ?"

মেয়েরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। অর্জুন বলল, "হলং-এ।"

"হলং তো ফুন্টসিলিং-এর মুখে। যাওয়ার পথে নামিয়ে দিতে পারি।"

অর্জুন চিন্তায় পড়ল। শিলিগুড়ির ট্যুরিস্ট ব্যুরোর ভট্টাচার্যদা বলেছিলেন চাপড়ামারি, গরুমারা এবং হলং-এ তাদের জন্য ব্যবস্থা থাকবে। যত দূর মনে হচ্ছে, কথা ছিল মালবাজারেই খবরটা পাওয়ার। কিন্তু ম্যানেজার তো কিছুই জানাননি এ-ব্যাপারে। যদি এমন হয় উনি ভেবেছেন...যা ভাবুন তিনি, লিফ্‌ট যখন পাওয়া, গিয়েছে একেবারে হলং [illegible] যাওয়া যাক।

পথে বিনাগুড়ি নামের একটা জায়[illegible] গাড়ি থেমেছিল। চা খাওয়া হল। অর্জুন আশ্বস্ত হল এই কারণে যে, জায়গাটা চোখে পড়ার মতো নয়। চার-পাঁচটা দোকান দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না কারও।

নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, "ডুয়ার্স কি এটাকেই বলে ?"

রতনলাল বললেন, "হ্যাঁ। জঙ্গল, নদী, চাযের জমি নিয়েই ডুয়ার্স।"

বীরপাড়ার পাশ দিয়ে মাদারিহাট হলে এল গাড়িটা। রতনলাল জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের কোথায় ব্যবস্থা হয়েছে ? বাইরের বাংলোটাকে বলে 'মাদারিহাট ফরেস্ট বাংলো' আর জঙ্গলের ভেতরে ছয় কিলোমিটার গেলে 'হলং রেস্টহাউস'।" বলতে বলতে গাড়িটা একটা গেটের সামনে দাঁড়াল। এখানে রাস্তা বাঁক নিয়েছে। ডান দিকে ঝিঁঝি ডেকে চলেছে ছায়া-ছায়া জঙ্গলে একটানা। কেমন রহস্যময় চার ধার। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা নুড়ির রাস্তা চলে গেছে। তারই মুখটি পোল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে, যাতে বিনা অনুমতিতে কেউ প্রবেশ করতে না পারে। এক পাশে পাহারাদারদের ঘর। একজন লোক গাড়ি থামতেই বাইরে এসেছিল। রতনলাল অর্জুনকে বললেন, "ওখানে গিয়ে অনুমতি নাও ভেতরে যাওয়ার জন্যে।"

অর্জুনের হাঁটতে ভাল লাগল। সে এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, "হলং কি এই রাস্তায় যাব ?"

লোকটা মাথা নাড়ল, "রেস্ট হাউসে থাকবেন ?"

"হ্যাঁ।"

"পাশ দিন। খাতায় এনট্রি করতে হবে।"

"পাশ ? আমাদের সঙ্গে তো পাশ নেই। ট্যুরিস্ট অফিসার বলেছেন এখানে আমাদের ব্যবস্থা থাকবে।"

এই সময় রতনলাল গুপ্ত নেমে এলেন। তাঁকে দেখামাত্র লোকটি কপালে হাত ঠেকাল। রতনলাল বললেন, "এদের জন্য ব্যবস্থা আছে। পরে খাতায় নোট করো। এখন গেট খুলে দাও, আমার তাড়া আছে।"

pathagar.net

লোকটা চটজলদি গেট খুলে দিল। নন্দিনী বলল, "আপনাকে তো ও বেশ খাতির করে। একটুও প্রতিবাদ করল না।"

রতনলাল বললেন, "দীর্ঘকাল এক সঙ্গে থাকলে গাছেরাও বন্ধু হয়ে যায়।"

দু' পাশে জঙ্গল, নুড়ি বিছানো পথ, পাখির ডাক আর মাঝে-মাঝে বাঁদরের দর্শন, বেশ ভাল লাগল হুলং-এ পৌঁছতে। এবার ডান দিকে পর-পর কয়েকটা কাঠের বাড়ি, কোয়ার্টার্স এবং বনবিভাগের সাইনবোর্ড। দু'জন ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে আসছিলেন। রতনলাল তাঁদের দেখে গাড়ি থামাতে বললেন। ওঁরা থেমে গিয়ে কৌতূহলী চোখে তাকাতে নলাল গাড়ি থেকে নামলেন, "নমস্কার, মিস্টার বিশ্বাস। ভাল তো? জঙ্গলের খবর কী?"

"ভাল।" মিস্টার বিশ্বাস এগিয়ে এলেন। অল্প বয়স, সুন্দর চেহারা।

"আমার কিছু তরুণ বন্ধু এসেছেন। শিলিগুড়ির ট্যুরিস্ট অফিসার কথা দিয়েছেন জায়গা করে দেবেন।"

মিস্টার বিশ্বাস বললেন, "তিনটে ঘর তো? টেলিফোন পেয়েছি। রুম নম্বর পাঁচ ছয় সাত আপনাদের জন্যে অ্যালট করা আছে।" শেষ কথাগুলো অর্জুনের দিকে তাকিয়ে, "আপনারা চেক ইন করে যান, পরে খাতায় সই করবেন।"

রতনলাল বললেন, "ইনি রেঞ্জার, এখানকার কর্তা।"

মিস্টার বিশ্বাস বললেন, "কী যে বলেন। আপনার মতো জঙ্গলকে যদি ভালবাসতে পারতাম, তা হলে গর্বিত হতাম।"

"ভাই, জঙ্গলে চাকরি করতে গেলে জঙ্গলকে ভালবাসতেই হবে। কিছু দিন থাকলে অবশ্য জঙ্গল আপনাকে জোর করে ভালবাসবে। ইনি কে?"

"ওহো, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মিস্টার আহমেদ। থানার চার্জ নিয়ে জয়েন করেছেন। আর ইনি রতনলাল গুপ্ত। এঁর পরিচয় কি আপনি শুনেছেন মিস্টার আহমেদ?"

পুলিশ অফিসার যে এমন রূপবান হয়, তা অর্জুনের জানা ছিল না। মিস্টার আহমেদ দু' হাত যুক্ত করে নমস্কার করলেন, "অবশ্যই। আমি এর আগে লাটাগুড়িতে ছিলাম। তখন উনি লালজির সঙ্গে গরুমারা ফরেস্টে গিয়েছিলেন।"

রতনলাল বললেন, "হ্যাঁ। আমারও মনে পড়েছে। আপনার চেহারা একবার দেখলে ভোলা সম্ভব নয়। তা এখানকার খবর কী?"

মিস্টার বিশ্বাস বললেন, "এখন আমাদের নিরাপদে রাখার দায়িত্ব মিস্টার আহমেদের ওপর। জানেন তো, আমরা এখন কী রকম আতঙ্কে আছি!"

রতনলাল কিছু বললেন না। গাড়ি একটা সাঁকো পেরিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। দু' পাশে ঘন জঙ্গল। ডান দিকে আর-একটা রাস্তা বেঁকে গিয়েছে। সোজা পৌঁছে গেল গাড়িটা লন পেরিয়ে বাংলোর নীচে। গাড়ি থেকে নেমে পুনম চেঁচিয়ে উঠল, "বিউটিফুল।"

সত্যিই সুন্দর। অর্জুনও মুগ্ধ হয়ে গেল। ছবির মতো তিন তলা কাঠের বাংলো। বাংলো থেকে কিচেনে যাওয়ার জন্যে একটা ঘেরা প্যাসেজ। ও পাশে লনের শেষে একটা ছোট্ট ঝরনা। ঝরনার গায়েই সুন্দর একটা ঘাসের মাঠ, যার মাঝখানে নুনের মাটি রাখা হয়েছে জন্তু-জানোয়ারের স্বাদ পালটানোর জন্যে। আর চার পাশের ঘন জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে পাখির চিৎকার, ঝিঁঝির টানা শব্দ। দু'জন বেয়ারা ছুটে এসেছিল গাড়ির শব্দ শুনে। নন্দিনী তাদের বলল "রুম নম্বর পাঁচ, ছয় আর সাত।"

লোক দুটো ইতস্তত করছিল, কাগজ ছাড়া সম্ভবত এখানে ঘর দেওয়া হয় না। অর্জুন বলল, "রেঞ্জার সাহেব আমাদের নম্বরটা বলে দিয়েছেন।"

এবার কাজ হল। মেয়েরা রতনলালের কাছে বিদায় নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে তিনি বললেন, "চলি ভাই, আমার .টু দেরিই হয়ে গিয়েছে।"

অর্জুন বলল, "আপনি আমাদের খুব উপকার করলেন। আপনার সাহায্য না পেলে এত তাড়াতাড়ি আরামে এখানে পৌঁছতে পারতাম না।"

রতনলাল হাত তুলে ওকে থামতে বলে গাড়িতে উঠে বসলেন। তারপর মুখ বের করে বললেন, "আমার সন্দেহ, কোনও ঝামেলা এড়াতেই তোমরা এত ভোরে মালবাজার ছেড়ে এসেছ। আমি জানতে চাই না সেটা কী! কিন্তু ইফ এনি প্রবলেম সোজা ফুন্টশিলিং-এর কাফে দ্য মাউন্টেন-এ আমার খোঁজ ক'রো।"

অর্জুন দেখল, গাড়িটা বেশ দ্রুতই বাংলোর লন থেকে বেরিয়ে গেল। তার স্যুটকেস বেয়ারা তুলে নিয়ে গিয়েছে। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল সে। দোতলায় বাঁক নেবার মুখে অর্জুন এক ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেল। খোলা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রমহিলার পরনে পা-ঢাকা ম্যাক্সি। কিন্তু দৃষ্টি অদ্ভুত। এমন দৃষ্টি বড় একটা চোখে পড়ে না। যেন এক্স-রে আই দিয়ে বুকের হাড় পর্যন্ত দেখে নিচ্ছেন। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অর্জুন তিন তলায় উঠে এল। পাঁচ-ছয় নম্বর ঘর দুটি মেয়েরা দখল করে নিয়েছে। সাত নম্বরের সামনে বেয়ারাটি দাঁড়িয়েছিল। অর্জুনকে দেখামাত্র কপালে হাত ঠেকাল, "ব্রেকফাস্ট লাগবে স্যার?"

"কী পাওয়া যাবে?"

"টোস্ট, ওমলেট, ফিশ ফ্রাই, চা।"

"সাবাস! জলদি করো! পাঁচ, ছয়, সাত নম্বরের জন্যে।"

অর্জুন ঘরে ঢুকল। এটিও ডাবল-বেড রুম। বাথরুম চমৎকার। পাখা, আলো আছে। বিছানা ধবধবে। আর কী চাই? জুতো পরেই শুয়ে পড়ল অর্জুন। এখন অন্তত এই সকালটায় মেয়েদের বিশ্রাম করা উচিত। কাল অত রাত অবধি জাগার পর আজ রাত থাকতেই তৈরি হয়েছে সবাই। ক্লান্ত না হয়ে কেউ পারে?

এখন তার বন্ধ চোখের পাতায় পর-পর অনেকগুলো মুখ। ভার্মা কি তাদের খোঁজ পাবেন ? না, কোনও চান্স নেই। তারা মালবাজার থেকে ট্রান্সপোর্ট ভাড়া করলে তবু একটা সুযোগ থাকত। লোকটাকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। যদি দিল্লির ব্যবসায়ী হয়, তা হলে নর্থ বেঙ্গলের গরিবদের মধ্যে সোনা ছড়াতে আসবে কেন ? আর ট্যুরিস্ট-লজের পুরি নামের লোকটাই বা কে ? অমন মেজাজ দেখাতে গেলেন কেন বেয়ারার ওপর। ঘরের দরজা বন্ধ করে ভদ্রলোক কী করতে পারেন ? ভোরের মোটরবাইক-আরোহী কার কাছে এসেছে ? যদি ওঁদের দু'জনের একজন হয় তা হলে কি তিনি মিস্টার পুরি ? এ ক্ষেত্রে ভার্মার ওপর থেকে সন্দেহ তুলে [illegible] হয়।

অর্জুন ঘুমিয়ে পড়েছিল। বেয়ারার ডাকে ঘুম ভাঙল। লোকটা ব্রেকফাস্টের ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে মুখ ধুয়ে এসে ব্রেকফাস্ট খেল। পরিমাণ কম নয়। মুখ তুলে জানালা দিয়ে তাকাল। এক-পাল হনুমান ঝরনার ও পারের ঘাসের জঙ্গলে বসে আছে। একজন বসেছে নুনের ঢিবির ওপর। যেন সে সভাপতি, আর তার বক্তৃতার শ্রোতা সবাই। দৃশ্যটি বড় ভাল লাগল। অর্জুনের ঘুমের রেশটা তখনও কাটেনি। সে আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিল জুতো খুলে। সেটা খোলামাত্র বেশ আরাম হল।

চারটে মেয়ে একঘরে বসেই ব্রেকফাস্ট করল। জঙ্গলের এত ভেতরে এমন ভাল খাবার ওরা মোটেই আশা করেনি। নন্দিনী বলল, "চল, একটা চক্কর দিয়ে আসি।'

টিনা চশমা ঠিক করতে করতে বলল, "আমাদের গাইড কী বলে দ্যাখো।"

চিঙ্কি ঠোঁট বাঁকাল, "আমরা বাচ্চা নাকি ? এমনিতে মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙাল ফালতু ভয় দেখিয়ে। আমরা এখানে কোনও বিপদে পড়ব না। শুধু জঙ্গলের বেশি ভেতরে না গেলেই হল।"

চারজন ঘর থেকে বেরিয়ে অর্জুনের ঘরের দিকে তাকাল। দরজা ভেজানো, কিন্তু সে দিকে ওরা পা বাড়াল না। নীচে নেমে ওরা বাংলো থেকে বেরিয়ে উলটো দিকের রাস্তাটা ধরল। সুনসান নির্জন পথ, পাখির চিৎকার ছাড়া এখন বাতাসের শব্দ বাজছে গাছের ডালে-ডালে, পাতায়-পাতায়। রোদ-ছায়ায় জাফরি-কাটা পথে হাঁটতে ওদের খুব ভাল লাগছিল। দেখতে দেখতে বাংলো এবং আশেপাশের কোয়ার্টার্স চোখের আড়ালে চলে গেল। এখন শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। ওরা একটা ছায়াঘন কালভার্টের ওপর এসে দাঁড়াল। নন্দিনী বলল, "কী দারুণ রোমান্টিক জায়গা !"

চিঙ্কি বলল, "আমি একটা গান গাইব ?"

টিনা বলল, "গাইলে হিন্দি ছবির হিরোইনের মতো নেচে-নেচে গাইতে হবে।"

পুনম কালভার্টের তলা দিয়ে বয়ে-যাওয়া সরু কালো জলের ধারাটিকে দেখল। জঙ্গলের অন্ধকারে যেখানে ধারাটি ঢুকে গেছে সেখানে বাঁশের জঙ্গল, পাতাগুলো জল ঢেকে রেখেছে। কেমন গা-ছমছমে রহস্য ওখানে।

চিঙ্কি ততক্ষণে লাফ দিয়ে কালভার্টের রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছে। তারপর এক হাত আকাশে তুলে একটি জনপ্রিয় হিন্দি ছবির গান ধরল। অবিকল নায়িকাদের ভঙ্গি করে সে এমনভাবে নাচতে লাগল নিজের গানের সঙ্গে যে, মেয়েরা হাততালি দিয়ে তাকে উৎসাহ জানাচ্ছিল। নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে চিঙ্কি নানান জায়গায় দৌড়াচ্ছিল। শেষে তরতর করে নেমে গেল পাথরে পা ফেলে ঝোরার জলের ধারে। তার ভঙ্গি এখন নায়িকাদের গানের শেষ পর্বের মতো। শরীর টো-এর ওপর রেখে শরীর ঘোরাচ্ছে সে। মেয়েরা কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে চিঙ্কিকে উৎসাহ দিচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে চিঙ্কি কালভার্টের নীচের দিকে তাকাতেই তার গলার গান বন্ধ হয়ে গেল। হাত উঠল মুখের ওপর, চোখ বিস্ফারিত হল, কিন্তু সেটা মাত্র দু'-তিন সেকেন্ডের জন্য। আচমকা একটা তীব্র চিৎকার ছিটকে এল তার গলা থেকে। নন্দিনী চেঁচিয়ে উঠল, "কী হল ? এই চিঙ্কি ?"

ভূত দেখার মতো দৌড়ে চিঙ্কি পাথরগুলো ডিঙিয়ে ওপরে উঠে এল। তার মুখ এখন একদম সাদা। বন্ধুরা দৌড়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। নন্দিনী ওর মুখ ধরে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ?"

চিঙ্কির কথা বলতে সময় লাগল। সে কোনও মতে বলতে পারল, "ভূত।"

"ভূত ?" হাঁ হয়ে গেল তিনজন, নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, "কী যা তা বলছিস ?"

চিঙ্কি বাঁ হাত বাড়িয়ে ঝোরাটাকে দেখাল, "ওই যে ওখানে !"

ওরা কালভার্টের তলা দিয়ে বয়ে-যাওয়া কালো জলের ঝোরা দেখল। নন্দিনী হেসে উঠল, "দুর ! ভূত বলে কিছু আছে নাকি ?"

চিঙ্কি তখন ঢোঁক গিলছে। কথা বলার ক্ষমতা ভাল করে পাচ্ছে না বেচারা। একটু আগে যে মেয়ে নাচ-গান করছিল, সে এখন রক্তশূন্য।

পুনম জিজ্ঞেস করল, "ভূতটা কোথায় ?"

চিঙ্কি কাঁপা গলায় জবাব দিল, "নীচে, কালভার্টের নীচে।"

ওরা তিনজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর চিঙ্কিকে ওপরে রেখে পাথরে পা ফেলে নীচে নামতে লাগল। ওরা কেউ কোনও কথা বলছিল না। গম্ভীর মুখে জলের ধারে পৌঁছে মুখ ফেরাতেই হতভম্ব হয়ে গেল তিনজনে। কালভার্টের নীচে একটা মানুষ বসে আছে পাথরে হেলান দিয়ে। সে যে মৃত, তা বলে দেওয়ার দরকার হয় না। সঙ্গে-সঙ্গে পুনম আর টিনা ছুটতে লাগল ওপরে। নন্দিনী সাহস করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। লোকটার শরীরের নিম্নাংশ জলের মধ্যে, স্রোত বয়ে যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে। ঊর্ধ্বাঙ্গ শুকনো।

পরনে খুব মলিন ধুতি আর গেঞ্জি। এ দিকের কোনও শ্রমিক হবে। মুখ-চোখ বাঙালি বলে মনে হচ্ছে না। নন্দিনী চার পাশে তাকাল। কোথাও কেউ নেই। জঙ্গলের জীবন নির্বিঘ্নে চলছে। সে ধীরে-ধীরে উপরে উঠে আসতেই পুনম বলল, "লেটস্ গো ব্যাক।"

নন্দিনী বলল, "আমাদের উচিত এখনই পুলিশকে খবর দেওয়া।"

"পুলিশ? পুলিশ কোথায় পাব?"

"কেন? সেই যে অফিসার—যিনি রেঞ্জারের সঙ্গে তখন ছিলেন।"

ওরা কেউ আর ওখানে দাঁড়াতে চাইছিল না। দ্রুত সবাই হাঁটতে লাগল ট্যুরিস্ট বাংলোর দিকে। মোড় ঘোরার আগে নন্দিনী একবার পেছন ফিরে তাকাল। জঙ্গল চিরে পেছনে পড়ে থাকা পথটা চমৎকার শান্ত। চোখ ফিরিয়ে নেবার আগে সে চমকে উঠল। চিৎকার করে বলল, "লুক্!"

ওরা তিনজনেই ভয়ার্ত চো‍ে ‍ ‍ছন ফিরল। কিন্তু ততক্ষণে প্রাণীটি রাস্তা পার হয়ে ওপারে চলে গিয়েছে। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার দেড়শো গজ দূরে ঘটনাটা ঘটল। টিনা জিজ্ঞেস করল, "কী বল তো?"

চিঙ্কি অস্ফুটে বলল, "গোরিলা। আই অ্যাম শিওর।"

পুনম বলল, "ভ্যাট! ইন্ডিয়ার ফরেস্টে গোরিলা পাওয়া যায় না। বোধ হয় ভালুক।"

নন্দিনী যতটুকু দেখেছে, ওরা তা দেখেনি। ভালুক হলে কি ওভাবে হাত তুলে দৌড়ে যায়? প্রাণীটি কালচে লোমশ। কিন্তু দৌড়োবার ভঙ্গিতে নিজেকে গোপন করার প্রয়াস আছে। তা ছাড়া লম্বায় অতটা উঁচু কি ভালুক হয়? যদিও এত দূর থেকে উচ্চতা মাপা শুধু দৃষ্টি দিয়ে অসম্ভব। কিন্তু এই জঙ্গলে যদি একটা অচেনা প্রাণী ওই চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তা হলে নিরস্ত্র হয়ে হাঁটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ট্যুরিস্ট বাংলোর সামনে এসে পুনম বলল, "চল, অর্জুনকে বলি।"

নন্দিনী মাথা নাড়ল, "হোয়াই? আমরাই তো রেঞ্জারকে রিপোর্ট করতে পারি।"

বাকি রাস্তাটুকু চুপচাপ কাটিয়ে ওরা গেট খুলে রেঞ্জারের অফিসে ঢুকল। এখন আর সকাল নেই। ডুয়ার্সের দুপুর মোটেই আরামদায়ক নয়। চার পাশে জঙ্গল থাকায় অবশ্য একটা ছায়া-ছায়া প্রলেপ তার ওপর পড়েছে। রেঞ্জার নেই। এক অল্পবয়সী ভদ্রলোক বাসি খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ওদের দেখে আমতা-আমতা করে বললেন, "স্যার নেই। মাদারিহাটে গিয়েছেন।"

"কখন ফিরবেন?" নন্দিনী জিজ্ঞেস করল।

"বিকেলে।"

"মাদারিহাট মানে যে রাস্তা দিয়ে আমরা জঙ্গলে ঢুকলাম?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমাদের যে খুব জরুরি কথা বলার ছিল। এখনই !"

লোকটি উঠল। রেঞ্জারের টেবিলে একটা টেলিফোন রয়েছে। সেটির রিসিভার তুলে ঘন ঘন ট্যাপ করতে করতে অপারেটরকে পেল। একটা নম্বর পেয়ে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসল, "কপাল ভাল থাকলে স্যারকে পেয়ে যাব। হ্যালো, হলং রেঞ্জ অফিস থেকে বলছি। রেঞ্জার সাহেব আছেন ? নেই। বেরিয়ে গিয়েছেন ? কোথায় ? আরে, হ্যালো, হ্যালো !" লোকটি কিছুক্ষণ চিৎকার করল। তারপর রিসিভার নামিয়ে মাথা নাড়ল, "নাঃ, স্যার বেরিয়ে গিয়েছেন !"

"তা হলে আপনি চলুন। আপনি তো এখানে কাজ করেন ?" নন্দিনী বলল।

"হ্যাঁ। কিন্তু কোথায় যাব ?"

"জঙ্গলে।"

"জঙ্গলে ? না, না, হাতির পিঠে ছাড়া জঙ্গলে যাবেন না। তা ছাড়া এখন জঙ্গলে খুব গোলমেলে ব্যাপার হচ্ছে। হুটহাট যাবেন না।"

"কী গোলমাল ?"

"রাষ্ট্রবিরোধী সমাজবিরোধীরা জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে।"

মেয়েরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। নন্দিনী বলল, "শুনুন, আমরা একটু আগে বাংলোর পিছন দিকের রাস্তায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। যেতে-যেতে যে কালভার্টটা পড়ে, তার নীচে একটা ডেডবডি দেখতে পেয়েছি। মনে হচ্ছে, লোকটাকে কেউ খুন করেছে। এই ব্যাপারটা আপনাদের জানাতে এসেছিলাম।"

"কী ? খুন ? আবার ?" লোকটি হাঁ হয়ে গেল।

"মানে ? এখানে কি এর আগেও খুন হয়েছে ?"

"হ্যাঁ। দিন-দশেক আগে জঙ্গলের ও পাশে একটা গ্রামের লোককে কেউ খুন করে ফেলে দিয়ে যায়। একটা বুড়ো বাঘ তার পেটের কিছুটা খেয়ে রেখে যায়।"

"তা হলে তো বাঘে মেরেছিল।" পুনম বলল।

"না, ম্যাডাম। লোকটার গলা ছুরি দিয়ে অর্ধেক কাটা ছিল। কোথায় বললেন ? কালভার্টের নীচে ? আবার ঝামেলা শুরু হল।" লোকটা এগিয়ে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলল, "হ্যালো, অপারেটার, থানায় দিন। জলদি। হ্যালো, থানা, বড়সাহেব আছেন ? নেই ? শুনুন হলং রেঞ্জ অফিস থেকে বলছি। আবার একজন খুন হয়েছে। তিন নম্বর কালভার্টের তলায় ডেডবডি। একজন না চারজন মহিলা, না না মহিলা খুন হয়নি, দাঁড়ান..." রিসিভারে হাত-চাপা দিয়ে লোকটা জিজ্ঞেস করল, "যে খুন হয়েছে, সে ছেলে না মেয়ে ?"

"আপনাকে তখন বললাম একটা লোক পড়ে আছে।" নন্দিনী গম্ভীর মুখে বলতেই সে আবার রিসিভার থেকে হাত সরাল, "ছেলে। ছেলে খুন হয়েছে।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে লোকটা যেন কিছুটা স্বস্তি পেল। তারপর বলল, "একটা খুন মানে কত ঝামেলা জানেন? ঘন ঘন পুলিশ আসবে। আপনাদের কাছেও যাবে। আচ্ছা, আপনাদের সঙ্গে কোনও গার্জেন নেই?"

"আছেন। তিনি বাংলোতে বসে আছেন।"

"তিনি দ্যাখেননি ডেডবডি? তা হলে পু ক আমি আর আপনাদের কথা না বলে তাঁর নাম বলে দিতাম। পুলিশ আর আপনাদের জিজ্ঞাসাবাদ করত না?"

নন্দিনী বলল, "না, তিনি দ্যাখেননি। আচ্ছা, আর-একটা কথা বলুন তো। এই জঙ্গলে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা কালো লোমশ কোনও প্রাণী আছে, যে দু'পায়ে হাঁটতে পারে? খুব জোরে হাঁটে?"

লোকটি আঙুল তুলে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো জীবজন্তুর ছবি দেখাল, "এই সব প্রাণী এখানকার জঙ্গলে আছে।"

ওরা উৎসুক হয়ে তাকাল। বাঘ, বাইসন, গণ্ডার, বুনো শুয়োর, হাতি থেকে আরম্ভ করে বন-মুরগি, সাপ ছড়িয়ে আছে জঙ্গলে, কিন্তু সেই বিদ্‌ঘুটে প্রাণীর ছবি দেওয়ালে টাঙানো নেই। নন্দিনী মাথা নাড়ল, "এই ছবির বাইরের কোনও জন্তু জঙ্গলে নেই বলতে চাইছেন?"

লোকটি বলল, "ম্যাডাম, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যে সব জন্তুর ছবি পাঠিয়েছে, তার বাইরে কিছু না থাকারই কথা। তবে কাউকে যদি না বলেন যে আমি বলেছি—তা হলে বলতে পারি, আছে। এ রকম গভীর জঙ্গলে অনেক রকম জন্তু হঠাৎ-হঠাৎ দেখা যায়, যার নাম খাতায় লেখা নেই।"

"যেমন?"

"একটা জন্তু আছে জানেন, যার গায়ে বড়-বড় আঁশ, গড়িয়ে গড়িয়ে চলে, কী নাম জানি না। বুনো কুকুর আছে কয়েকটা। খুব ভয়ঙ্কর।"

"লোমশ প্রাণী মানুষের মতো হাঁটে—তেমন কিছু?"

"মাহুত একবার বলেছিল, কিন্তু আমরা কেউ চোখে দেখিনি।"

"কী বলেছিল মাহুত?"

"জঙ্গলের ভেতরে সকালে যখন ভিজিটার্সদের নিয়ে যায়, তখন একদিন হাতির পিঠে বসে একটা গোরিলার মতো প্রাণী দেখেছিল। এক পলক। সে কথা শুনে রেঞ্জার সাহেব বলেছিলেন, নির্ঘাৎ ভালুক। আমি অবশ্য এত দিন এখানে আছি, কিন্তু কোনও ভালুক দেখিনি।"

নন্দিনীরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ঘড়িতে এখন প্রায় বারোটা। যদিও কারও খিদে পায়নি। এই জায়গাটায় সম্ভবত ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের

বাড়ি-ঘর রয়েছে। ফলে একটা পাড়া-পাড়া ভাব। ওরা চুপচাপ হাঁটছিল। পুনম বলল, "বেশ থ্রিলিং ব্যাপার, না রে?"

টিনা বলল, "অদ্ভুত তো! একটা লোক খুন হল, আর তুই থ্রিলড্ হচ্ছিস?"

এই সময় ওরা অর্জুনকে দেখতে পেল। পায়ে চপ্পল, পরনে একই শার্ট-প্যান্ট। দূর থেকে তাকে দেখে নন্দিনী বলল, "গাইডবাবু। এখন খুঁজতে বেরিয়েছেন! নিশ্চয়ই আমাদের বলবেন, কেন ওঁকে না জানিয়ে বেরিয়েছি!"

মুখোমুখি হতেই অর্জুন কিছু বলার আগেই নন্দিনী বলল, "আচ্ছা মানুষ তো আপনি, ঘরের দরজা বন্ধ করে থেকে গেলেন?"

"দরজা বন্ধ? কই না তো! খোলাই তো ছিল!"

"কী করছিলেন এতক্ষণ?"

"আপনারা যে বেরিয়ে পড়বেন, তা বুঝিনি। কোথায় গিয়েছিলেন?" অর্জুন চট করে বলতে চাইল না যে, সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার বলার মধ্যে এমন সারল্য ছিল যে, নন্দিনী আর খেলাতে চাইল না। দু' নম্বর কালভার্টের গায়ে হেলান দিয়ে বসে ওকে সব কথা খুলে বলল।

শুনতে শুনতে অর্জুনের মুখ শক্ত হয়ে গেল। সে বলল, "আপনারা বড্ড বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলেন। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, রতনলালবাবুকে ফরেস্ট অফিসার আর ও.সি. বলেছিলেন, এখানকার আবহাওয়া ঠিক নেই। আমি একটু আগে বেয়ারাদের কাছে জানতে পারলাম, কিছু অ্যান্টি-সোশ্যাল এলিমেন্ট এই জঙ্গলে বাসা বেঁধেছে। তারা বাংলো পুড়িয়ে দেয়, ডাকাতি করে। তাদেরই কেউ হয়তো খুন হয়েছে। তাই ও রকম জায়গায় একা যাওয়া ঠিক হয়নি।"

"যে লোকটি খুন হয়েছে, সে নেহাতই গ্রাম্য মানুষ।"

"হতে পারে। এ-নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই।" অর্জুন বলল, "চলুন, স্নান করে খেয়েদেয়ে রেস্ট নিন। বিকেলের পর থেকে অনেক রকম জন্তু আসে সামনের ঘাসের জঙ্গলে নুন খেতে।"

ওরা হাঁটছিল বাংলোর দিকে। কিন্তু এরই মধ্যে অর্জুনের কৌতূহল হচ্ছিল। গ্রাম্য ঝগড়ায় অবশ্য কোনও গ্রামের মানুষ খুন হতে পারে, কিন্তু তার শরীর কেন জঙ্গলের ভেতরে কালভার্টের নীচে পাওয়া যাবে? খুনি কি হত্যাকাণ্ড লুকিয়ে ফেলতে লোকটাকে ওখানে নিয়ে এসে খুন করেছে? কিন্তু এত ঘন ঘন এখানে হত্যাকাণ্ড হবেই বা কেন? অর্জুন দাঁড়িয়ে পড়ল। নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, "কী হল আপনার?"

"আমি একবার কালভার্টটার কাছ থেকে ঘুরে আসছি।" অর্জুন বলল।

টিনা মাথা নাড়ল, "না, প্লিজ, একা যাবেন না।"

অর্জুন হাসল, "আমার কিছু হবে না।"

"কিন্তু ওখানে নাম-না-জানা একটা বন্যজন্তু দেখেছি আমরা।"

"সেটাই আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে। জলদাপাড়ায় গণ্ডার, বাইসন, হাতি আর কয়েকটা বাঘ ছাড়া কোনও বড় প্রাণী নেই বলে শুনেছিলাম। আপনারা ঘরে গিয়ে স্নানটান করুন। আমি ঘুরে আসছি।"

টিনা বলল, "আপনার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের দেখাশোনা করা। ওখানে গিয়ে যদি কোনও দুর্ঘটনা হয়, তা হলে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।"

অর্জুনের মনে হল, কথাটা ঠিক। কিন্তু তার মেজাজ খিঁচড়ে গেল। কয়েকটা বাচ্চা মেয়ের গাইড হতে সে কি কখনও চেয়েছিল? ম্যানেজারি করা? মালবাজারে সোনার ব্যাপারটা, এখানে খুন—এ সব তাকে উপেক্ষা করে থাকতে হবে? একজন সত্যসন্ধানী হয়ে সেটা করা কতখানি বেদনাদায়ক, তা এরা বুঝবে কী করে? সে কাঁধ নাচিয়ে বাংলোর ভেতরে ঢুকল। মেয়েরা কলবল করতে-করতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে জিপটাকে দেখতে পেল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসছিল সেটা। হঠাৎ বাংলোর মুখটায় দাঁড়িয়ে পড়ল। মিস্টার বিশ্বাস নেমে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"

জবাব না দিয়ে অর্জুন হাত তুলে দাঁড়াতে বলল। প্রায় দৌড়েই সে জিপের কাছে পৌঁছে বলল, "একটু আগে আপনাকে টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল। ও, আপনিও আছেন?" জিপের ভেতরে বসা মিস্টার আহমেদের দিকে তাকিয়ে বলল অর্জুন, "খুব ভাল হল, আপনাকে থানাতে ফোন করা হয়েছে।"

"কী ব্যাপার বলুন তো?" মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন অবাক হয়ে।

"আপনাদের জঙ্গলে একটা ডেডবডি দেখেছে মেয়েরা।"

"ডেডবডি? কোথায়?" মিস্টার আহমেদ জিজ্ঞেস করলেন।

"তিন নম্বর কালভার্টের নীচে।"

"সে কী!" মিস্টার বিশ্বাস হতভম্ব, "মেয়েরা সেটা দেখল কী করে?"

"বেড়াতে বেড়াতে গিয়েছিল। তারপরেই আপনার অফিসে রিপোর্ট করেছে।"

"আপনিও দেখেছেন?"

"না। আমি তখন বাংলোয় ছিলাম।"

মিস্টার বিশ্বাস জিপে উঠে বসলেন, "ড্রাইভার, গাড়ি ঘোরাও।"

অর্জুন এগিয়ে গেল, "কিছু মনে করবেন না, আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি?"

"আমরা অফিসিয়াল ডিউটিতে যাচ্ছি।"

"আমি জানি। আপনি বোধ হয় মিস্টার অমল সোমের নাম শুনেছেন! আমি তাঁর সহকারী। আমার নাম অর্জুন।"

pathagar.net

"অর্জুন ?" মিস্টার আহমেদ বললেন, "আপনিই লাইটার প্রবলেম সলভ করেছেন ? খুঁটিমারি রেঞ্জের প্রবলেমটাও কি আপনারই সলভ করা ?"

অর্জুন বিনীত হাসি হাসল। মিস্টার বিশ্বাস বললেন, "তাই বলুন। উঠে পড়ুন ভাই। আপনার পরিচয় তো জানতাম না। তা, এই মেয়েদের সঙ্গে কী করে এলেন ?"

"এটা একটা অ্যাসাইনমেন্ট।" গাড়িতে উঠতে-উঠতে অর্জুন বলল।

মিস্টার আহমেদ হাসলেন, "আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগছে।"

বিশ্বাস বললেন, "তা-তো হল। কিন্তু আবার কী ঝামেলায় পড়লাম বলুন তো !"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ক' দিন আগে যে লোকটা খুন হয়েছে, তার কোনও কিনারা হল ?"

মিস্টার আহমেদ চলন্ত জিপে বসে বললেন, "মনে হচ্ছে পলিটিক্যাল মার্ডার। এ সব এলাকায় প্রচুর উগ্রপন্থী শেল্টার নিয়েছে। নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ থেকে খুন হওয়া আশ্চর্যের নয়।"

অর্জুন কোনও কথা বলল না। আজকাল পলিটিক্যাল মার্ডার বলে অনেক খুনের তদন্ত চাপা দেওয়া যায়। আর তদন্ত করে সুরাহা না পেলে ওই শব্দ দুটো বলে পাশ কাটাতে অসুবিধে হয় না। দু' পাশে জঙ্গল রেখে জিপ থামল তিন নম্বর কালভার্টের পাশে। টপাটপ জিপ থেকে নেমে পড়লেন অফিসাররা। অর্জুন তাঁদের অনুসরণ করল। পাথর ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে জলের কাছে পৌঁছে এপাশ-ওপাশ তাকিয়েও কোনও মৃতদেহের দর্শন পাওয়া গেল না। মিস্টার বিশ্বাস অর্জুনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কোথায় দেখেছিল বলুন তো ?"

"কালভার্টের নীচে।"

"ওখানে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।"

সত্যি কিছুই নেই। অর্জুন পাথরে পা ফেলে এগিয়ে গেল কালভার্টের নীচে। মৃতদেহ থাকলে তাদের দেখে লুকিয়ে পড়ত না। মিস্টার আহমেদ দূরে দাঁড়িয়ে হাসলেন, "আপনার সঙ্গিনীরা বোধহয় 'হার্ডি বয়েস' কিংবা 'ফেমাস ফাইভ' পড়ে খুব ?"

অর্জুন প্রতিবাদ করল, "না। ওরা তেমন বাচ্চা নয়।"

"তা হলে হ্যাডলি চেজ কিংবা জেমস বন্ড ?"

অর্জুন জবাব দিল না। মেয়েরা বলেছিল, মৃতদেহের অর্ধেকটা জলে ডোবা ছিল। সে এগিয়ে গেল জলের কাছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা পাথরের অনেকটা ভিজে রয়েছে। অথচ পাশের সব ক'টা পাথরের ওপরই শুকনো খটখটে। অর্জুন পাশে গিয়ে দাঁড়াল। পাথরের ওপরের ধুলোয় একটা ঘষটানো দাগ। তারপরেই পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। একটুখানি ধুলোমাটির

ওপর একজোড়া পা। অর্জুন হাত নেড়ে অফিসারদের কাছে ডাকল। মিস্টার বিশ্বাস আসতে-আসতে বললেন, "কোনও লোক টায়ার্ড হয়ে হয়তো কালভার্টের ছায়ায় ঘুমোচ্ছিল, দড়িকে সাপ ভেবেছে মেয়েরা।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "কিন্তু এখান থেকে কাউকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মিস্টার আহমেদ, আপনি এই জায়গাটা ভাল করে দেখুন।" সে তার সন্দেহের কারণ আরও বিশদভাবে বলল। পুলিশ-অফিসার সেটা শুনে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, "আপনার কথা সত্যি হলে এখানে একটা ডেডবডি ছিল এবং মেয়েরা আবিষ্কার করার পর কেউ সেটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।"

অর্জুন জলের ও পাশের জঙ্গলটাকে দেখল। ঝোরার জল খুব বেশি নয়। মাঝে-মাঝে হাঁটুর বেশি নয়। যে কেউ ও পার থেকে এসে...। না, ওপার থেকে নয়, মাটির দাগ বলছে যে কোনও ভারী জিনিসকে এ পাশেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ দিকে ঘাসের ওপর পায়ের চাপ এখনও মিলিয়ে যায়নি। সে ঘাসের দাগ দেখে আরও একটু এগোল। এখান থেকে হাঁটলে রাস্তায় গিয়ে উঠতে হবে। কোনও পথ নেই। লতা-ঘাস আর মাটির ওপর পায়ের ছাপ স্পষ্ট। পা বেশ গভীর হয়ে মাটিতে বসে ছিল। সে মিস্টার আহমেদকে সেখানে ডেকে দেখাল।

এবার ধীরে-ধীরে ওরা পাহাড়ে চড়ার কষ্ট করে রাস্তায় উঠে এল। মিস্টার আহমেদ বললেন, "কিন্তু অর্জুনবাবু, আমরা নিজেরাই এই পথে উঠতে যে কষ্ট করলাম, তাতে কি আপনার মনে হচ্ছে কেউ আর একটা ডেডবডি নিয়ে উঠতে পারবে?"

"লোকটা যদি প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়?"

"এ দিকের সমস্ত শক্তিশালী মানুষের ঠিকানা পুলিশের খাতায় লেখা আছে।"

"যদি মানুষ না হয়?"

"তার মানে?" এবার মিস্টার বিশ্বাস ঘুরে দাঁড়ান।

"আপনার জঙ্গলে এমন একটা প্রাণীকে মেয়েরা আজ দেখেছে, যার আকৃতি অনেকটা গোরিলার মতো, লম্বায় অন্তত ফিট পাঁচেক। ওরা অবশ্য অনেক দূর থেকে দেখেছে।"

হোহো করে হেসে উঠলেন মিস্টার বিশ্বাস। সামনের একটা গাছ থেকে এক ঝাঁক টিয়া আকাশ সবুজ করে উড়ে গেল ভয় পেয়ে। বিশ্বাস বললেন, "এই জঙ্গলে গোরিলা? আপনার সঙ্গিনীদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। হনুমান ছাড়া কিছু নেই। আর হনুমানদের পক্ষে একটা মানুষের শরীর বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।"

অর্জুন কথাটার প্রতিবাদ করতে পারল না। সে জানে, ওই রকম জন্তুর

এখানে থাকার কথা নয়। তবু রাস্তা পেরিয়ে ও জঙ্গলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পর মনে হল, জঙ্গল সরিয়ে কেউ হয়তো ও পাশে নেমে গিয়েছে। এখনও গাছপালা নিজেদের ডালপাতা স্বাভাবিক করেনি। সে দাগ লক্ষ করে নেমে পড়ল। বিশ্বাস বললেন, "ওভাবে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। সাপ থাকতে পারে।"

আহমেদ বললেন, "ওয়াইল্ড গুজ চেজ করছেন আপনি?"

কিন্তু চার-চারটে মেয়ে মিথ্যে দেখতে পারে না। মিনিট-পনেরো খোঁজাখুঁজি করার পর সে পাখিদের চিৎকার শুনতে পেল। একটা গাছের ডালে পাখিরা অনবরত চিৎকার করে যাচ্ছে। এখন অর্জুনের চার পাশে ঘন জঙ্গল। রাস্তা চোখের আড়ালে চলে যাওয়ায় সে অফিসারদের দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ মনে হল আশে পাশে কেউ আছে। এই মনে হওয়াটার কোনও কারণ নেই, কিন্তু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন সাবধান করে দিচ্ছিল অর্জুনকে। সে ঘুরে দাঁড়াতেই ওপর থেকে একটা ভারী জিনিস ঝাঁপিয়ে পড়ল মাথার ওপরে। পড়ে যেতে যেতে অর্জুন পরিত্রাহি চিৎকার করল। চোখ বন্ধ হবার আগে একটা লোমশ পেট-বুক নজরে এল।

চোখ মেলতেই বিশ্বাসের মুখ দেখতে পেল অর্জুন। ঝুঁকে পড়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছিল আপনার?"

অর্জুন মাথা তুলতে গিয়ে ঘাড়ে প্রচণ্ড বেদনা অনুভব করল। তবু সে উঠে বসল। ঘাড় এবং কোমরে ব্যথা। দাঁতে দাঁত চেপে অর্জুন সেটা সহ্য করতে চাইল। তাকে এখন তুলে নিয়ে আসা হয়েছে রাস্তায়। আর তখনই একটা জিপকে দ্রুত গতিতে আসতে দেখা গেল উলটো দিক দিয়ে। মিস্টার আহমেদ বললেন, "থানা থেকে ফোর্স আসছে মনে হচ্ছে।"

অর্জুন বলল, "প্লিজ, আপনারা এ পাশের জঙ্গলটা ভাল করে খুঁজে দেখুন। আমাকে আক্রমণ করা হয়েছিল। আচমকা।"

আহমেদ সজাগ হলেন, "ক'জন ছিল?"

"একজনই। একটা লোমশ বুক-পেট। আর কিছু দেখতে পাইনি।"

জিপটা থামতেই আহমেদ তাদের নির্দেশটা জানিয়ে দিলেন। মিনিট-দশেকের মধ্যে পুলিশদের চিৎকারে জানা গেল, ওরা ডেডবডি খুঁজে পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত একটা লম্বা গাছের ডালে শরীরটাকে ঝুলিয়ে ওরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। পরিষ্কার রাস্তায় শুইয়ে দেওয়া হল মৃতদেহকে। কোনও লোমশ জন্তুর চিহ্ন এই জঙ্গলের ধারে-কাছে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছিল অর্জুনের। সে ভুল করছে না। জন্তুটা ওখানে ছিলই। নন্দিনীরা ঠিকই দেখেছিল। নিশ্চয়ই লোকজন দেখে সে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। জঙ্গলটা অনেকখানি জায়গা নিয়ে, যে-কোনও জন্তুর পক্ষে নিরাপদ জায়গা খুঁজে পেতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

মিস্টার বিশ্বাসের কথা কানে এল, "এই লোকটাকে এর আগে দেখেছি বলে মনে হয় না। আপনারা কেউ চিনতে পারছেন একে ?"

পুলিশ কোনও উত্তর দিল না। আহমেদ জিপের ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন, ফরেস্ট অফিসের কোনও দারোয়ানকে তুলে আনতে। জিপ বেরিয়ে গেল।

অর্জুন দেখল, লোকটি এখানকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের একজন। ওর ধুতি এবং পা এখনও ভিজে। তার মানে মেয়েরা ভুল দেখেনি। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে মৃতদেহটাকে কালভার্টের নীচ থেকে ওই জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হল কেন ? কে বা কারা এই কাজটা করল ?

অর্জুন ভিড় থেকে সরে এল। ধীরে-ধীরে কালভার্টের সামনে দাঁড়াল। তিরতির করে ঝোরার জল বয়ে যাচ্ছে। এখানকার পৃথিবী বেশ শান্ত। খুনটা এখানে হয়নি। হলে মৃতদেহের আশ পাশে রক্তের চিহ্ন দেখা যেত। আচ্ছা, মৃতদেহে কি রক্তের দাগ রয়েছে ? সে দ্রুত চলে এল মৃতদেহের পাশে। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

আহমেদ জিজ্ঞেস করল, "কী দেখছেন ?"

"লোকটা মরল কীভাবে ?"

"বুঝতে পারছি না। অ্যাপারেন্টলি কোনও ক্ষত চোখে পড়ছে না।"

অর্জুন শরীরটার পাশে বসে পড়ল। মৃতদেহ দেখে মনে হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা আগেও লোকটা বেঁচে ছিল। পচন শুরু হলেও সেটা মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছায়নি। কোথাও কোনও চিহ্ন নেই। পোস্টমর্টেম না করলে বোঝা যাবে না। এই জঙ্গলে সেটা ঠিক-মতো করার ব্যবস্থা আছে কি না কে জানে।

এই সময় জিপ ফিরে এল। ফরেস্ট অফিসের একজন গার্ড জিপ থেকে নেমে মিস্টার বিশ্বাসকে সেলাম করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "দ্যাখো তো, চেনো কি না ?"

লোকটাও এ-দেশীয়। দু' বার তাকাতে হল না তাকে, "হাঁ সাব। ওই উত্তর দিকের গ্রামে থাকে। হাটে-হাটে ঘুরে তামাক বিক্রি করে।"

"ওর সঙ্গে তোমার আলাপ ছিল ?"

"দু'-একবার কথা বলেছিলাম।"

"এই জঙ্গলে ও কেন এসেছে বলতে পারো ?"

"না সাব।"

"ঠিক আছে, তুমি যাও।"

মৃতদেহ তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। আহমেদ যাওয়ার আগে বলে গেলেন যে, তিনি বিকেলে আসবেন একবার। বিশ্বাসের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে ফিরছিল অর্জুন। ওঁর ধারণা : জঙ্গলে আশ্রয় নিতে-আসা উগ্রপন্থীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সংঘর্ষ ঘটায় ওরাই খুন করে রেখে গেছে। অর্জুন একমত হল না। সেরকম কিছু ঘটলে সামনাসামনি ক্ষত দেখা যেত, রক্ত ছড়িয়ে থাকত।

কিন্তু মিস্টার বিশ্বাস অন্য কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। গ্রামবাসীদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হলে হত্যার জন্য জঙ্গলের এত ভেতরে আসার প্রয়োজন পড়বে না। তা ছাড়া ওই লোমশ জন্তুর গল্প নেহাতই গপ্পো। প্রতি বছর এই সব জঙ্গলে ভাল করে সার্ভে করা হয়। থাবা গুনে বাঘের সংখ্যা সঠিকভাবে যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে অমন জন্তু সবার চোখের আড়ালে থেকে যাবে এমন হতেই পারে না। মেয়েরা ভুল দেখেছিল আর অর্জুন সেটা নিয়ে বেশি ভেবেছিল বলে একটা বড় হনুমানকেও ওই কল্পনায় এঁকে ফেলেছে। কিন্তু তার কাছে একটাই বিস্ময়, মৃতদেহটা জায়গা বদলাল কী করে ? মেয়েরা যে ওটাকে কালভার্টের নীচে দেখেছিল, তা অস্বীকার করার তো উপায় নেই। ভদ্রলোক বললেন, "একেই হাজারটা ঝামেলা নিয়ে আছি, তার ওপর আর একটা যোগ হল।"

বাংলোর কাছাকাছি এসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওই লোকটার গ্রামে কি খোঁজ-খবর করতে যাবেন ? আমার এ-ব্যাপারে কৌতূহল হচ্ছে।"

"ওটা পুলিশের কাজ। আমার এলাকা নয়। তবে যখন আপনি ইন্টারেস্টেড, তখন আহমেদকে বলতে পারি আপনার কথা।"

মিস্টার বিশ্বাসের কাছে বিদায় নিয়ে বাংলোয় ঢুকল অর্জুন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় দোতলার খোলা দরজাটি চোখে পড়ল। সেই মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। বাঁ-দিকের নীচের ঠোঁট দাঁতে কামড়ে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন অর্জুনের দিকে। অর্জুন মাথা নিচু করে ওপরে উঠে এল। এই ভদ্রমহিলা কে ? উনি কি একা আছেন ? কোনও পুরুষসঙ্গী ছাড়া এত গভীর জঙ্গলে কেউ বেড়াতে আসে না ! মিস্টার বিশ্বাসকে পরে এঁর কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। ইনি কেন সারাক্ষণ দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকবেন ?

নন্দিনীরা নিজেদের ঘরেই ছিল। ওদের বিরক্ত না করে অর্জুন নিজের ঘরে ঢুকল। শরীরে ঘাম জমছে। ব্যাগ থেকে পাজামা-পাঞ্জাবি বের করে সে বাথরুমে ঢুকে গেল। বেশ বড় বাথরুম। শাওয়ার রয়েছে। পাশে খোলা জানালা দিয়ে জঙ্গলটা দেখা যাচ্ছে। খুব কাছে। দাড়ি কামাতে-কামাতে অর্জুন জন্তুটার কথা ভাবছিল। মৃতদেহকে ও-ই সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ, মেয়েরা মৃতদেহ আবিষ্কার করার পর জন্তুটা সেটাকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার সে আগে কখনও শোনেনি ! মৃতদেহ খেতে আগ্রহী জন্তুরা কি দুই পায়ে চলে, যত দূর মনে পড়ছে, দুই পা যারা ব্যবহার করে, তারা নিরামিষাশী হয়। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করেছিল সে। খামোকা জড়িয়ে যাচ্ছে কি কোনও ঝামেলায় ? সে এসেছে চারটে মেয়েকে গাইড করতে। এ সব কেস নিয়ে মাথা ঘামাতে সে আসেনি। স্নান শেষ করে মাথা মুছতে-মুছতে সে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। জঙ্গলের ওপরে এখন কড়া রোদ। হঠাৎ অর্জুন চমকে উঠল। তার মনে হল,

সামনের গাছগুলোর আড়াল থেকে কেউ বেরিয়ে এসেছিল, তাকে দেখামাত্র চট করে সরে গেল। সে ঠিক দেখেছে। কেউ একজন—তার চেহারা স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু সে ধরা দিতে চায়নি। এখনই যদি দৌড়ে ওখানে যাওয়া যেত তা হলে...না, জামাকাপড় পরতে-পরতে ও উধাও হয়ে যাবে। ব্যাপারটা মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছিল না। একটা লোক খামোকা কেন তাকে দেখে লুকোতে যাবে ? ও কি লুকিয়ে কাউকে দেখতে এসেছিল ? এখানকার সাধারণ মানুষ জঙ্গলের এত গভীরে আসে না। যে এসেছে, তার নিশ্চয়ই বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। সেটা কী ? একবার মনে হল মেয়েদের সাবধান করা দরকার। এই সময় বাইরের দরজায় শব্দ হল। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বাইরে বেরিয়ে এল অর্জুন। দরজা খুলে দেখল, লাঞ্চের ট্রে হাতে বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে, "সবকোই কো খানা হো গিয়া সাব।"

"ওই মেমসাহেবরা খেয়েছে ?"

"জি সাব।"

লোকটা টেবিলে খাবার রাখল। চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তুমি এই বাংলোয় কদ্দিন আছ ?"

"পাঁচ সাল সাব।" লোকটা জবাব দিল।

"আচ্ছা, দোতলায় এক ভদ্রমহিলাকে দেখলাম। উনি কি একা আছেন ?"

"হাঁ সাব। মেমসাব এক সাব কা সাথ আয়া থা। সাব গিয়া শিলিগুড়ি। মেমসাব ইহাঁ আকেলা হ্যায়। ঘরসে নেহি নিকলাতা।"

"কোত্থেকে এসেছেন উনি ?"

"নেহি জানতা সাব।"

"আচ্ছা, আর একটা কথা, গত পাঁচ বছরে এই বাংলোয় কোনও গোলমাল হয়েছে ? এই ধরো চুরি-চামারি, খুন-খারাপি ?"

"নেহি সাব। বিলকুল নেহি হুয়া।"

"ঠিক আছে, তুমি পরে এসে ট্রে নিয়ে যেও।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে বিছানায় শুয়ে যেই সে সিগারেট ধরিয়েছে, অমনি মেয়েরা এল। নন্দিনী বলল, "বেয়ারার কাছে শুনলাম ভোরবেলায় হাতির পিঠে জঙ্গল ঘোরাতে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা যাব।"

"যাবেন।"

"আগে থেকে সেটা জানাতে হবে না ?"

"জানিয়ে দেব।"

টিঙ্কি বলল, "আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?"

"ডেডবডি দেখতে।"

"ও, আপনি তো গোয়েন্দা।"

"না, আমি সত্যসন্ধানী।"

pathagar.net

নন্দিনী বলল, "আপনি কি ওই রেঞ্জারের দেখা পেয়েছিলেন ?"

"ওঁর সঙ্গেই গিয়েছিলাম। কিন্তু উনি বলছেন, আপনারা যে লোমশ প্রাণীটিকে দেখেছেন—এই জঙ্গলে সে রকম প্রাণী নেই।"

"মিথ্যে কথা।" ফুঁসে উঠল নন্দিনী, "আমরা স্পষ্ট দেখেছি।"

"যাক। এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই।"

"কিন্তু আমরা এখানে খুব বেশি বোর হচ্ছি।" পুনম বলল।

"মানে ?"

"চার পাশে জঙ্গল। ঘরে বসে থাকতে হচ্ছে। এ জন্যে নিশ্চয়ই দিল্লি থেকে এত দূরে আমরা আসিনি। এর চেয়ে বেশি পয়সা দিয়ে দার্জিলিং-এ গেলে আমরা বেশি আনন্দ পেতাম। সেখানে অনেক-কিছু দেখার আছে।"

"অবশ্যই। দার্জিলিং হলং-এর থেকে অনেক বেশি আকর্ষক। তবে এখানে যে জন্তু-জানোয়ার দেখতে পাবেন, তা কিন্তু দার্জিলিং-এ নেই। আর হ্যাঁ, একটা কথা বলব, যে-খুনটা আজ এখানে হয়েছে, আজই হয়েছে ধরে নিচ্ছি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের কোনও এসকর্ট ছাড়া জঙ্গলে ঢুকে পড়া ঠিক হবে না।"

নন্দিনী ভ্রূ কোঁচকাল, "কেন ?"

"জঙ্গলে কিছু উগ্রপন্থী আশ্রয় নিয়েছে। তারা বোধহয় আপনাদের উপস্থিতি ভাল চোখে নেবে না। তা ছাড়া, ওই মৃতদেহটি নিশ্চয়ই আরও অনেক ঝামেলা ডেকে আনবে।"

টিনা বলল, "তা হলে আজই এই জঙ্গল ছেড়ে আমরা শহরে চলে যাচ্ছি না কেন ?"

"আপনারা যদি যেতে চান, তা হলে আমি নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।"

"না।" মাথা নাড়ল নন্দিনী, "এখানে এসে আমার খুব ভাল লাগছে। তোরা কি একটা অ্যাডভেঞ্চার করতে ভয় পাচ্ছিস ?"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "অ্যাডভেঞ্চার মানে ?"

নন্দিনী বলল, "বাংলোর বেয়ারার কাছে জানতে পারলাম, এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে। সেখানে রাত কাটালে নানা রকম জীবজন্তুকে খুব কাছ থেকে দেখা যায়, যাদের দিনের বেলায় দেখতে পাওয়া অসম্ভব। আজ রাত্রে আমরা সেখানে যাব।"

চিঙ্কি বলল, "লেটস্ গো।"

মেয়েরা ঘাড় নেড়ে দরজার দিকে এগোতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছেন ?"

"একটু হাঁটব।" নন্দিনী ঘুরে দাঁড়াল, "জঙ্গলে এসে ঘরে বসে থাকব নাকি ?"

সে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল, "অত ভোরে উঠেছেন, তার ওপর আজ

রাত্রেও জেগে থাকতে হবে, দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিলে শরীর ঠিক থাকত !"

"ওঃ, মিস্টার গাইড, আমরা কি খুব শিশু, কী মনে হয় আপনার ?" কথাটা বলে নন্দিনী হাসতে-হাসতে মেয়েদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল ।

বেশ রাগ হল অর্জুনের । অত্যন্ত অবাধ্য মেয়েগুলো । তার কথা যদি শুনতেই না চায়, তা হলে সে আছে কেন ? অথচ ওরা বাইরে ঘুরবে আর সে ঘরে বসে হাই তুলবে তাও হতে পারে না । কিছু হলে অমলদাকে কৈফিয়ত তো তাকেই দিতে হবে । সেজেগুজে বেরিয়ে এল অর্জুন । দোতলায় নামার সময় সে ঘাড় ঘুরিয়ে দরজাটার দিকে তাকাল । পরদা ফেলা, কাউকে দেখা যাচ্ছে না ।

লনে নামতে-নামতে সে মেয়েদের দেখতে পেল । যাক বাবা, ওরা ফরেস্ট অফিসের দিকে যাচ্ছে । ও দিকে কোনও বিপদ নেই । অর্জুন সেদিকেই হাঁটতে লাগল । মেয়েদের সঙ্গে তার দূরত্ব বেশ অনেকটাই । দু' পাশে জঙ্গল । সামনে এক নম্বর কালভার্ট । হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল । একটা লোক কালভার্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে মেয়েদের দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে যে, সন্দেহ না এসে যায় না । অনেক সময় কিছু বদ প্রকৃতির লোক এমন কাণ্ড করে, কিন্তু লোকটা তো নেহাতই গ্রাম্য মানুষ । অর্জুনের ঝাপসা মনে পড়ল, স্নান করার সময় এক ঝলকে যে লোকটা গাছের আড়ালে চলে গিয়েছিল তার পোশাকও এমন ছিল । অর্জুন চটপট একটা গাছের আড়ালে চলে গেল । লোকটা আর এগোচ্ছে না, কিন্তু দাঁড়িয়ে ভাবছে । এই সময় ফরেস্ট অফিসের দিক থেকে একটা গাড়ির আওয়াজ ভেসে আসতেই লোকটা তিড়িং করে কালভার্টের দিকে চলে গেল । অর্জুন তাকে এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ।

প্রাইভেট নয়, একটা ট্যাক্সি সোজা চলে গেল বাংলোর দিকে । পেছনে যে বসে আছে, তাকে স্পষ্ট দেখতে পেল না । মনে পড়ে যাওয়াতে ঘাড় ঘুরিয়ে সে আর-একবার নম্বরটা দেখতে চাইল । না শিলিগুড়ির সেই ট্যাক্সি নয় ।

অর্জুন লোকটিকে দেখল । নেই । একটু আগে যে ওখানে দাঁড়িয়েছিল, তার চিহ্ন নেই এখন । ট্যাক্সির নম্বর দেখতে ঘাড় ঘোরাবার সময়েই লোকটা হাওয়া হয়ে গিয়েছে । তাজ্জব ব্যাপার । অর্জুন আরও খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে রইল গাছের আড়ালে । না, লোকটার কোনও চিহ্ন আর দেখা যাচ্ছে না । সে রাস্তায় নামল । সতর্ক চোখে কালভার্টটা পার হল । এটা বোঝাই যাচ্ছে, লোকটা রাস্তায় উঠে আসেনি । এখানে কালভার্ট ছাড়িয়ে ঝোরাটা বেশ চওড়া । পাশেই গভীর জঙ্গল । যে-কোনও মানুষ ওখানে নেমে গেলে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব । ফরেস্ট অফিস পর্যন্ত হেঁটে এল অর্জুন । এখনই গাছের ছায়া ঘন হতে শুরু করেছে । তাদের আয়তনও বাড়ছে । কিন্তু আকাশে সূর্যদেব বহাল রয়েছেন । রেঞ্জারের অফিসে উঠে এসে অর্জুন দেখল, মিস্টার বিশ্বাস এর মধ্যেই স্নান করে ফিরে এসেছেন নিজের চেয়ারে । ফাইলপত্র খুলে

লেখালেখি করছেন। জুতোর শব্দ শুনে মুখ তুলে বললেন, "আসুন। ভালই হল, খাতায় নামধাম লিখে দিয়ে যান।"

খাতাটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি, "এটা নিয়ম। তবে ধাম যে সবাই ঠিক লিখে যান, তা নয়। মাস-তিনেক আগে শঙ্কর ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন কলকাতা থেকে। সপ্তাহখানেক ছিলেন। পেমেন্ট করার সময় দেখা গেল দেড়শো টাকা কম পড়ছে। বললেন, গিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। সেটা আজও দিচ্ছেন। চিঠি দিয়েছি, ফেরত এসেছে।"

অর্জুন হেসে বলল, "না, আমরা পুরো পেমেন্ট করেই যাব।" নামধাম লিখে সে একটা নামের ওপর চোখ রাখল। মিস্টার পুরি। মালবাজারের সেই ভদ্রলোক, যিনি বেয়ারাকে ধমক দিয়েছিলেন দরজায় টোকা দেওয়ার জন্যে। ওই ভদ্রলোক এখানে কখন এলেন? সে প্রশ্নটা করল মিস্টার বিশ্বাসকে। তিনি বললেন, "ভদ্রলোক এই একটু আগে এসেছেন। ট্যাক্সিতে বাংলোর দিকে গেলেন।"

"এঁর ঠিকানা কী?"

"ওটা জিজ্ঞেস করবেন না। ব্যাপারটা সরকারি, এটুকু বলতে পারি।"

"সরকারি মানে?"

"কিছু-কিছু অফিসার অথবা সরকারের বড় কর্তার সুপারিশে কোনও-কোনও মানুষ আসেন, যাঁদের ডিটেলস আমরা ওই খাতায় লিখে রাখি না।"

অর্জুন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। আর যাই হোক, মিস্টার পুরি তা হলে সন্দেহভাজনদের লিস্টে পড়ছেন না। সে সিগারেট ধরাল, "আচ্ছা মিস্টার বিশ্বাস, এখান থেকে কিছু দূরে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে, সেখানে রাত কাটাতে গেলে কী করতে হবে? শুনেছি, বন্যজন্তু দেখা যায় ওখান থেকে।"

"আপনারা যেতে চাইছেন ওখানে?"

"হ্যাঁ।"

"আজ রাত্রে আমি আপনাকে সিকিউরিটি দিতে পারব না।"

"ও।"

"আসলে আজ রাতে একটা বড় ধরনের রেইডের প্ল্যান আছে। মিস্টার আহমেদ আসবেন সন্ধের পরেই। বুঝতেই পারছেন।"

"কী ধরনের রেইড?"

"আমাদের কাছে ডেফিনিট ইনফরমেশন আছে, একটি বিশেষ এলাকায় কিছু উগ্রপন্থী ঢুকেছে। এরা এসেছে পাঞ্জাব থেকে পালিয়ে। মাঝে-মাঝে গ্রামে গিয়ে ডাকাতি করে। জঙ্গলের কাঠ কেটে ফেলছে। এদের কাছে আধুনিক আর্মস প্রচুর পরিমাণে আছে। তবে যাওয়ার সময় আপনাদের আমরা ওয়াচ টাওয়ারে নামিয়ে দিয়ে যাব। একটাই শর্ত, সারা রাত আপনারা ওখানে বসে থাকবেন।"

"অসুবিধে হয় না তো ?"

"মশার কামড় থেকে বাঁচবার জন্যে মলম নিয়ে যাবেন, ব্যস।"

অর্জুন ব্যবস্থাটা মেনে নিল। ওই মেয়েরা নিশ্চয়ই নাছোড়বান্দা হবে। অতএব এই ব্যবস্থাই ভাল। হঠাৎ তার মনে পড়ল। সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মিস্টার বিশ্বাস, টুরিস্ট বাংলোর দোতলায় একজন অবাঙালি টাইপের দেখতে ভদ্রমহিলা রয়েছেন। উনি কে বলতে অসুবিধে আছে ?"

মিস্টার বিশ্বাস মিটিমিটি হেসে ফেললেন, "এসেছেন মাত্র কয়েক ঘণ্টা। এর মধ্যে মৃতদেহ আবিষ্কার করেছেন আবার এই ভদ্রমহিলাকেও দেখতে পেয়ে গেলেন !" ফাইল বন্ধ করলেন ভদ্রলোক, "ওঁদের নিয়ে বাংলোর লোকজনের কৌতূহল কম নয়। উনি মিসেস ভার্মা। দিল্লিতে বাড়ি। দিন-তিনেক আগে মিস্টার ভার্মার সঙ্গে এখানে এসেছেন বেড়াতে। এসেই প্রথম রাত্রে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। ওটা বাংলোর বাবুর্চিরাও শুনতে পেয়েছিল। পরশু বিকেলে মিস্টার ভার্মা একটা জরুরি কাজে শিলিগুড়িতে চলে গিয়েছেন। আজই তো তাঁর ফেরার কথা।"

"ভদ্রমহিলা ঘর থেকে বের হন না ?" অর্জুনের অস্বস্তি শুরু হল।

"না। বোধহয় একটু ভীরু প্রকৃতির মানুষ।" মিস্টার বিশ্বাস উঠে দাঁড়ালেন, "আমাকে একটু মাদারিহাট যেতে হবে, অর্জুনবাবু।"

"খুব ভাল হল। আপনি যদি মাঝ-রাস্তায় আমাকে নামিয়ে দেন..."

"চলুন। মাঝ-রাস্তায় কেন ?"

"মেয়েরা ওই পথেই গিয়েছে।"

"ওদের বলুন, ইচ্ছে করলে মাদারিহাটটা ঘুরে আসতে পারে। ফেরার সময় আমার গাড়িতেই ফিরবে। কোনও অসুবিধে নেই।"

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের গাড়িতে চেপে পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে অর্জুন যাচ্ছিল মিস্টার বিশ্বাসের সঙ্গে। দু' পাশে জঙ্গল আছে বটে, কিন্তু তত ঘন নয়। অর্জুন সে দিক থেকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার বিশ্বাস, এ দিকে গ্রামের মানুষ অথবা স্টেডি চাকরি করে না এমন মানুষের জীবনে ইদানীং কোনও পরিবর্তন এসেছে কি ?"

"কী ধরনের পরিবর্তন ?"

"এই ধরুন, হঠাৎ অবস্থা পালটে যাওয়া, হাতে নগদ পয়সা আসা, বাড়িতে যে পারিবারিক সোনা ছিল তা ব্যাঙ্কে জমা রেখে ধার নেওয়া।"

"পারিবারিক সোনা ? নাঃ ! সে তো কবে বছর আগেই শেষ। এরা সোনা কী রকম দেখতে, তা-ই জানে না। এ-কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন বলুন তো ?"

"এমনি। মনে হল তাই।"

এই সময় মেয়েদের দেখা গেল। মাঝ-রাস্তা জুড়ে গান গাইতে-গাইতে

pathagar.net

চলেছে। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল। গাড়ি দাঁড়াতে অর্জুন মুখ বাড়িয়ে বলল, "মাদারিহাট বেড়াতে যাবেন ? তা হলে ঘুরে আসতে পারেন।"

মেয়েদের দ্বিতীয়বার বলতে হল না। কলবল করে উঠে বসল। তারপরেই ওরা মিস্টার বিশ্বাসকে প্রশ্ন করতে লাগল সমানে, মাদারিহাটে কী-কী দেখার আছে, কী জিনিস পাওয়া যায় ? এখান থেকে ফুন্টসিলিং কত দূরে ? আজ রাত্রে ওয়াচ টাওয়ারে যাবেই তারা।

এই সময় বিপরীত দিক থেকে একটা ট্যাকসি আসতে দেখা গেল। এদের ড্রাইভার গতি কমাল। মুখোমুখি হতেই অর্জুনের নিশ্বাস বন্ধ হল। ট্যাক্সির নম্বর তার চেনা। ড্রাইভার এবং ভাল করে দেখা না গেলেও, সওয়ারিকেও। পাশ কাটিয়ে ট্যাক্সিটা চলে গেল। জঙ্গল পেরিয়ে চেক পোস্টের কাছে পৌঁছতে চৌকিদার সেলাম করে খুলে দিল লোহার পথ-নিরোধক পাইপটা। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, "একটু আগে কি মিস্টার ভার্মার ট্যাক্সি গেল ?"

"জি সাব।" লোকটা মাথা নাড়ল।

মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি মিস্টার ভার্মাকে চেনেন ?"

"একটুখানি।" অর্জুন গম্ভীরমুখে জবাব দিল।

কথাগুলো শুনছিল মেয়েরা। নন্দিনী বলল, "স্ট্রেঞ্জ ! উনি এখানেও ?"

অর্জুন কথা বাড়াল না। মিস্টার বিশ্বাস ওদের মাদারিহাট বাজারের সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি সাড়ে-পাঁচটায় ফিরব। তখন আপনারা এখানে থাকবেন। নিয়ে যাব। মনে রাখবেন, সন্ধের পর জঙ্গল পেরিয়ে বাংলোয় ফেরার জন্যে কোনও গাড়ি পাবেন না।"

তিনি চলে যাওয়ামাত্র নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার বলুন তো ? আমরা যেখানেই যাচ্ছি, সেখানেই ভার্মা-আঙ্কল ধাওয়া করছেন কেন ?"

"আমার মনে হয় উনি জানেন না, আপনারা এখানে আছেন। উনি এসেছেন ওঁর স্ত্রীর কাছে, যিনি আমাদের বাংলোর দোতলায় পরশু থেকে একা আছেন।"

"ভার্মা-আন্টি ?" অবাক হয়ে বলে নন্দিনী।

"আপনি তাঁকে চেনেন ?"

"হ্যাঁ। আমাদের বাড়িতে কয়েকবার এসেছেন। উনি যে একই বাংলোয় আছেন, তা তো আমি জানি না। আমার সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক।"

ওই রকম চাউনির কোনও মহিলা ভাল সম্পর্ক রাখতে পারেন শুনে অবাক হল অর্জুন। নন্দিনী তখন তার বন্ধুদের বলছিল, "ভার্মা-আন্টি দারুণ রান্না করে। কিন্তু আমার ভাবতে অবাক লাগছে, আমরা একই বাংলোয় থেকেও সেটা জানি না।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওঁকে দেখতে কী রকম ?"

"ঠিক মা-মা ধরনের। আই মিন, মাদারলি। একটু পুরনো দিনের মানুষ।"

"খুব সুন্দরী ?"

"নট দ্যাট। শি ইজ নাইদার সুন্দরী নর স্মার্ট। আপনি আমাদের ঠাকুমা-দিদিমাদের দেখেছেন ? ফুল অব স্নেহ !"

"বুঝতে পেরেছি।" অর্জুন মুখে কিছু বলল না। কিন্তু সে আরও ধন্দে পড়ল। ওই মহিলাকে দেখলে কোনও মতেই মা-মা বলে মনে হয় না। একটি স্মার্ট আধুনিকা—যিনি সমস্ত পৃথিবীকে সন্দেহ করেন, এমন একটা ছবি মনে আসে। তা হলে নন্দিনীর বর্ণনার সঙ্গে ওঁর কোনও মিল নেই। তা হলে কি ভার্মাসাহেব নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এখানে আসেননি ?

ওরা মাদারিহাটের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে ঘুরে বেড়াল। এখান থেকে বাস ডুয়ার্সের নানা অঞ্চলে যায়। শিলিগুড়ি কিংবা জলপাইগুড়ি শহরে ঘন ঘন বাস। আর ফুন্টসিলিং-এ পৌঁছতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটও যাবে না। মেয়েরা বায়না ধরল ফুন্টসিলিং-এ যাওয়ার। কিন্তু অর্জুন আপত্তি করল। ওখানে গেলে মিস্টার বিশ্বাসের গাড়ির লিফট পাওয়া যাবে না।

ওরা যখন বাংলোয় ফিরল, তখন জঙ্গলে সন্ধে নেমেছে। ঝিঁঝির ডাক শুরু হয়ে গেছে চার পাশে। ফরেস্ট অফিস থেকে বাংলোর রাস্তায় আলো জ্বলছে। গাড়ি থেকে নেমে ওরা মিস্টার বিশ্বাসের নির্দেশ শুনল। রাত ন'টায় ওঁরা এখান থেকে বের হবেন। তার মধ্যে খেয়ে নিতে হবে। প্রস্তুত থাকতে হবে সারা রাত জেগে থাকার জন্যে। উনি ফিরে গেলেন।

অর্জুন নন্দিনীর সামনে দাঁড়াল, "শুনুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

"বলুন।" নন্দিনী সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল।

"আপনি মিসেস ভার্মার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন না।"

"কেন ?" প্রতিবাদের গলায় জিজ্ঞেস করল নন্দিনী।

"এমনও হতে পারে, মিসেস ভার্মা পরিচয় দিয়ে এখানে যিনি আছেন, তিনি হয়তো ওঁর স্ত্রী নন। হয়তো অন্য কোনও আত্মীয়, কিংবা প্রয়োজন পড়েছে বলে ওই পরিচয় দিতে বাধ্য হয়েছেন।" অর্জুন নিচু গলায় বলছিল।

নন্দিনীর চোখ-মুখে বিস্ময় ঠিকরে উঠেছিল, "সে কী !" তারপর বাংলোর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "আমি যদি কোনওভাবে দূর থেকেও ওঁকে দেখতে পেতাম।"

"সেই চেষ্টা না করাই ভাল।" বলতে বলতে অর্জুন দেখল, শিলিগুড়ির সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার কিচেনের দিক থেকে বেরিয়ে আসছে। কথা না বাড়িয়ে অর্জুন দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল। যেহেতু অন্ধকার নেমেছে এবং জলঢাকা থেকে পাওয়া বিদ্যুতের তেজ খুবই কম, তাতে লোকটা তাকে দেখতে পায়নি বলেই মনে হল তার। এখন দোতলার সেই ঘরটির দরজা বন্ধ।

নিজের ঘরে ঢুকে স্বস্তি পেল সে। যদিও তার মনে হল, মেয়েদের বলে আসা উচিত ছিল, যে-যার ঘরে যেন ফিরে যায়। সে নিশ্চিত যে, মিস্টার ভার্মা তাদের খোঁজ পেয়ে এখানে আসেননি। তিনি যে মতলবেই শিলিগুড়ি শহরে গিয়ে থাকুন, মিসেস ভার্মা নামক মহিলাকে যেহেতু এখানে রেখে গিয়েছিলেন, তাই ফেরত আসতে হতই তাঁকে। ব্যাপারটা অদ্ভুত। মালবাজার ট্যুরিস্ট লজের সব ক'টি মানুষ যেন হলং-এ চলে এল কারও অদৃশ্য হস্তক্ষেপে।

খোলা জানালায় চেয়ার নিয়ে বসেছিল অর্জুন। আকাশটা যেন অন্য রকম। কেমন একটা আলো চুঁইয়ে আসছে সেখান থেকে। আজ কোন্ তিথি? এক-টুকরো চাঁদ সম্ভবত উঠে আসছে। ও পাশের জঙ্গলে নিশ্চিদ্র অন্ধকার। শুধু ঝিঁঝিঁ ডাকছে, হাওয়া বইছে। এই সময় দরজায় শব্দ হল। অর্জুন ঘরে ঢুকতে বললে দুপুরবেলার সেই লোকটা চায়ের ট্রে হাতে উদয় হল, "মেমসাব লোগ আট বাজে খানা খায়েগা। আপ?"

"সাড়ে আটটায়। কী খাওয়াবে?"

"চিকেন রোটি আউর ভাজি।"

"খুব ভাল। মিস্টার পুরি কোন্ ঘরে আছেন?"

"দোতলামে। উও আব্‌ভি আ গিয়া।"

"তুমি খুব ভাল মানুষ। আচ্ছা, এখানকার গ্রামগুলোতে তুমি যাও?"

"জি সাব।"

"আজ যে লোকটা খুন হল, তাকে চেনো?"

"জি সাব।"

"চেনো?"

"জি সাব। আচ্ছা আদমি থা। লেকিন দো-তিন মাহিনা সে উসকো দিমাগ খারাপ হো গিয়া থা।"

"কী রকম?"

"হামকো বোলা, বাংলোমে বড়া-বড়া আদমি আতা হ্যায়, উনলোগ পুরানা সোনা চাহে তো মিল যায়েগা। সস্তামে। হাম বোলা, তুম পাগলা হো গিয়া।"

"তারপর?"

"উসকো বাদ নেহি আয়া ও।"

"ঠিক আছে, যাও।"

লোকটি চলে গেল, কিন্তু অর্জুনের মন জুড়ে তখন উত্তেজনা। জগুদা তাকে মালবাজারে যে সোনা বাঁধা-রাখার গল্প বলেছিলেন, সেটার সত্যতা সে নিজের চোখে দেখে এসেছে। ব্যাপারটা মাদারিহাট, হলং-এ পৌঁছে গিয়েছে। অর্থাৎ, একটা বিরাট চক্র এর পেছনে কাজ করছে। কিন্তু যত সহজ মনে হচ্ছে ব্যাপারটা, ঠিক তত সহজ নয়। একজন বা একদল মানুষের হাতে যদি চোরাই

boighar.net

সোনা এসে থাকে, তা হলে তাদের জানা আছে ন্যায্য দামে কী করে তা বিক্রি করতে হয়। কম দামে বিক্রি অথবা অল্প টাকায় বন্ধক রেখে লোকসান করবে কেন তারা। ব্যাপারটায় ফাঁক থেকেই যাচ্ছে। আর আজ যে লোকটার মৃতদেহ পাওয়া গেল! সে নিশ্চয়ই এই সোনাচক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল। কোনও রকম মতবিরোধ ঘটায় লোকটাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু সেই লোমশ জন্তুটাই সব হিসেবে গোলমাল করে দিচ্ছে।

অর্জুন সিগারেট ধরাল। চা খেতে খেতে বাইরের দিকে তাকাতেই দেখল, বাংলোর ওপর থেকে একটা সার্চলাইট ঝোরার ওপারের ঘাসের মাঠটাকে আলোকিত করছে—যেখানে নুনমাটি রাখা আছে। আর আচমকা আলো পড়ায় গোটা-বারো বিশাল চেহারার বাইসন মুখ তুলে তাকাল এ দিকে। আলোয় তাদের চোখ জ্বলতে লাগল। দৃশ্যটি সুন্দর। বাইসনগুলো এবার সরতে লাগল। যেন ছোট-ছোট টিলা ঢেউ-এর মতো চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। তখনই আলো নিবে গেল।

রাত পৌনে ন'টায় মেয়েরা তৈরি। নন্দিনী খুবই উত্তেজিত। সে নাকি সন্ধে থেকে দোতলার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় আধঘন্টা বাদে সেই বিশেষ ঘরের দরজা খুলে যে লম্বা মহিলাটি বেরিয়ে এসেছিল, তিনি সাত-জন্মেও মিসেস ভার্মা নন। এই সময় এক পাঞ্জাবি যুবক বাংলোয় উঠে আসতে, ভদ্রমহিলা তার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন। ওদের কথায় উত্তেজনা ছিল। সে আর-একটু সাহস দেখিয়ে দরজার দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় অন্ধকার থেকে এক ভদ্রলোক ওর দিকে এগিয়ে চাপা গলায় ইংরেজিতে বলেছেন, 'গো ব্যাক টু ইওর রুম, ডোন্ট ইনভাইট ট্রাব্‌ল।" কথাটা শোনার পর নন্দিনী আর সেখানে দাঁড়াতে সাহস পায়নি। কিন্তু নন্দিনী ভাবতে পারছে না, ভার্মা আঙ্কেল কেন অন্য মহিলাকে আন্টি সাজিয়ে এখানে নিয়ে আসবেন। অর্জুনের মাথায় অন্য চিন্তা ঢুকল। যে ভদ্রলোক নন্দিনীকে সাবধান করে দিয়েছেন, তিনি কে? আর এই পাঞ্জাবি যুবকের নাম কি বলদেব?

অর্জুনরা বাংলোর বাইরে এসে অপেক্ষা করছিল যেখানে হাতির পিঠে ওঠার সিমেন্টের সিঁড়ি রয়েছে। চিঙ্কি এবং টিনা সিঁড়ির ধাপে উঠে বসে ছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "যে লোকটা আপনাকে সাবধান করল, তাকে দেখতে কেমন?"

"অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি। গলা শুনেই আমার বুক ঢিপ-ঢিপ করছিল।"

ঠিক ন'টা বাজতেই দুটো জিপ এসে দাঁড়াল বাংলোর সামনে। পেছনেরটা পুলিশে ভর্তি। মিস্টার বিশ্বাস বললেন, "কী, এখনও বলুন যেতে পারবেন কি না?"

"পারব না কেন ?" নন্দিনী জিজ্ঞেস করল।

"সেকেন্ড থটে যাওয়া ক্যানসেল হলেও হতে পারে। চলুন, উঠে পড়ুন।" বেশ কষ্ট করেই ওরা জিপে উঠল। কারণ পেছনেও দুজন পুলিশ অস্ত্র নিয়ে বসেছেন। মিস্টার আহমেদ বললেন, "আপনাদের সাহস খুব। দেখবেন, রাত্রে ওপর থেকে নীচে নামতে চেষ্টা করবেন না। একমাত্র সাপ ছাড়া কোনও বন্যজন্তু আপনাদের নাগাল পাবে না ওপরে বসে থাকলে।"

পুনম চিৎকার করে উঠল, "সাপ ? ও মাই গড।"

আহমেদ বললেন, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সাপেদেরও কাজকর্ম আছে। সঙ্গে একটা লাঠি রাখলেই চলবে।"

মিস্টার বিশ্বাস বললেন, "ওয়াচ টাওয়ারে লাঠি পাবেন, মশালও।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার আহমেদ, বলদেব নামের কোনও পাঞ্জাবি ছেলেকে আপনি চেনেন ?"

"কোন বলদেব ?"

"ঠিক জানি না। মালবাজারেও যার যাতায়াত আছে।"

"ও, সাপ্লায়ার বলদেব। কেন বলুন তো ?"

"লোকটি কী রকম ?"

"ভাল। গরিব-দুঃখীদের খুব সাহায্য করে। কারও-কারও কাছে ও প্রায় দেবতার মতো। এখন পর্যন্ত নাথিং এগেইনস্ট হিম।"

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। নিঃসাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দুটো জিপ ছুটে যাচ্ছিল। এবার পরিষ্কার রাস্তা ছেড়ে দিয়ে তারা জঙ্গলে পথ ধরল। বিশ্বাস বললেন, "আমাদের যেতে হবে এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে। তখন আলো জ্বালা চলবে না। আপনাদের জন্যে দুশ্চিন্তা থাকল। একটা কথা, সিঁড়ির একেবারে শেষ পাঁচটি ধাপ ইচ্ছে করলে খুলে নেওয়া যায়। যদি তেমন প্রয়োজন মনে করেন সেটা করবেন।"

জঙ্গলের ভেতরে খানিকটা খোলা জায়গার সামনে জিপ দুটো থামল। অর্জুন দেখল, তিনতলা উঁচু একটা ওয়াচ টাওয়ার। ওপরে ছাউনি রয়েছে। পাশ দিয়ে বাঁকানো সিঁড়ি পৌঁছে গেছে ছাউনিতে। মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের কাছে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ আছে ?"

অর্জুন বলল, "ছোট টর্চ আছে।"

"ওটা কাজে লাগবে না। আমাদের কাছে একস্ট্রা টর্চ আছে, এটা রাখুন।" মেয়েদের নিয়ে অর্জুন সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেলে জিপ দুটো অন্ধকার চিরে ফিরে গেল। পুনম সঙ্গে দুটো চাদর এনেছিল। আট ফুট বাই সাত ফুট একটা ঘরে দুটো বেঞ্চি। ঘরের চার পাশে চারটে জানালা। অন্ধকার যতই গভীর হোক, কিছুক্ষণ তাকালে তার ভেতরে এক ধরনের আলো খুঁজে পায় চোখ। বেঞ্চিতে চাদর পেতে দিল পুনম। তারপর ব্যাগ থেকে মশার ধূপ বের করে

দেশলাই ঠুকে জ্বেলে এক কোণে রেখে দিল। অর্জুন ব্যাপার দেখে বলল, "যথেষ্ট ধন্যবাদ এসব ভাবার জন্যে।"

পুনম বলল, "আপনাকে আমি ধন্যবাদ দেব, যদি সিঁড়ির ধাপটা খুলে রাখেন। অন্ধকারে যদি সাপ ওপরে উঠে আসে, দেখতেও পাব না।"

অর্জুন এগিয়ে সিঁড়ির মুখটায় গেল। ইচ্ছে করে সে টর্চ জ্বালছিল না। সিঁড়ির হাতল ধরে সে একটু টানাটানি করতে সেটা নড়ে উঠল। এবার আর-একটু শক্তি প্রয়োগ করতেই সেটা খুলে এল। অর্থাৎ, সিঁড়ির ফ্রেমগুলো খাপে-খাপে বসানো রয়েছে। খোলা ধাপগুলোকে সে ওপরে হেলান দিয়ে রাখল।

মেয়েরা ততক্ষণ আরাম করে বসেছে। টিনা বলল, "ফ্যান্টাস্টিক। আমার খুব উত্তেজনা লাগছে। ধরো, যদি একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার আসে—উঃ।"

টিঙ্কি বলল, "আমি ভাবছি, যদি এখন টারজান আসত। ভাবা যায় না।"

অর্জুন জিভে শব্দ করল, "কোনও কথা নয়। আপনাদের বাক্য শুনলে কোনও জন্তু-জানোয়ার এ-তল্লাটেই আসবে না। এই মশার ধূপের গন্ধটা ওরা না-পেলে বাঁচি। অবশ্য যেভাবে হাওয়া বইছে, তাতে গন্ধ মাটিতে নামবে না।"

অর্জুন নন্দিনীর পাশের বেঞ্চিতে বসল। প্রায় পনেরো মিনিট চুপচাপ কাটল, কোথাও কোনও শব্দ নেই শুধু বাতাস গাছগুলোর মাথায় বিলি কেটে যাচ্ছে। এবার পুনম কথা বলল, "দুর! আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে!"

"জন্তুরা গান বুঝবে না।" অর্জুন চাপা গলায় বলল।

"এখানকার জন্তুরা বেরসিক। টিভি-তে ওয়াইল্ড অ্যানিমাল সিরিজ দেখেছিলাম, একটার পর একটা বন্যজন্তু গান গাইছে! টারজান ছবির গান।"

নন্দিনী বলল, "তোর গান শুনে সাপ উঠে আসতে পারে।"

পুনম চুপ করে গেল। আরও অনেকক্ষণ। অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল সিগারেট খেতে। নাঃ, আজকাল খুব বেশি সিগারেট খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। এই বয়সে যদি দিনে পাঁচটা খায়, তা হলে ষাট বছরে পৌঁছে পনেরোটা খাবে। ইনজুরিয়াস টু হেল্‌থ। আজ রাত্রে সে একটাও সিগারেট খাবে না।

হঠাৎ নন্দিনী তার হাতে মৃদু ধাক্কা দিল। হকচকিয়ে সে নীচের দিকে তাকাল। বড় বড় লাল চোখ জ্বলছে। চট করে মনে হয়, লাল ফুল ফুটে রয়েছে। অর্জুন টর্চ জ্বালল। সঙ্গে-সঙ্গে নীচের খোলা জমি আলোকিত—আর এক ডজন হরিণ অবাক চোখে এক পলক তাকিয়ে দে দৌড়-দৌড়! যেন রঙের বিদ্যুৎ বয়ে গেল। নন্দিনী বলে উঠল, "বিউটিফুল।" অর্জুন টর্চ নিবিয়ে ফেলল।

এমনি করে রাত বারোটার মধ্যে ঝিঁঝির ডাক শুনতে-শুনতে ওরা একটা ভালুক দেখল, একদল বাইসনকেও। বুনো শুয়োরগুলো ঝামেলা করল

কিছুক্ষণ। সব-শেষে এক জোড়া গণ্ডার। গায়ে আলো পড়া সত্ত্বেও তারা নড়তে চাইছিল না। যেন পৃথিবীর কোনও বস্তুকেই তাদের ভয় নেই।

মেয়েরা এ সব দেখে খুব আনন্দিত। নন্দিনী বলল, "এ বার বাঘ এলে ষোলকলা পূর্ণ হয়। বাঘ আসবে মনে হয়?"

"এখানে খুব অল্প বাঘ আছে। দুটো শুনেছি বেশ বুড়ো।"

"উঃ, আপনি খুব বেরসিক।" নন্দিনী মন্তব্য করল।

রাত দেড়টা পর্যন্ত আর কোনও জন্তু এ-তল্লাটে এল না। অর্জুনের মনে হল, যারা টর্চের আলো দেখে গিয়েছে—তারা বাকি সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছে। হয়তো জন্তু-জানোয়াররা নিজেদের মধ্যে ইশারায় কথা বলতে পারে।

দেড়টার একটু আগে পুনম আর টিনা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ল। ঘুমে নাকি ওদের চোখ জুড়ে আসছে। চিঙ্কি চাদরটা মেঝেতে পেতে বলল, তেমন কোনও ইন্টারেস্টিং জন্তু এলে ওকে যেন ডেকে দেওয়া হয়।

এখন ওয়াচ টাওয়ারে অর্জুন আর নন্দিনী জেগে আছে। চার পাশের অন্ধকার বেশ পাতলা হয়ে এসেছে। অর্জুনের মনে হল, কারও পায়ের আওয়াজ হল। অর্জুন টর্চ নিয়ে সজাগ হল। আওয়াজটা সামনে এলে সে সুইচ টিপবে। এত কাছ থেকে বন্যজন্তু দেখা খুবই রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আওয়াজটা এগিয়ে আসছে। সামনে আসামাত্র টর্চ জ্বালল অর্জুন। আর সঙ্গে-সঙ্গে জন্তুটা আলো লক্ষ্য করে ওপরের দিকে তাকাল। কিন্তু পাঁচ ব্যাটারির আলোর তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সে মুখ নামিয়ে নিল। ততক্ষণে নন্দিনী অর্জুনের হাত আঁকড়ে ধরেছে। দু' পায়ে দাঁড়িয়ে আছে যে জন্তুটা, সেটা গোরিলা নয়, কিন্তু বিশাল হনুমান বলতেই হবে। চোখে আলো পড়ায় জন্তুটা যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। আর তখনই একটা শিসের আওয়াজ কানে এল। সুইচ অফ করে দিল অর্জুন। মুহূর্তেই অন্ধকার যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল চারধার থেকে। চাপা গলায় নন্দিনী বলল, "সেই জন্তুটা।"

অর্জুনের কোনও সংশয় ছিল না। ইনিই আজ সকালে গাছের ডাল থেকে তার ওপর লাফিয়ে পড়েছিলেন। হনুমান এত বড় হয়, তার জানা ছিল না। এই হনুমান কি সেই মৃতদেহটাকে রাস্তা পার করে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল? কার স্বার্থে? শিসটা এখন বেশ স্পষ্ট হচ্ছে। জঙ্গলে শব্দ হচ্ছে এগিয়ে আসার।

মানুষ আসছে। অর্জুন ঘুমন্ত মেয়েদের দিকে তাকাল। হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙে যায় কারও, আর কথা বলে ওঠে, তা হলেই চিত্তির। নন্দিনী হাত সরিয়ে নিয়েছিল। সে ফিসফিস করে বলল, "অ্যালার্ট থাকুন, কথা বলবেন না।"

শিসটা খোলা জমিতে এসে থামল। অন্ধকার আবার মিইয়ে যাওয়ায় অর্জুন মানুষটার অবয়ব দেখতে পেল। এবং তারপরেই টর্চ জ্বলল। যে লোকটা টর্চ

জ্বেলেছে, তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু হনুমানটা তার উত্তেজনা লোকটার কাছে প্রকাশ করে যাচ্ছে। এবং তখনই আলো নিবে গেল।

ওয়াচ-টাওয়ারটা মাটি থেকে যে উচ্চতায়, তাতে রাত্রের অন্ধকারে নীচ থেকে কেউ ওপরে আছে কিনা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। টর্চ নিবে যাওয়ার পর জঙ্গল যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠল। যে এসেছিল, সে যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে এরই মধ্যে। অর্জুন কী করবে বুঝতে পারছিল না। তার অবশ্য কিছু করারও উপায় নেই, একমাত্র বসে লক্ষ করে যাওয়া ছাড়া। সে ঘুমন্ত মেয়েদের দিকে তাকাল। জেগে উঠলে ওরাই বিপদ ডেকে আনতে পারে।

নীচে কোনও শব্দ নেই। যদি সেই লোকটা এখনও আড়ালে অপেক্ষা না করে থাকে, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, অন্ধকার জঙ্গলে পথ চলতে সে খুবই ওস্তাদ। এই মুহূর্তগুলো খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। যে জানান দেবে, সে ধরা পড়ে যাবে। নন্দিনী বসে আছে পাথরের মতো। ব্যাপারটা তারও নজরে পড়েছে। মেয়েটার নার্ভ আছে, মনে-মনে স্বীকার করল অর্জুন।

মিনিট-তিনেক বাদে নীচের সিঁড়িতে শব্দ হল। খুব হালকা। কেউ কি উঠে আসছে ? সাপ ? অর্জুন সন্তর্পণে মাথা নোয়াল। এখন যদি নীচ থেকে কেউ টর্চের ফোকাস ফেলে, তা হলে সে ধরা পড়বে। কিন্তু একদলা অন্ধকার নিঃশব্দে ওপরে উঠে আসছে। মাঝে-মাঝে থমকে দাঁড়াচ্ছে। বোধহয় সরাসরি উঠে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

অর্জুন লম্বা লাঠিটা তুলে ধরল। যেই হোক, ওপরে উঠে এলেই আঘাত করবে। তার খেয়াল ছিল না যে, সিঁড়ির ওপরের কয়েকটা ধাপ খুলে রেখেছিল সে। ওই পর্যন্ত এসে জন্তুটা যেন থমকে দাঁড়াল। হনুমানটাকে এবার স্পষ্ট দেখতে পেল সে। এত বড় হনুমান কখনও দেখেনি সে। জন্তুটাও যেন তাকে লক্ষ করল। তার পর সরসর করে নীচে নেমে গেল। যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছে জন্তুটা।

অর্জুনের উত্তেজনা সামান্য কমল। কয়েকটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল। এই জন্তুটাকে চমৎকার ট্রেনিং দিয়েছে যে-লোকটা, সে নীচেই দাঁড়িয়ে আছে। মৃতদেহ রাস্তার এ পাশে বয়ে নিয়ে আসা অত বড় হনুমানের পক্ষেও সম্ভব কি না সেটা ভাবনার ব্যাপার, কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও ব্যাখ্যা নেই। ওই মৃতদেহের সঙ্গে এই হনুমান এবং তার মালিক জড়িত। লাঠিটাকে হাতছাড়া করছিল না অর্জুন। সময় কাটছে। একটু-একটু করে এক ঘণ্টা কেটে গেল। জঙ্গলের যে সব শব্দ মরে গিয়েছিল, সেগুলো আবার জীবন্ত হল। অর্জুনের বিশ্বাস, ধারে-কাছে আর কেউ নেই। যে এসেছিল, সে সতর্ক হয়ে ফিরে গিয়েছে।

এবার নন্দিনী চাপা স্বরে বলল, "কী ব্যাপার বলুন তো ?"

অর্জুন বলল, "আজ রাত্রে আর কিছু দেখা যাবে বলে মনে হয় না।"

কিন্তু দেখা গেল। ভোরের সামান্য আগে জঙ্গলে শব্দ হতে লাগল। পুনম, চিঙ্কি টিনা উঠে বসেছে। চিঙ্কি বলল, "আঃ, কী ফাইন আকাশ। ওইটে শুকতারা, না?"

নন্দিনী চাপা শব্দ করল। ওরা চুপ করে গেল তৎক্ষণাৎ। তারপরেই দেখা গেল একদঙ্গল হাতি জঙ্গল মাড়িয়ে খোলা জমিতে চলে এল। গাছের ডাল-পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে ওরা গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গেল। পুনম বলল, "ফ্যান্টাস্টিক। এ রকম দৃশ্য দেখার জন্যে হাজার হাজার মাইল যাওয়া যায়।"

নন্দিনী হাই তুলল, "তোরা তো সারা রাত ঘুমিয়েই কাটালি।"

টিনা জিজ্ঞাসা করল, "আমরা কি কিছু মিস করেছি?"

"প্রচুর। দারুণ একটা নাটক হতে যাচ্ছিল। আমরা যে জন্তুটাকে কাল দেখেছিলাম, সেটা একটা হনুমান।"

"যাঃ।" তিনটে গলা থেকেই একসঙ্গে বিস্ময় ছিটকে এল।

ভোরের রোদ ফোটা মাত্র মিস্টার বিশ্বাস গাড়ি নিয়ে চলে এলেন। রাত জাগার চিহ্ন ওঁর সমস্ত শরীরে। সিঁড়ি লাগিয়ে সবাই নেমে আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী-কী জিনিস দেখতে পেলেন, বলুন!"

নন্দিনীরা উচ্ছ্বসিত গলায় জন্তুদের নাম বলে গেল। অর্জুন চুপ করে ছিল। মেয়েরা কথা শেষ করতে জিজ্ঞেস করল, "আপনার এক্সপিডিশনের খবর কী?"

"চারজন ধরা পড়েছে। ওরা প্ল্যান করেছিল, হলং ফরেস্ট বাংলোটাকে পুড়িয়ে দেবে। আপাতত আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চলুন ফেরা যাক।"

ভোরের জঙ্গলের একটা নিজস্ব গন্ধ থাকে। রাত জাগার ক্লান্তি সত্ত্বেও সেটা বেশ ভাল লাগছিল। জিপ সোজা চলে এল বাংলোর লনে। মেয়েরা প্রথমে নামল। এবং তখনই নন্দিনী বলে উঠল, "মাই গড।"

জিপে বসেই অর্জুন দেখল, ভার্মা-সাহেব আর একটি পাগড়ি-পরা লোকের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে এগিয়ে আসছেন। নন্দিনীরা সঙ্গে সঙ্গে বাংলোর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। ভদ্রলোক বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। বিশ্বাস বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।" তা হলে আমার বাড়িতে চলুন। চা খেতে-খেতে শোনা যাবে।" জিপ চালু হতেই ভার্মা-সাহেব এ দিকে তাকালেন। জিপের ভেতর কারা আছে, তা তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় দূরত্ব এবং আড়ালের জন্য। কিন্তু অর্জুন ভার্মা-সাহেবের সঙ্গী পাঞ্জাবী যুবকটিকে দেখে নিয়েছে। ভার্মা-সাহেবকে যতটা চকচকে এবং টাটকা দেখাচ্ছে পাঞ্জাবি যুবকটিকে তার বিপরীত লাগছে। জামা-কাপড় এবং মুখে একটা তেলতেলে ধুলো মাখানো। রাত জাগলে যেমনটা হয়।

pathagar.net

অর্জুন ঠোঁট কামড়াল।

মিস্টার বিশ্বাসের কোয়ার্টার্সে পৌঁছে মুখ-হাত ধুয়ে ওরা বারান্দায় বেতের চেয়ার নিয়ে বসল। ভদ্রলোক একাই থাকেন। কিন্তু ব্যাচেলররা সাধারণত যেমন অগোছালো হয়, এই ভদ্রলোক তেমন নন। ভৃত্যকে চায়ের হুকুম দিয়ে তিনি ভেজা সকাল, ছায়া-ছায়া রাস্তা আর গাঢ় জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিছু আবিষ্কার করলেন নাকি?"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "শেষ কবে জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারদের পায়ের ছাপ গোনা হয়েছে?"

"বছরখানেক তো বটেই।"

"আপনি একটা খবর জানেন, এই জঙ্গলে এমন একটি হনুমান আছে, যে রোগা-পটকা মানুষের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যেতে পারে।"

"ইমপসিবল।"

"অসম্ভব হলেও সেটা সত্যি।"

"আমি বিশ্বাস করি না। একটা গোরিলা, যেমন ধরুন গল্পের কিংকং যা পারে, কোনও হনুমান—তা সে যতই বড় হোক পারা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু গতকাল মেয়েরা যে প্রাণীটিকে দেখেছিল, যে কিনা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সে একটা ম্যাগনাম সাইজের হনুমান। রাত্রে তাকে আমরা ওয়াচ-টাওয়ারের সিঁড়িতে দেখতে পেয়েছি। হনুমানটা ট্রেইন্ড, একটি লোক ছিল সঙ্গে।"

"লোকটিকে চিনতে পেরেছিলেন?"

"না। হনুমানটা তাকে সতর্ক করে দিতেই সে আড়ালে চলে গিয়েছিল।"

একটু ভাবলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, "এমন হতে পারে, মেয়েরা হনুমানটাকে ঠিকই দেখেছিল। সে রাস্তা পার হয়ে মৃতদেহটি ঠিক আছে কি না দেখেছিল। তারপর তার মানুষ মনিব এসে ওটাকে তুলে ও পারের জঙ্গলে লুকিয়ে রাখে। হতে পারে না?"

pathagar.net

অর্জুনের মনে হল, হতেই পারে। সে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "এতে বোঝা যাচ্ছে, কারও ইন্টারেস্ট আছে। আপনি, মৃত লোকটি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন?"

"মিস্টার আহমেদ কাল রাত্রে বললেন, ওকে ছিনতাই করতে গিয়ে খুন করা হয়েছে। ওর কাছে পরিবারের অনেক পুরনো একটা সোনার গহনা ছিল। সেটা বিক্রি করতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। এ দিকের গরিব মানুষের কাছে সোনা থাকাও মুশকিল।"

চা এসে গেল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার ভার্মা, যিনি লনে পায়চারি করছিলেন একটু আগে, তাঁর সঙ্গে যে লোকটি ছিল, তাকে চেনেন?"

"কেন বলুন তো?"

"এই লোকটিও গত রাত্রে ঘুমায়নি। মিস্টার বিশ্বাস, আপনাকে একটু বিরক্ত করব?"

"বেশ তো। বলুন না।"

"মৃত মানুষটি যে-গ্রামে থাকে, সেখানে একবার যেতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে। হেঁটে যেতে অনেক সময় লাগবে। আপনি ব্রেকফাস্ট খেয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। আমি ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো?"

অর্জুন তাঁকে মালবাজারের ঘটনা, জগুদার কাছে শোনা কাহিনী খুলে বলল। মিস্টার বিশ্বাস শুনতে-শুনতে মাথা নাড়ছিলেন। অর্জুন শেষ করল, "ব্যাপারটা বুঝুন। ওই মিস্টার ভার্মা কি মিস্টার পুরি এই বাংলোতেই আমাদের সঙ্গে এসে জুটেছেন।"

"কিন্তু ভার্মা আসার আগেই খুনটা হয়েছে। আর ওঁর মতো একজন রেসপেক্টেড ভদ্রলোক জঙ্গলে ঢুকে গরিব মানুষকে খুনই বা করতে যাবেন কেন?"

"মিস্টার পুরি?"

"তিনিও তো বিকেল নাগাদ এসেছেন।"

"এই পুরি ভদ্রলোক কি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন?"

"আমি জানি না। খবর নিতে হবে।"

অর্জুন উঠে পড়ল। জিপ আসবে দশটা নাগাদ। তার আগে একটু বিছানায় গড়িয়ে তাজা হয়ে নেওয়া দরকার। পাখি ডাকছে দু' পাশের জঙ্গলে। নুড়ি-বিছানো পথ দিয়ে অর্জুন বাংলোর দিকে হাঁটছিল। এক নম্বর কালভার্টের কাছে পৌঁছে সে ঝোরার জলের দিকে তাকাল। তিরতিরিয়ে বয়ে যাচ্ছে স্রোত। পৃথিবী এখন চমৎকার। এখানে যে লোকটা গতকাল মেয়েদের অনুসরণ করতে-করতে জঙ্গলে মিলিয়ে গিয়েছিল—তার সঙ্গে ভার্মা-সাহেবের সঙ্গে লনে কথা বলতে আসা লোকটার চেহারার কোনও মিল নেই। গতরাত্রে জঙ্গলের ভেতরে যে টর্চ নিয়ে হনুমানটার সঙ্গে এসেছিল, তারা চেহারাও ভাল করে দেখতে পায়নি সে। অর্জুন কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করল। তারপর বাংলোর দিকে পা বাড়াল।

লনে কেউ নেই। সেই ট্যাক্সি আর তার ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা অর্জুনকে দেখতে পেয়ে যে ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছে, তা তার মুখ দেখে বোঝা গেল। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করল না সে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে বেয়ারাটার সঙ্গে দেখা হওয়ায় বলে দিল চটপট ঘরে ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসতে।

রাত জাগলে ভোরবেলায় স্নান করলে শরীর অনেকখানি তাজা হয়ে যায়। ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে জামা-প্যান্ট খুলতে-খুলতে সে কাগজটাকে দেখতে

পেল। তিন ভাঁজ কাগজটা মাটিতে পড়ে আছে। সম্ভবত ওপরের ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে কেউ ফেলে দিয়েছে ঘরে। ওটা তুলে নিল অর্জুন। ইংরেজিতে লেখা, 'তুমি কেন শুরু থেকে আরম্ভ করছ না ?' হাতের লেখা চেনার উপায় নেই, কারণ প্রতিটি অক্ষরই ইচ্ছে করে ক্যাপিটাল হরফে লেখা হয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার। সাধারণত শত্রুপক্ষের লোকেরা যদি অস্তিত্ব জেনে যায়, তা হলে হুমকি দেবার চেষ্টা করে। সরে না দাঁড়ালে মৃত্যু অনিবার্য—এমন কথাই লেখা থাকে। এ তো হুমকির বদলে উপদেশ। এই জঙ্গলে তার শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ আছেন নাকি ? তিনি কেন চোরের মতো উপদেশ দেবেন ?

ঘুম আসেনি। উত্তেজনা থাকলে রাত জাগার পরেই সকালে ঘুম পালিয়ে যায়। কিন্তু স্নান-খাওয়ার পর কিঞ্চিৎ অবসাদ ছাড়া তেমন কিছু অসুবিধে হচ্ছে না।

জিপে ড্রাইভার ছাড়া কেউ নেই। ওর কাছেই শোনা গেল, রেঞ্জার মিস্টার বিশ্বাস এখন বিশ্রাম করছেন। অথচ এই ড্রাইভারটিকেই গত রাত্রে সে দেখেছিল—এর কি বিশ্রামের কোনও প্রয়োজন নেই ? একটু খারাপ লাগল অর্জুনের। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি জানেন, আমি কোথায় যেতে চাই ?"

"জানি স্যার। তবে গ্রাম পর্যন্ত জিপ যাবে না। একটু হাঁটতে হবে আপনাকে।"

অর্জুন মাথা নাড়ল। ক্রমশ জঙ্গলের গভীরতম অংশ পেরিয়ে জিপ চলে এল ফাঁকা জায়গায়। জঙ্গল যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই গ্রাম শুরু হয়নি। গাড়ি গেল একটা ঝোরা পর্যন্ত। এখানে কোনও সাঁকো নেই। প্যান্টের নীচটা গুটিয়ে জল পার হল অর্জুন। পায়ে-হাঁটা পথ, এবড়ো-খেবড়ো। জঙ্গুলে। জিপের পক্ষেও আসা সম্ভব ছিল না। মিনিট-পাঁচেক যাওয়ার পর গোরুর গলার ঘণ্টা আর মুরগির ডাক শোনা গেল। শেষ পর্যন্ত গ্রামটাকে দেখতে পেল সে। খড়ের চাল, মাটির দাওয়া, কিছু কৃষিজীবী মানুষের বাস বোঝা গেল। গ্রামের মুখটাতেই একটা লোক সাইকেল নিয়ে খাঁকি হাফ-প্যান্ট আর শার্ট পরে দাঁড়িয়ে। তাকে ঘিরে কিছু খালি গায়ের গ্রামের মানুষ। ওকে দেখতে পেয়ে লোকটা কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করল, "নমস্তে সাব। বড়া-সাব আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনাকে সাহায্য করতে। আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করি। চার নম্বর বিটে আছি।"

অর্জুন তাকে নমস্কার করল, "এখানকার মানুষ জানে মৃত্যু ব্যাপারটা ?"

"হ্যাঁ সাব। কালই খবর পেয়েছে। কিন্তু কেউ যায়নি।"

"যায়নি কেন ?"

"গেলে তো মুশকিল। ডেডবডি আলিপুরদুয়ারের হসপিটালে নিয়ে যেতে

হবে পোস্টমর্টেম করতে। সেখান থেকে আবার গ্রামে ফিরিয়ে আনতে হবে। বেশ মোটা খরচ। এদের সেই সামর্থ্য নেই। না গেলে পুলিশই নিজে থেকে সে সব করিয়ে পুড়িয়ে দেবে।"

খারাপ লাগল, কিন্তু খুব একটা অবাক হল না অর্জুন। ইতিমধ্যেই সে বুঝে গেছে, পেট ভরে খাওয়ার সামর্থ্যই এদের নেই। সে জিজ্ঞেস করল, "লোকটির ছেলে-মেয়ে বা স্ত্রী নেই?"

"আছে। আমি ওদের আপনার কথা বলে আটকে রেখেছি। আসুন সাব।"

"আটকে রেখেছেন মানে? কোথায় যাচ্ছিল ওরা?"

"পেটের ধান্দায়। এক দিন বাড়িতে বসে-থাকা মানে পেটে দানাপানি না-দেওয়া।"

অর্জুন লোকটিকে অনুসরণ করল। তাদের পেছন-পেছন গ্রামের লোকজন চলল। একটা জীর্ণ কুটিরের সামনে গিয়ে সে চার-পাঁচটা শীর্ণ বাচ্চা আর তাদের মাকে দেখতে পেল। মহিলাটির শরীরে শতচ্ছিন্ন শাড়ি এবং তারই আঁচল দিয়ে তিনি চোখ মোছার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বাচ্চাগুলো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

পেছনে ভিড়টা আরও বেড়েছে। এই অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদ কতটা ফলপ্রসূ হবে, তাতে সন্দেহ আছে। তবু সে জিজ্ঞেস করল, "যিনি মারা গিয়েছেন, তিনি আপনার স্বামী?"

মহিলা উত্তর দিলেন না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকটি কথাগুলো আদিবাসী ভাষায় উচ্চারণ করল। বাংলা ভাষার সঙ্গে কয়েকটা ক্রিয়াপদের তফাত ছাড়া তেমন পার্থক্য নেই।

এবার মহিলা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

"ওঁর সঙ্গে কারও ঝগড়াঝাঁটি ছিল?"

মহিলা মাথা নাড়লেন, না।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকটি বলল, "সাব, ওর পক্ষে এখন কথা বলা সম্ভব নয়। এত লোক দেখে লজ্জাও পাচ্ছে। ওর ভাসুরের সঙ্গে কথা বলুন। সে খুব ভাল মানুষ।" বলে সামনে দাঁড়ানো এক প্রৌঢ়কে দেখিয়ে দিল। লোকটির পরনে খাটো ধুতি, খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত জমাট ধুলো। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকটি তাকে কাছে ডেকে বাকিদের চিৎকার-চেঁচামেচি করে দূরে সরিয়ে দিল। প্রৌঢ় নমস্কার করে কাছে এসে দাঁড়াল। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, "এ রকম হবে তুমি জানতে?"

প্রৌঢ় দুই হাত জড়ো করে দাঁড়াল, "আমি ভয় পেতাম।"

"তোমার ভাই কী করত?"

"আগে চাষ করত। কিন্তু তাতে ওর পেট, মন কিছুই ভরত না। শেষে

তামাক নিয়ে হাটে-হাটে ঘুরে বিক্রি করত। এতে কাঁচা পয়সা আসত ঘরে। তাই দিয়ে ধার শোধ করত। আমি বলতাম, ভগবান যা দিচ্ছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাক। বেশি লোভ করিস না। কিন্তু আমার কথা কানে তুলল না।"

"ওর অবস্থা কেমন ছিল?"

"আগে খুব খারাপ। এখন একটু ভাল হচ্ছিল।"

"তোমরা ক' পুরুষ ধরে এখানে আছ?"

"অনেক-অনেক দিন।"

"এত অভাব যখন ঘরে, তখন সোনার গহনাটা কী করে থেকে গেল?"

প্রৌঢ় মুখ নামাল, "ঘরে কোনও সোনা দূরে থাক, রুপোও ছিল না। আপনি নিজের চোখেই আমাদের [illegible] তো দেখছেন।"

"তুমি জানো, ও সোনা বিক্রি করতে গিয়েছিল?"

প্রৌঢ় উত্তর দিল না। কিন্তু চোরা-চোখে দূরে দাঁড়ানো গ্রামবাসীদের দিকে তাকাল। অর্জুন বলল, 'তুমি এড়িয়ে যেও না। আমি তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি।"

প্রৌঢ় এবার গলা নামাল, "আমি তো ওই ব্যাপারেই সাবধান করেছিলাম। বেশি লোভ করিস না। কথাটা কানে নিলে এভাবে মরতে হত না।"

"সোনাটা ও পেয়েছিল কোথায়?"

"তা আমি জানি না। বলেনি আমাকে। কোনও এক হাটে কার সঙ্গে নাকি আলাপ হয়েছিল। সে বলেছিল এক ভরি সোনা যদি বিক্রি করে দেয়, তা হলে একশো টাকা পাবে।"

"কত টাকায় বিক্রি করতে বলেছিল?"

"তা আমাকে বলেনি ও।"

"সোনাটা তুমি দেখেছ?"

মাথা নাড়ল প্রৌঢ়, "একটা গোল আংটির মতো, কিন্তু ঠিক আংটি নয়।"

"এই গ্রামের আর কেউ সোনা বিক্রির ব্যবসায় নেমেছে?"

লোকটা চোরা-চোখে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল, "জানি না আমি।"

"তোমার কাউকে সন্দেহ হয়, যে ওকে খুন করতে যাবে?"

"না।"

অর্থাৎ, আর কোনও নতুন তথ্য পাওয়া যাবে না। প্রৌঢ় ভয় পাচ্ছে। অর্জুনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ-গ্রামে আরও লোক আছে যাদের সোনা বিক্রির ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়েছে। সে মনে মনে হতাশ হল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকটি অবাক হয়ে শুনছিল এ সব কথা। শেষ হওয়ামাত্র বলল, "হায় বাপ। সোনা বিক্রি করার ক্ষমতা হয় এদের! হাঁ সাব, ধংমালি গ্রামের একটা লোক সোনার আংটি বিক্রি করতে গিয়েছিল মাদারিহাটে। লোকটার তিন কুলে কেউ সোনা দেখেনি। সবাই ভেবেছিল, চোরাই সোনা।

আসার পথে কারা যেন মারধোর করে সোনা কেড়ে নিয়েছে।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ধংমালি গ্রাম এখান থেকে কত দূরে ?”

“সাইকেলে এক ঘণ্টা লাগবে।”

“জিপ যায় ?”

“হাঁ সাব।”

“আমাকে নিয়ে যাবেন ?”

লোকটা মাথা নেড়ে এগিয়ে চলল। প্রায় বোবা হয়েই গ্রামের লোকগুলো তাদের যেতে দিল। ঝোরা পেরিয়ে জিপে উঠল অর্জুন। আর লোকটা তাদের সামনে সাইকেল চালাতে লাগল। ধংমালি গ্রামে যখন পৌঁছাল তারা, তখন সূর্যদেব মধ্যগগনে। জিপ ছেড়ে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর গ্রামের মুখটায় পৌঁছে অর্জুন বলল, “আমি ভেতরে যাব না, আপনি ওকে ডেকে আনুন।”

মিনিট-পনেরো বাদে একটি উদ্‌ভ্রান্ত মানুষকে নিয়ে ফিরে এল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীটি। এনে আলাপ করিয়ে দিল।

অর্জুন তাকে বলল, “শুনলাম, আপনি সোনা বিক্রি করতে চান। আমি কিনব।”

লোকটা মাথা নাড়ল, “সোনা তো আর নাই।”

“বিক্রি করে দিয়েছেন ?”

“না, যাদের সোনা তারা নিয়া নিল।”

“কেন ?”

“আমারে মাদারিহাটে সবাই চোর ভাবছে, আমি বিক্রি কইরতে পারি নাই, তাই।”

“কার সোনা ?”

“সে-কথা বলতে নারব বাবু। বললে আমাকে মেরে ফেলবে। কী পাপে যে রাজি হইছিলাম, এখন রাইতে ঘুম নাই, দিনে কাম কইরতে পারি না।”

“কাল যার মৃতদেহ জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছে, তাকে চেনো ?”

“চিনি বাবু। আমার স্যাঙাত ছিল। ওই তো আমারে নিয়া যায় সেখানে।”

“কোন খানে ?”

“জঙ্গলের ভেতর। আর কিছু প্রশ্ন না করেন বাবু।”

“দ্যাখো, লোকগুলো অত্যন্ত অন্যায় কাজ করছে। তুমি যদি সাহায্য করো, তা হলে ওই বদমাশ লোকগুলো শাস্তি পেতে পারে।”

“তার আগে আমারে মাইর‍্যা ফেলবে বাবু। হাতে-পায়ে ধইর‍্যা একবার বাইচ্যা আইছি। আমি যাই এখন।”

“ওদের মধ্যে কারও মোটরবাইক ছিল ?”

“হ।” ঘাড়-নাড়ল লোকটা। তারপরেই খেয়াল হতে দ্রুত গ্রামের দিকে

পা চালাল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অর্জুন জিপে উঠে বসল। রহস্য এবং তার সন্ধানের পথে অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে সে, এমন মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেকে সতর্ক করল সে, এ সব নিয়ে তার মাথা ঘামানোর কথা নয়। সে যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছে, তাতে তার এখন বাংলোয় থাকা উচিত।

জিপটা যখন গ্রামের রাস্তা ছাড়িয়ে জঙ্গলে ঢুকল, তখন অন্য-একটা চিন্তা তার মাথায় এল। সে যে এই দুটো গ্রামে এসেছে, খবরটা যাদের দরকার তারা পেয়ে যাবেই। সেটা পাওয়ার পর কী ঘটতে পারে। এই সময় দূরে একটা মোটরবাইকের আওয়াজ হল। আর আওয়াজটা এ দিকেই এগিয়ে আসছে। অর্জুন চটপট জিপের ড্রাইভারকে থামতে বলল। লোকটা ব্রেক কষতে সে লাফিয়ে নেমে পড়ল, "আপনি আধ কিলোমিটার এগিয়ে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, তা হলে বলবেন একাই যাচ্ছেন।"

ড্রাইভার বলল, "এগিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। আমি এখানেই বনেটটা খুলে ইঞ্জিন দেখি। কেমন একটা সাউন্ড হচ্ছে।"

অর্জুন দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। বড় ঘাস আর শাল-সেগুনের গাছে জায়গাটা ছায়ায় মাখামাখি। একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে দেখল, ড্রাইভার বনেট খুলে ঝুঁকে ইঞ্জিন দেখছে। মোটরবাইকের আওয়াজ বাড়ছিল। অর্জুন রাস্তার খানিকটা দেখতে পাচ্ছিল। ওখান থেকে বাঁক নিয়েছে ডান দিকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ধুলো উড়িয়ে মোটরবাইকটা চলে এল। যে চালাচ্ছে তার মাথায় হেলমেট, পেছনে আর-একজন বসে রয়েছে। জিপের কাছে এসে বাইকের গতি কমে এল। জিপটাকে ছাড়িয়ে আরও কিছুটা গিয়ে সেটা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বাঁক নিয়ে ঘুরে চলে এল জিপের গায়ে। শব্দ পেয়েই যেন জিপের ড্রাইভার মুখ তুলল। পেছনে যে বসে ছিল সে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ওস্তাদ ? কোনও গোলমাল ?"

ড্রাইভার বলল, "খুব গরম হয়ে গিয়েছিল।"

"তা তো হবেই।" লোকটা হ্যা-হ্যা করে হাসল, "চার পাশের হাওয়াই গরম।"

হেলমেটধারী হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, "যাকে নিয়ে গিয়েছিলে, সে কোথায় ?"

"কাকে ?"

"একটা বাঙালি ছোকরাকে। ন্যাকামি কোরো না।"

ড্রাইভার যেন মুশকিলে পড়ে গেল, "তিনি তো অনেক আগেই নেমে গিয়েছেন।"

"কোথায় ?"

pathagar.net

"ওই গ্রামের কাছেই।"

"বেইমানি করো না।"

"বেইমানির প্রশ্ন ওঠে না। আমি তোমার নুন খাইনি।"

"তার মানে তুমি মিথ্যে বলছ?"

"সেটা তুমি যা ভাবলে ভাল লাগে তাই ভাবতে পারো।"

"এভাবে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। ঠিক আছে।" হেলমেটধারী পেছনের লোকটাকে কিছু বলতেই সে নেমে দাঁড়াল। মোটরবাইক চলে গেল গ্রামের দিকে। এবার লোক. এগিয়ে এল জিপের কাছে, "আমাকে একটু ফরেস্ট বাংলোয় পৌঁছে দাও।"

"আরে এটা গবমেন্টের গাড়ি, পাবলিকের ওঠা নিষেধ।"

"ছোড়ো ওস্তাদ। যে ছোকরাকে নিয়ে এসেছিলে, সেটাও পাবলিক।"

"কে বলেছে তোমাকে?"

"মালবাজার থেকে পেছন নিয়েছে। বস গোলমাল করতে চায় না বলে এখনও বেঁচে আছে। ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হল?"

মোটরবাইকের আওয়াজ মিলিয়ে গিয়েছে। জঙ্গলের নিস্তব্ধতায় অর্জুন চটপট মতলব ঠিক করে ফেলল। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে পেছন ফিরে। কিন্তু ওর কাছে পৌঁছতে যে সময় লাগবে তাতেই ও দেখে ফেলবে তাকে। নীচ থেকে একটা বড় পাথর কুড়িয়ে ডান দিকের জঙ্গলে ছুঁড়ল সে। হুড়মুড় শব্দ করে গাছপালায় আলোড়ন তুলে সেটা যখন নীচে পড়ল তখন ড্রাইভার আর লোকটা চমকে সে দিকে ফিরে তাকিয়েছে। লোকটা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

ড্রাইভার বলল, "হাতি নাকি?"

"না, না। হাতি দূর থেকেই বুঝিয়ে দেয়।"

"গিয়ে দ্যাখো না।"

লোকটা সাহস দেখাল। সাবধানী পা ফেলে এগিয়ে গেল বিপরীত দিকে মুখ করে। আর তৎক্ষণাৎ গাছের আড়াল ছেড়ে অর্জুন চলে এল জিপের গায়ে। এসে নিজেকে লুকিয়ে রাখল। লোকটার গলা শোনা গেল, "দুর, কিস্সু নেই। কিন্তু কিছু একটা পড়েছে। তোমার ইঞ্জিন যা ঠাণ্ডা হয়েছে, তাতেই চলতে হবে ওস্তাদ!" লোকটা ফিরে আসছিল।

অর্জুন অপেক্ষা করছিল। লোকটা ড্রাইভারের সামনে এসে দাঁড়াতেই সে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আচমকা আক্রমণে লোকটা এমন নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল যে, কথা বলার সুযোগ পেল না। তাকে মাটিতে উপুড় করে ফেলে যখন অর্জুন পিঠের ওপর উঠে বসেছে, তখন লোকটার একটা হাত কোমরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেটাকে মুচড়ে ধরতেই আর্তনাদ করে উঠল সে। কোমর থেকে একটা ধারালো ক্ষুর উদ্ধার করল অর্জুন। বাঁ পকেটে একটা লম্বা

মুখ-বন্ধ টিউব। ড্রাইভারকে সে বলল, "একটা দড়ি আছে ?"

ড্রাইভার দেরি করল না। ভাল করে হাত-পা বেঁধে ওকে জিপে তোলা হল। জিপ চালু করতে অর্জুন টিউবটা সন্তর্পণে খুলল। কিছু দিন আগে পর্যন্ত যে রকম সিরিঞ্জে টিকা দেওয়া হত, তারই একটা। ভেতরে তরল পদার্থ আছে। হাত-পা বাঁধা লোকটা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সিরিঞ্জটাকে দেখছিল। অর্জুন চোখের সামনে থেকে সেটাকে নামিয়ে লোকটার হাতের দিকে নিয়ে যেতেই পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠল সে, "না, না, আমাকে মেরে ফেলবেন না, পায়ে পড়ি আপনার, না !" তার চোখ দুটো ভয়ে ঠিকরে বেরিয়ে পড়ছে যেন।

"এটা দিয়েই খুনটা করেছ ?"

"আমি করিনি। বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি।"

"কে করেছে ?"

"আমি জানি না।" ঘন-ঘন মাথা নাড়ল লোকটা।

"তোমাকে বলদেব জিপের কাছে থেকে যেতে বলল কেন ?"

লোকটা সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। অর্জুন সিরিঞ্জটা নাড়ল, "আমি পুলিশ নই। খুন করতে আমার কিন্তু অসুবিধে হয় না।"

"ও সন্দেহ করেছিল এই ড্রাইভার মিথ্যে বলছে।"

"তোমাদের বস কে ?"

"আমি জানি না।"

"আমি বেশি কথা বলা পছন্দ করি না।"

লোকটা কুঁকড়ে যাচ্ছিল। অর্জুন হাসল, "সোনাগুলো কোত্থেকে আসছে ?"

"ইয়ে, নেপাল থেকে।"

"খাঁটি সোনা ?"

"আমি জানি না।"

"এই সব গরিব লোকগুলোকে কেন ব্যবহার করছ ? চোরাই সোনার তো অনেক চ্যানেল আছে বিক্রি করার। এদের জড়াচ্ছ কেন ?"

"বস টাকা চায়। চটপট।"

"বস কে ?"

"আমি জানি না।"

গাড়ি তখন কালভার্টের ওপর উঠে এসেছে। অর্জুন ড্রাইভারকে জিপ থামাতে বলল। সেটা থামতেই সে নীচে নেমে দাঁড়াল, "এই জায়গাটা খুব ভাল। তোমাকে মেরে কালভার্টের নীচে শুইয়ে রাখলে কেউ টের পাবে না।"

"আমি ওকে মারিনি স্যার।" কঁকিয়ে উঠল লোকটা।

"কে মেরেছে ?"

"বলদেব।" আচমকা বলে ফেলে চুপ করে গেল লোকটা।

"অবশ্য যে মরে গিয়েছে, তার জন্যে ভেবে কী হবে। হনুমানটা কার ?"

"আমার।"

"কোথায় পেয়েছ?"

"কাশী থেকে এনেছিলাম। ইঞ্জেকশন দিয়ে বড় করেছি।"

"বাঃ, তুমি দেখছি অনেক কিছু জানো। তোমাদের বস কে?"

"আমি জানি না।"

অর্জুন ড্রাইভারকে বলল হাত লাগাতে। লোকটাকে ধরাধরি করে কালভার্টের নীচে নিয়ে যাওয়া হল। একে এখনই পুলিশের হাতে তুলে দিলে, কিছুতেই মুখ খুলবে না এটা সে বুঝতে পেরেছিল। হয়তো পুলিশের হেফাজতে থাকলেও ওকে খুন করে ফেলা হবে। তা ছাড়া, জিপের ড্রাইভারেরও একাই ফরেস্ট অফিসে ফিরে যাওয়া উচিত। বলদেব ফিরে এসে খবর পেয়ে যাবেই, যা এখনই ওকে জানানো উচিত নয়। সে ড্রাইভারকে বলল, "আপনি জিপ নিয়ে অফিসে ফিরে যান। মিস্টার বিশ্বাসকে সমস্ত ঘটনা বলবেন। তিনি যেন এখনই মিস্টার আহমেদকে নিয়ে বাংলো ঘেরাও করে রাখেন। আমি না ফেরা পর্যন্ত কেউ যেন বাংলোর বাইরে যেতে না পারে।"

"আপনি যাবেন না?"

"আমি হেঁটে যাব। এখানে যেন কেউ না আসে।"

ঘাড় নেড়ে ড্রাইভার জিপ নিয়ে চলে গেলে, অর্জুন কালভার্টের নীচে নেমে এল। সে দেখল, লোকটা গড়াতে গড়াতে জলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাকে দেখতে পেয়ে থেমে গেল লোকটা। অর্জুন হাসল, "পালাবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। স্পষ্ট কথা বলছি। তুমি যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো, তা হলে প্রাণে মারব না। নইলে তোমার লাশ এখানে পড়ে থাকবে।"

লোকটা পিটপিট করে তাকাল।

অর্জুন আবার জানতে চাইল, "তোমাদের বস কে?"

"আমি জানি না।"

অর্জুন সিরিঞ্জটা নিয়ে ঝুঁকে পড়ল, "আমি আর একবার প্রশ্ন করব।"

"মেমসাহেব।" ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করল লোকটা।

"মেমসাহেব? কোন মেমসাহেব?"

"আমি একবার দেখেছি। বলদেব সব জানে।" এই সময় একটা খসখস আওয়াজ পেছনে হতেই অর্জুন তড়াক করে ঘুরে দাঁড়াল। ঠিক হাত-পাঁচেক দূরেই দাঁড়িয়ে আছে হনুমানটা। এত বিশাল হনুমান সে কখনও দেখেনি। না, গোরিলার আকৃতি নিশ্চয়ই নয়, তবে অনায়াসে একটি মানুষকে ঘায়েল করতে পারে। হনুমানটা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে হাত-পা বাঁধা লোকটার দিকে। যদি ও আক্রমণ করে, তা হলে এই সিরিঞ্জটা ছাড়া কোনও অস্ত্র অর্জুনকে সাহায্য করবে না। কিন্তু ওর শরীরে যা লোম, সিরিঞ্জ ঢোকাবার আগেই যা ক্ষতি হবার তা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আক্রান্ত হবার আগেই আক্রমণ করা বুদ্ধিমানের

কাজ। সিরিঞ্জটাকে উঁচিয়ে ধরে অর্জুন আক্রমণ করার ভঙ্গিতে এগোলে হনুমানটা এক লাফে খানিকটা সরে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা বড় পাথর তুলে নিল অর্জুন। এবং তখনই ক্ষুরটার কথা মনে পড়ল। ওটা তার পকেটেই রয়ে গেছে।

অর্জুন পাথর তুলতেই দড়িতে বাঁধা লোকটা অদ্ভুত সুরে শিস দিল। সঙ্গে-সঙ্গে কালভার্টের থামের আড়ালে চলে গেল হনুমানটা। ওর কাছাকাছি শুধু পাথর হাতে যাওয়া বোকামি হবে। অর্জুন মুখ ফিরিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, "ওটাকে তুমি ট্রেনিং দিয়েছ?"

আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা ছোট পাথর শাঁ করে অর্জুনের মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ঝোরার জলে শব্দ তুলল। হনুমানটা পাথর ছুঁড়ছে। অর্জুন প্রচণ্ড রেগে গিয়ে লোকটাকে বলল, "ওটাকে এখান থেকে চলে যেতে বলো, নইলে তোমাকে আমি খুন করব!"

লোকটা মাথা নাড়ল, "আপনি আমাকে খুন করতে পারেন না। ভদ্রলোকেরা খুন করতে পারে না।"

কথাগুলো কানে যাওয়া মাত্র অর্জুনের মনে হল, সত্যিই সে এখন বেশ অসহায়। যতই মুখে বলুক, ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করা তার পক্ষে অসম্ভব। আর এই সত্যিটা এতক্ষণে লোকটা বুঝে গিয়েছে। এই সময় দূরে মোটরবাইকের আওয়াজ পাওয়া গেল। বেশ দ্রুত এগিয়ে আসছে ওপরের রাস্তা ধরে। অর্জুন ঠিক করল, এই লোকটা যদি চেঁচায়—তা হলে সিরিঞ্জ বসিয়ে দেবে, তারপর যা হয় হোক।

মোটরবাইকটা আরও এগিয়ে আসামাত্র শুয়ে-শুয়েই লোকটা শিস দিল। সঙ্গে-সঙ্গে হনুমানটা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করল। একটুও ইতস্তত না করে অর্জুন ওকে লক্ষ করে পাথরটা ছুঁড়ল। এই আক্রমণের কথা হনুমানটার মাথায় আসেনি। সে লাফাতে-লাফাতে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছিল। পাথরটা আঘাত করল তার ঘাড়ের নীচে। সঙ্গে-সঙ্গে সে ছিটকে গেল খানিকটা। এবং সেই গতিতে গড়িয়ে গেল রাস্তার ওপরে। আর তখনই সশব্দে ব্রেক কষার আওয়াজ, হনুমানটার পরিত্রাহি চিৎকার কানে এল। অর্জুন দেখল, মোটরবাইকটা চালকহীন অবস্থায় কালভার্টের রেলিং-এর গায়ে এসে ধাক্কা খেল। তারপর তার সামনের চাকা শূন্যে বনবন করে ঘুরতে লাগল।

"গুরু, বাঁচাও, গুরু, হাম নীচে হ্যায়, বাঁচাও।" পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠল লোকটা। অর্জুন দ্রুত কালভার্টের থামের আড়ালে-আড়ালে খানিকটা ওপরে চলে এল। রাস্তার মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে হনুমানটা। রক্ত বেরোচ্ছে তার শরীর থেকে। এ-পাশে মোটর বাইক আর উলটো দিকের আগাছার ওপর ধীরে-ধীরে উঠে বসছে হেলমেটধারী। নিশ্চয়ই সে চোট খেয়েছে। কিন্তু উঠে

বসার সময় লোকটির চিৎকার তার কানে যাওয়ায় সে পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে সতর্ক চোখে তাকাচ্ছে। স্পিড বেশি থাকায় হনুমানটা যখন ব্যালান্স হারিয়ে সামনে পড়েছিল, তখন লোকটাই আর ব্রেক কষার সময় পায়নি। এই লোকটিই নিশ্চয়ই বলদেব।

আড়চোখে অর্জুন দেখল, কালভার্টের নীচে শরীরে বাঁধন সত্ত্বেও লোকটা উঠে বসার চেষ্টা করছে। তার গলা থেকে একনাগাড়ে চিৎকার ছিটকে বেরোচ্ছে। ওর পক্ষে হাঁটা কোনও মতেই সম্ভব নয়। এবার নিশ্চয়ই বলদেব ওর উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসবে। এবং সে ক্ষেত্রে রিভলভারের সঙ্গে জেদ দেখানোর মতো বোকামি সে করতে পারে না। অথচ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে সে ধরা পড়ে যেতে বাধ্য।

অর্জুন দেখল বলদেব সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে রিভলভার হাতে। থুক করে থুতু ফেলল। এত দূর থেকেও অর্জুনের মনে হল থুতুর রং লাল। নিশ্চয়ই দাঁত ভেঙে গেছে পড়ার সময়। বাঁ হাতে চোট খেয়েছে, কারণ হাতটাকে বুকের কাছে তুলে ধরেছে। হঠাৎ বলদেব চিৎকার করে উঠল, "কাঁহা হ্যায় তুম, এ মুর্দাকা বাচ্চা!" গলার স্বরে জঙ্গল গমগম করতে লাগল। কালভার্টের নীচ থেকে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, "নীচে। ঝোরাকা পাশ।"

বলদেব দু' পা এগোল। তার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সেই অবস্থায় সে চেঁচাল, "ইয়ার্কি মারছিস, অ্যাঁ। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি? হনুমান লেলিয়ে দেওয়া? উঠে আয় বদমাশ।"

লোকটা কাতরে উঠল, "কী করে উঠব। আমার হাত-পা বাঁধা।"

পরস্পরকে না দেখেও এই যে কথাবার্তা—তা হিন্দিতে হচ্ছিল। বলদেব সোজা হল, "কে বাঁধল তোকে? তোর কাছে কেউ আছে নাকি?"

"সেই চিড়িয়া। মেয়েগুলোর সঙ্গে এসেছে। ভড়কি দিয়েছে গুরু। এতক্ষণ আমাকে সিরিঞ্জ ঢোকাবার ভয় দেখাচ্ছিল। এখন দেখতে পাচ্ছি না।"

অর্জুন দেখল, আহত হওয়া সত্ত্বেও এক-ঝটকায় নিজেকে তৈরি করে বলদেব ছুটে এল মোটরবাইকের কাছে। লোকটাকে এখন খুব ভিতু বলে মনে হচ্ছে। অর্জুন যেখানে আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে বলদেব মাত্র হাত-দশেক দূরে। সে মোটরবাইকটাকে কোনও মতে সোজা করল। শরীরে প্রচুর শক্তি না থাকলে এই অবস্থায় ওটা করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাইকটার অবস্থা এমন সঙ্গিন হয়ে গিয়েছে যে, হতাশায় ঠেলে দিল বলদেব ওটাকে। আবার কালভার্টের রেলিং-এর ওপর ঝপাং শব্দে পড়ল সেটা। এবার মুখ ঘুরিয়ে কতকটা নেমে এল লোকটা। আর একটু এগোলেই অর্জুন ধরা পড়ে যাবে ওর চোখে। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি-পেটা শুরু হয়ে গিয়েছে। অর্জুন বলদেবের পা এবং হাঁটু দেখতে পাচ্ছে এখন।

"তোকে ধরল কী করে?" চিৎকার ভেসে এল।

"পেছন থেকে। গুরু, দড়ি খুলে দাও।"

"কী বলেছিস তুই ?"

"কিছু না, গুরু, কিছু না।"

"মিথ্যে কথা বলিস না। সিরিঞ্জ পেয়েছে যখন, তখন তুই মুখ বন্ধ রাখিসনি।"

"জিজ্ঞেস করছিল, বস কে ?"

"কী বললি ?"

"মেমসাব। ব্যস।"

সঙ্গে-সঙ্গে আর্তনাদ করেই নেতিয়ে গেল লোকটা। অদ্ভুতভাবে চিত হয়ে মুখ কাত করে পড়ে গেল। চোখ দুটো পলকেই স্থির, মুখ হাঁ। অর্জুন মুখ ফেরাল। হাঁটু এবং পা ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে গেল। অর্জুন আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। চোখের সামনেই একটা খুন হয়ে গেল। এই লোকটার কাছ থেকে নিশ্চয়ই কিছু খবর পাওয়া যেত, যেটা বলদেব চাইছিল না। হনুমানটা নিশ্চয়ই এই লোকটারই পোষা। বেচারা বলদেবকে খবর দিতে গিয়ে প্রাণ হারাল। কিন্তু এই কালভার্টের নীচ থেকে বের হওয়া দরকার। অথচ বোঝা যাচ্ছে না বলদেব কাছে-পিঠে আছে কি না। সে যদি অপেক্ষা করে থাকে, তা হলে তার দশা ওই লোকটার মতেই হবে।

হঠাৎ 'ঝপাং' শব্দ হতেই চমকে উঠল অর্জুন। মোটরবাইকটা ঠিক ঝোরার মাঝখানে পড়ে আস্তে-আস্তে তলিয়ে গেল। ওখানে জলের গভীরতা বড়জোর চার-পাঁচ ফুট। থামের আড়ালে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখল, বলদেব টলতে টলতে বাংলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রাস্তা ধরে।

একটু সময় নিয়ে সে কালভার্টের নীচ থেকে বেরিয়ে এল। হনুমানটা পড়ে আছে রাস্তায়। মাথাটাই ফেটে গিয়েছে। মাথার তুলনায় শরীর বেশ বড়। রাস্তার যতটা সোজা দেখা যায়, বলদেব কোথাও নেই। এবং তখনই গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফরেস্ট অফিসের জিপটাকে দেখতে পেল অর্জুন। বেশ দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে। কালভার্টের সামনে এসে ব্রেক কষতেই মিস্টার বিশ্বাস লাফিয়ে নামলেন, "কী ব্যাপার ? আপনি কাকে ধরেছেন ? আরে ! এটা কী ?"

মিস্টার বিশ্বাস ছুটে গেলেন হনুমানটার কাছে। তাঁর সঙ্গী ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরাও বেশ অবাক হয়েছে বোঝা গেল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার আহমেদ কি এসে গিয়েছেন ?"

মিস্টার বিশ্বাস মাথা নাড়লেন, "এখনও নয়। আপনি আসতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা শুনে না এসে পারলাম না।"

তা হলে বাংলো ঘেরাও করা হয়নি ? সর্বনাশ। বলদেব ও দিকেই গিয়েছে। অর্জুন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল, "আপনি জিপ ঘোরাতে বলুন।"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।" মিস্টার বিশ্বাস কথাগুলো বলতে-বলতে হাত নেড়ে ড্রাইভারকে ইশারা করলেন।

অর্জুন বলল, "আপনার এই জঙ্গলে আর-একজন খুন হয়েছে। একই জায়গায়। তৃতীয় খুন যাতে না হয়, তার জন্য আমাদের এখনই বাংলোয় যাওয়া উচিত। ও হ্যাঁ, আপনি চটপট একবার কালভার্টের নীচ থেকে ঘুরে আসুন।"

মিস্টার বিশ্বাস ছুটে গেলেন। ফিরে এলেন একেবারে ঝড়ের মতো, "কী সর্বনাশ!"

অর্জুন জিপে উঠে বসল কিছু না বলে। মিস্টার বিশ্বাস সেখানে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকে খুন করল কে? আপনি?"

"আমার কাছে রিভলভার নেই মিস্টার বিশ্বাস!"

"না, মানে ড্রাইভারের কাছে শুনলাম...।"

"সেটি এই জিনিস। এ-দিয়ে রক্ত বের হয় না, সাদা চোখে মৃত্যুর কারণ বোঝা যায় না। চলে আসুন চটপট। আমি মানুষ মারার অধিকারী নই, বাঁচানোর।"

জিপ ছুটে যাচ্ছিল বাংলোর দিকে। যতটা সংক্ষেপে সম্ভব অর্জুন মিস্টার বিশ্বাসকে বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা। শুনে ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। অর্জুন বলল, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিস্টার ভার্মার স্ত্রী হিসেবে যিনি এই বাংলোয় আছেন, তিনিই 'মেমসাহেব' এবং এই চক্রান্তের মূল নেত্রী।"

মিস্টার বিশ্বাস কথা বললেন না। বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল, ফরেস্ট বাংলোর একজন কর্মচারী ছুটতে-ছুটতে আসছে। জিপ থামাতে হল। লোকটা হাঁপাতে-হাঁপাতে যা বলল, তাতে বোঝা গেল একটু আগে একটা লোক বাংলোয় ঢুকে ভার্মা-সাহেবকে কিছু বলতেই তিনি ও মেমসাহেব ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। যাওয়ার আগে চার বাচ্চা-মেমসাহেবের একজনকে বন্দুক দেখিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছেন।

সঙ্গে-সঙ্গে জিপ ছুটে এল বাংলোর লনে। অর্জুন দেখল, পুনম, চিঙ্কি, এবং টিনা ছুটতে ছুটতে আসছে। কথা বলার আগেই কান্নায় ভেঙে পড়ল তারা। অর্জুন শুনল, সে বেরিয়ে যাওয়ার কিছু আগে নাকি নন্দিনী একাই গিয়েছিল ভার্মা-সাহেবের ঘরে। সে বন্ধুদের বলেছিল, লোকটার মুখোশ খুলে দেবে! ওরা তাকে অর্জুনের নিষেধের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল কিন্তু কথা শোনেনি নন্দিনী। সে অনেকক্ষণ ফিরছে না দেখে খোঁজ করতে গিয়ে শেষে দেখতে পেয়েছে, নন্দিনীকে রিভলভার দেখিয়ে ট্যাক্সিতে তুলেছে ওরা। কিছু করার আগেই ট্যাক্সি হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার পুরি ঘরে আছেন?"

ফরেস্ট বাংলোর একটি বেয়ারা বলল, "নেহি সাব। আধা-ঘন্টা আগে

নিকাল গিয়া।"

মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, "মিস্টার পুরি কি এ-ব্যাপারে জড়িত?"

"আমি বুঝতে পারছি না। তবে লোকটার চাল-চলন সন্দেহজনক। আপনি এখনই পুলিশ-স্টেশনে টেলিফোন করুন। ওদের রাস্তায় আটকাতে বলুন।" অর্জুন ব্যস্ত হল।

জিপ চলে এল ফরেস্ট অফিসে। দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলেন মিস্টার বিশ্বাস। মিনিটখানেক বাদে ফিরে এসে জিপে উঠলেন, "ড্রাইভার, চালাও। লাইন পাওয়া গেল না। ওরা বেশি দূরে যেতে পারেনি। আহমেদেরও তো এতক্ষণে এই রাস্তায় আসার কথা। ড্রাইভার, জো॒ "

জিপ প্রচণ্ড গতিতে ছোটা শুরু করল।

মিনিট-পাঁচেক যাওয়ার পর বিশ্বাস চমকে উঠলেন, "কিছু দেখতে পাচ্ছেন?"

অর্জুনের নজরে পড়েছে ততক্ষণে। একটা জিপ রাস্তা থেকে অনেকটা সরে এসে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে উলটে যাওয়ার ভঙ্গিতে আটকে আছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জিপ থামানো মাত্র একজন পুলিশ ছুটে এল। ওটা যে মিস্টার আহমেদের জিপ, তা বুঝতে আর অসুবিধা নেই।

পুলিশটি বলল, "ভাগ গিয়া সাব। লেকিন পাকাড় যায়ে গা।"

মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে, খুলে বলো।"

লোকটা জানাল থানা থেকে যখন তারা আসছিল, তখন চেকপোস্টে এক ভদ্রলোক মিস্টার আহমেদের সঙ্গে কিছু কথা বলেন। তারপরেই মিস্টার আহমেদ ড্রাইভার ও দু'জন সেপাইকে নির্দেশ দেন জিপ নিয়ে বাংলোয় এসে রেঞ্জার সাহেবকে খবর দিতে যে, তিনি চেকপোস্টেই অপেক্ষা করছেন। সেইমতো বেশ স্পিডে যখন তারা আসছিল, তখন এ দিক থেকে একটা ট্যাক্সি ঝড়ের মতো উড়ে আসে। ড্রাইভার ভেবেছিল ট্যাক্সি সাইড দেবে, কিন্তু সেটা দিচ্ছে না এবং সংঘর্ষ অনিবার্য দেখে বাধ্য হয়ে ড্রাইভার জিপ নিয়ে জঙ্গলে নেমে যায়। এতে একজন সেপাই আহত হয়েছে। তাকে নিয়ে অন্য সেপাই রওনা হয়ে গিয়েছে চেকপোস্টের দিকে।

শোনামাত্র জিপ রওনা হল। কিছুক্ষণ বাদে মিস্টার বিশ্বাস বললেন, "এই বাঁকটা ঘুরলেই চেকপোস্ট।" তখনই ওরা সেপাই দুটোকে দেখতে পেল। একজন খোঁড়াচ্ছে।

অর্জুন বলল, "তা হলে এখানেই গাড়ি থামান। ঠিক রাস্তার মাঝখানে।" গাড়ি থামতেই ওরা নেমে পড়ল। আহত সেপাইটিকে গাড়িতে রেখে দিয়ে অস্ত্রধারীকে অর্জুন বলল অনুসরণ করতে। মিস্টার বিশ্বাস সঙ্গ নিলেন। গাড়ির রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে যেতে, চেকপোস্টের খানিকটা দূরে ট্যাক্সিটিকে দেখতে পেল ওরা। ট্যাক্সির মধ্যে দুজন বসে

আছে। ড্রাইভারও। চেকপোস্টের লোহার গেট বন্ধ। গেটের ওপাশে কয়েকজন পুলিশ আর ট্যাক্সির সামনে বলদেব। সামনে নন্দিনীকে রেখে দাঁড়িয়ে। এই সময় বলদেব চিৎকার করল হিন্দিতে, "আমি শেষ বার বলছি, গেট খুলে সরে না দাঁড়ালে এই মেয়েটার জান চলে যাবে।

এবার একজন চৌকিদার গোছের লোক গেট খুলে দিল। বলদেব এক হাতে রিভলভার, অন্য হাতে নন্দিনীকে ধরে ট্যাক্সির দরজায় চলে এল। তার পর চিৎকার করল, "চালাকির চেষ্টা করলে খুব খ...প হবে।"

এই সময় একটা ফায়ারিং-এর আওয়াজ ভেসে এল। সেটা এত কাছে যে, অর্জুন চমকে পেছন দিকে তাকাল। ততক্ষণে মাটিতে পড়ে গিয়েছে বলদেব। আর তার হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে গিয়েছে খানিক দূরে। অর্জুন দৌড়ে রাস্তায় চলে এসে রিভলভারটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপরেই শরীরটাকে গুটিয়ে বাঁ পাশে লাফাল। মিস্টার ভার্মার ছোঁড়া গুলিটা তার সামান্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় বার গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেলেন না ভদ্রলোক। মাটিতে পড়ে থাকা অর্জুন যখন দ্বিতীয় গুলির জন্য অপেক্ষা করছে তখন বিপরীত দিকের জানালা থেকে একটি হাত এগিয়ে এসেছিল মিস্টার ভার্মার দিকে, "নো মোর, আদারওয়াইজ ইউ উইল বি ডেড।" মিস্টার ভার্মার হাত থেকে রিভলভার পড়ে গেল।

অর্জুন চিৎকার করে উঠল, "অমলদা, আপনি ?"

ততক্ষণে পেছন থেকে মিস্টার আহমেদ বেরিয়ে এসেছেন জঙ্গল থেকে। সেপাইরা ছুটে এল চেকপোস্টের আড়াল ছেড়ে। গাড়ি থেকে টেনে বের করা হল মিস্টার ভার্মা আর 'মিসেস ভার্মা' নামক মহিলাকে। নন্দিনীর কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। আহমেদ পরীক্ষা করে বললেন, "লোকটা আগেই উন্ডেড ছিল। বাট হি ইজ ডেড।"

মিস্টার বিশ্বাস বললেন, "একটু আগে ও আর-এক জনকে খুন করেছে।"

"সে কী ? কোথায় ?" মিস্টার আহমেদ বললেন।

আধঘন্টা বাদে ওরা সবাই থানায় বসে ছিল মিস্টার আহমেদের টেবিলের সামনে। ইতিমধ্যে লোক পাঠানো হয়েছে কালভার্টের নীচ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করতে। অমল সোম বললেন, "আগে অর্জুন, তোমার গল্পটা শোনা যাক।"

অর্জুন বিস্তারিত বলল।

আহমেদ বললেন, "আমরা খবর পেয়েছিলাম, সোনা বিক্রির ঢেউ মালবাজারের দিকে লেগেছে। কিন্তু এ দিকটায় শুধু উগ্রপন্থীদের নিয়ে সময় কাটছিল আমার। উফ্ !"

মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, "এই সোনা ওরা পেত কোথায় ?"

pathagar.net

অমলদা উত্তর দিলেন, "যে-ভদ্রমহিলা এখানে 'মিসেস ভার্মা' পরিচয় দিয়ে ছিলেন, তিনি জন্মসূত্রে প্যারো-র মানুষ। পারো ভুটানের শহর। এই ভদ্রমহিলার দিল্লিতে যাতায়াত ছিল। কোনওভাবে ওঁর সঙ্গে মিস্টার ভার্মার আলাপ হয়। তখন নন্দিনীর বাবার সঙ্গে ব্যবসা-সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় মিস্টার ভার্মা বিপদে পড়েছিলেন। নন্দিনীর বাবার ওপর ওঁর খুব রাগ ছিল, কিন্তু সেটা বোঝাতেন না। উনি জানতে . .রছিলেন নন্দিনীরা এ দিকে আসছে। হয়তো ওর বাবার কাছেই জেনেছিলেন তারিখ। পরে নন্দিনীর বাবার কোনও কারণে সন্দেহ হওয়ায় আমার এসকর্টের জন্য অনুরোধ করেন। এ দিকে মহিলা ভুটানের—কিন্তু ভুটানি নন। আমার ধারণা, তিব্বত থেকে পালিয়ে আসা লামাদের সোনা কোনওভাবে ওঁর কাছে চলে আসে। হয়তো ফাঁকি দিয়েই তিনি সেটা দখল করেন। ভুটানে থেকে সেই সোনা বিক্রি করা যেত না। ভারতবর্ষে এসে করতে হলে সরকার অনুমতি দিত না। নিজের অর্জিত সম্পত্তি না হলে মানুষ কম দামেও বিক্রি করে। মিস্টার ভার্মার সঙ্গে ওঁর চুক্তি হয়। এঁদের সঙ্গে বলদেব জোটে। সে এই এলাকায় বেশ কিছু দিন আছে। টাফ ম্যান। খোঁজ নিলে জানা যাবে, মিস্টার ভার্মার স্ত্রী পরিচয় দিয়ে ওই মহিলা কখনও গরুমারা, কখনও চাপড়ামারি, কখনও কালীঝোরা, কখনও ফুন্টসিলিং-এর বাংলো কিংবা হোটেলে থেকেছেন। মিস্টার ভার্মার বুদ্ধিতে বলদেব গরিব মানুষগুলোকে ব্যবহার করেছে। পুলিশ এদের জেরা করলে এ-ব্যাপারে বিশদ জানতে পারবে।"

"কিন্তু যে লোকটা আজ খুন হয়েছে, সে বলেছিল তাদের বস একজন মেমসাহেব। তার মানে এরা জানত?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"স্বাভাবিক। মিস্টার ভার্মা সমস্ত ডুয়ার্স ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বলদেব মোটরবাইকে ছুটে বেড়াচ্ছে সেই সঙ্গে। মূল ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্বে ছিল এই লোকটি। সে তো মেমসাহেবকে চিনবেই। তাকে তো পাহারাদারের কাজ করতে হত। এর আগে ছিল চাপড়ামারিতে। হনুমানটাকে চমৎকার ট্রেনিং দিয়েছিল। চাপড়ামারির কিছু মানুষ একটা বনমানুষ দেখেছে বলে দাবি করে। সদ্য এ-তল্লাটে আসায় মিস্টার বিশ্বাসরা ওর সন্ধান পাননি।"

অমল সোম উঠে দাঁড়ালেন, "আমি আজই জলপাইগুড়িতে ফিরে যাচ্ছি মিস্টার আহমেদ। যদি কিছু প্রয়োজন হয়, জানাবেন।"

"অবশ্যই। আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না মিস্টার সোম।"

"আপনারা কি আগে পরিচিত ছিলেন?" অর্জুন খুব অবাক হচ্ছিল।

"হ্যাঁ। মানে গতকাল আমি যখন ফরেস্ট থেকে ফিরে আসি, তখন উনি থানায় এসে আলাপ করে গিয়েছিলেন।" মিস্টার আহমেদ বললেন।

থানার বাইরে এসে অর্জুন অভিমানে ফেটে পড়ল, "অমলদা, আপনি

'মিস্টার পুরি' নামে আমাদের ফলো করছেন, অথচ একবারও জানতে দেননি কেন ?"

অমল সোম অর্জুনের কাঁধে হাত রাখলেন, "তুমি শিলিগুড়িতে রওনা হওয়ার পর নন্দিনীর বাবার আর-একটা টেলিগ্রাম পাই। তিনি বিপদের গন্ধ পেয়েছিলেন। তাই ভাবলাম, তোমাদের সঙ্গে থাকি।"

"চলি! ভাল কাজ করেছ। তবে এখনই তোমার ফরেস্ট বাংলোতে ফিরে যাওয়া উচিত। নন্দিনীকে আমি সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। এবার নিশ্চিন্তে ওদের দার্জিলিংটা ঘুরিয়ে দেখাও।" অমলদা গম্ভীর পায়ে গাড়িতে উঠলেন।

অর্জুন ঠোঁট কামড়াল। তার সব আছে, শুধু আর-একটু অভিজ্ঞতা দরকার। অমলদার মতো।

pathagar.net